কাকাবাবুর অভিযান

২



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ছোটদের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড ■ কলকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
সোমনাথ বল
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

অক্ষর বিন্যাস ঃ
নিরঞ্জন লেজার পয়েন্ট
১০৬বি, রাজা রামমোহন রায় সরণি
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণ ঃ
দ্বিজেন্দ্র অফসেট
২০/৩ পুলিন অ্যাভেনিউ
কলকাতা-৭০০ ০৮১

কাকাবাবুর অভিযান

২

নিবেদন

বয়স তিপ্পান্ন-চুয়ান্নর মতো, যদিও দেখলে একটুও বুড়ো মনে হয় না। গায়ে বেশ জোর আছে, মুখে প্রকাণ্ড গোঁফ। আফগানিস্তানে পাহাড়ি রাস্তায় যাওয়ার সময় তাঁর জিপ খাদে উল্টে গিয়ে ডানপায়ের পাতার হাড়গুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। এখন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে পারেন। আবিষ্কারের নেশা তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। পুরনো বই পড়ে, যেসব রহস্যের আজও সমাধান হয়নি তিনি সেগুলোর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। এই হল আমাদের সকলের চিরপরিচিত রাজা রায়চৌধুরী ওরফে কাকাবাবু। এই নামেই উনি আমাদের বড় পরিচিত ও কাছের মানুষ। আবার অন্য দিকে স্মাগলার, দুষ্কৃতি, সমাজবিরোধীদের যম।

এই 'কাকাবাবুর অভিযান-২' বইটিতে তিনটি হাড় হিম করা টানটান উত্তেজনাপূর্ণ অভিযানের কাহিনী সঙ্কলন করা হয়েছে। যার মধ্যে আছে বিখ্যাত "সবুজ দ্বীপের রাজা" অভিযান কাহিনীটি। যা আমাদের ছোটবেলায় চলচ্চিত্র আকারে চিত্রায়িত হয়েছিল।

"বিজয়নগরের হিরে" দিয়ে 'কাকাবাবুর অভিযান-২' শুরু। এই অভিযানের সময় আমরা সন্তুর থেকে জানতে পারি জোজোর নাকি এগারোজন মামা ও সতেরো জন পিসেমশাই। সন্তু ও জোজো হল কাকাবাবুর দুই সেক্রেটারি। জোজো অবশ্য বলে সে কাকাবাবুর ফার্স্ট সেক্রেটারি ও সন্তু ডেপুটি সেক্রেটারি। আসল ফার্স্ট সেক্রেটারি কে তা সন্তুর চালচলনেই পরিষ্কার। কারণ সন্তুর চালচলন দুনিয়ার তাবৎ প্রাইভেট ডিটেকটিভদের গুরু শার্লক হোমস-এর কথাই মনে করিয়ে দেয়।

'কাকাবাবুর অভিযান-২'-এর দ্বিতীয় অভিযানটি হল সবুজ দ্বীপের রাজা-কে ঘিরে। এই রাজা আবার আদতে বাঙালী। এই বাঙালী রাজার অধীনে রয়েছে

প্রচুর জারোয়া। যারা তাদের নিজস্ব ভাষা অর্থাৎ অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে চিত্ত বিনিময় করে। এরা সেই দ্বীপে বহিরাগত কাউকে ঢুকতে দেয় না। তীরের ডগায় লাগানো বিষের মাধ্যমে বাইরের লোককে তারা অভিবাদন জানায়। সেই রকম দুর্গম জায়গা জয় করে আসল রহস্য উন্মোচন করেছেন কাকাবাবু সঙ্গো সন্তুও। 'সবুজ দ্বীপের রাজা'র পরিচয় আমাদের একটু অবাক করে। তিনি আদতে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে বহু বছর আগে আন্দামান জেল থেকে একজন বিপ্লবী পালিয়েছিলেন। তিনিই পালিয়ে এই দ্বীপে জাড়োয়াদের সঙ্গো জীবন কাটাচ্ছেন। নাম গুণদা তালুকদার।

এই অভিযান সংকলনের শেষ অভিযান মিশর রহস্য। এই রহস্য উন্মোচনে আমরা দেখতে পাই শারীরিক প্রতিবন্ধকতা বলে কিছু নেই কাকাবাবুর কাছে। আসল হচ্ছে রহস্য উদ্ঘাটনের অদম্য প্রয়াস। পিরামিডের নিচে সুড়ঙ্গোর ভেতর আঁকাবাঁকা পথে সন্তুর কাঁধ ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে নামার সময় কাকাবাবুকে সন্তুর উদ্দেশ্যে বলতে শুনি "ভয় পাচ্ছিস নাকি রে সন্তু?" যে লোকটার ক্রাচ ছাড়া চলার একটুও সুযোগ নেই সেই লোক ক্রাচ দুটো সুড়ঙ্গোর বাইরে রেখে সন্তুর সঙ্গো একপায়ে ভর করে লাফাতে লাফাতে নিচে নামছেন। ভাবা যায়!

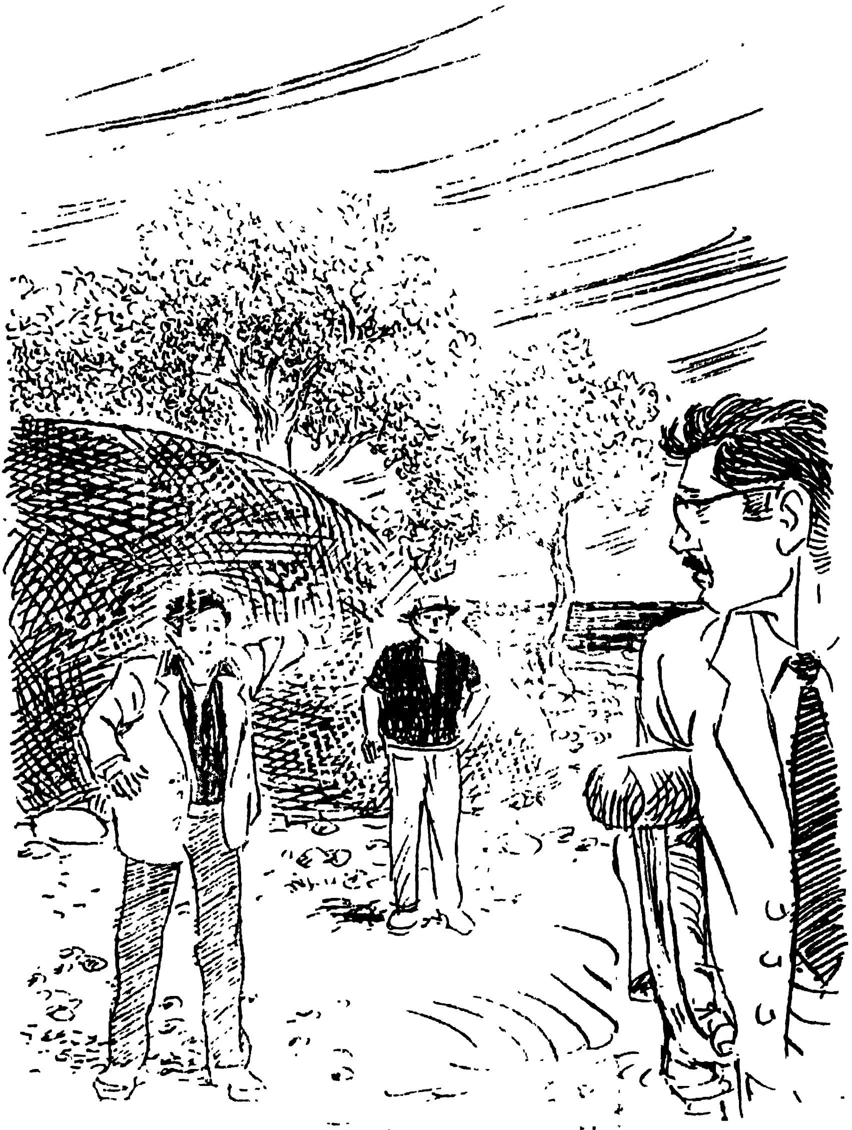
সন্তু ও কাকাবাবুকে নিয়ে প্রচুর অভিযানের কথা আমরা সকলে জানি। তারমধ্যে তিনটি সেরা অভিযান নিয়ে এই 'কাকাবাবুর অভিযান-২' যা খুবই ছোটদের মনোগ্রাহী হবে বলে মনে করেছিলেন প্রয়াত শ্রী রবীন বল মহাশয়।

সো. ব.

এই লেখকের অন্যান্য বই

কিশোর গল্প সমগ্র
কিশোর অমনিবাস
কিশোর রহস্য গল্প
কিশোর রোমাঞ্চ গল্প
কাকাবাবুর অভিযান
আঁধার রাতের অতিথি
আ চৈ আ চৈ চৈ
উদাসী রাজকুমার
উল্কা-রহস্য
কলকাতার জঙ্গলে
কাকাবাবু ও বজ্রলামা
কাকাবাবু সমগ্র (১)
কাকাবাবু সমগ্র (২)
কাকাবাবু হেরে গেলেন?
কালোপর্দার ওদিকে
খালি জাহাজের রহস্য
জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল
জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ
জলদস্যু
ডুংগা
তিন নম্বর চোখ
পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক
বিজয়নগরের হিরে
ভয়ংকর সুন্দর
মিশর রহস্য
রাজাবাড়ির রহস্য
সত্যি রাজপুত্র
সন্তু ও একটুকরো চাঁদ
সবুজ দ্বীপের রাজা
হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি





বিজয়নগরের হিরে

দু'পাশে ধুধু-করা মাঠ, তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা। কোনও বাড়িঘর তো দেখাই যাচ্ছে না, মাঠে কোনওরকম ফসল নেই, গাছপালাও প্রায় নেই বলতে গেলে। অনেক দূরে দেখা যায় পাহাড়ের রেখা। এই অঞ্চলটাকে ঠিক মরুভূমি বলা যায় না, ভাল বাংলাতে এইরকম জায়গাকেই বলে 'ঊষর প্রান্তর'।

রাস্তাটা অবশ্য বেশ সুন্দর, মসৃণ, কুচকুচে কালো যত্ন করে বাঁধানো। গাড়ি চলার কোনও ঝাঁকুনি নেই, রাস্তার দু'পাশে কিছু দেখারও নেই, তাই সবারই ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গাড়ি যে চালাচ্ছে, তাকে তো চোখ মেলে থাকতেই হবে, রঞ্জন সেইজন্য নস্যি নিচ্ছে মাঝে-মাঝে। আকাশে একটুও মেঘের চিহ্ন নেই, মধ্য গগনে গনগন করছে সূর্য। মাঝে-মাঝে দু-একটা লরি ছাড়া এ-রাস্তায় গাড়ি চলাচলও নেই তেমন।

সামনের সিটে বসে আছেন কাকাবাবু। চলন্ত গাড়িতেও তিনি বই পড়ছিলেন, একসময় হাত তুলে বললেন, "খাবার জল আর আছে, না ফুরিয়ে গেছে?"

পেছনের সিটের মাঝখানে বসেছে রঞ্জনের স্ত্রী রিঙ্কু, তার দু'পাশে জোজো আর সন্তু। দু'জনেই জানলার ধার চেয়েছিল, কিন্তু এখন ঘুমে ঢুলছে। রিঙ্কু সোজা হয়ে জেগে বসে আছে, তার কোলের ওপর একটা ম্যাপ ছড়ানো। রঞ্জন এর আগে দু-তিনবার ভুল করে অন্য রাস্তায় ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল, রিঙ্কুই প্রত্যেকবার তাকে গাড়ি ঘোরাতে বলেছে।

কাকাবাবুর কথা শুনে রিঙ্কু পায়ের কাছ থেকে ওয়াটার বটলটা তুলে নেড়েচেড়ে বলল, "শেষ হয়ে গেছে! আমাদের আরও দুটো-তিনটে জলের বোতল আনা উচিত ছিল!"

ওরা বেরিয়েছে বাঙ্গালোর থেকে খুব ভোরে। সেখানকার আবহাওয়া খুব সুন্দর, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, পথে যে এত গরম পড়বে সে-কথা তখন মনে আসেনি।

কাকাবাবু বললেন, "একটা কোনও নদী-টদিও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এদিকে।"

রঞ্জন বলল, "এর পর যে পেট্রোল-পাম্প পড়বে, সেখানে আমরা জল খাব, গাড়িও জল-তেল খাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "এ-তল্লাটে কোনও পেট্রোল-পাম্প আছে কি? শুধুই তো মাঠের পর মাঠ দেখছি!"

রিঙ্কু বলল, "ম্যাপে দেখা যাচ্ছে, আর ১৪ কি... না, না, দাঁড়ান, হিসেব করে বলছি, উঁ, ইয়ে, প্রায়, তিন ক্রোশ পরে একটা বড় জায়গা আসছে, এর নাম চিত্রদুর্গা! সেখানে গাড়ির পে... মানে তেল আর খাবার টাবার পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই!"

রঞ্জন অবহেলার সঙ্গে বলল, "তিন ক্রোশ? কতক্ষণ লাগবে, পনেরো মিনিটে মেরে দেব! তোমরা সবাই এরই মধ্যে এত ঝিমিয়ে পড়ছ কেন, চিয়ার আপ!"

সন্তু ঘুম-জড়ানো গলায় বলল, "রঞ্জনদা দু'বার, কাকাবাবু একবার!"

রঞ্জন বলল, "এই রে, বিচ্ছুটা সব শুনছে? আমি ভেবেছিলুম ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি!"

সন্তু পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বার করে কী যেন লিখল, তারপর আবার চোখ বুজল।

রঞ্জন বলল, "আরে, এ-ছেলে দুটো এত ঘুমোয় কেন? আমরা কত ভাল-ভাল জিনিস দেখছি।"

সন্তু চোখ না খুলেই বলল, "কিছু দেখার নেই!"

রঞ্জন বলল, "একটু আগে রাস্তা দিয়ে দুটো ছোট-ছোট বাঘ চলে গেল। এখন হাতি দেখতে পাচ্ছি, একটা, দুটো, তিনটে... কাকাবাবু, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "আরে, তাই তো! রঞ্জন কি ম্যা... ইয়ে জাদুবিদ্যে জানে নাকি? সত্যিই তো হাতি!"

কাকাবাবুর কথা শুনে সন্তু ধড়মড় করে উঠে বসল। কোনও সন্দেহ নেই, সোজা রাস্তাটার অনেক দূরে গোটাতিনেক হাতি দেখা যাচ্ছে। সন্তু ধাক্কা দিয়ে জাগাল জোজোকে।

জোজো সামনের দিকে চেয়েই বলল, "ওয়াইল্ড এলিফ্যান্টস!"

সন্তু পকেট থেকে ছোট খাতাটা বার করতে-করতে বলল, "জোজো এক!"

রঞ্জন বলল, "এই ধুধু-করা মাঠের মধ্যে বন্য হস্তী আসিবে, ইহা অতিশয় অলীক কল্পনা। আমার মনে হয়, এই হস্তীযূথ বিক্রয়ের জন্য হাটে লইয়া যাওয়া হইতেছে। সন্তু, একটা হাতি কিনবি নাকি?"

গাড়িটা আরও কাছে আসবার পর দেখা গেল হাতিগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু লোকজন আছে, কয়েকজন সানাই বাজাচ্ছে। মাঝখানের হাতিটায় একজন প্যান্ট-কোট পরা লোক বসে আছে, তার গলায় অনেকগুলো মালা, মাথায় সাদা জরি-বসানো পাগড়ি!

রিঙ্কু বলল, "ওমা, বর যাচ্ছে!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "বউ কোথায়? প্যান্ট-কোট-পরা বর হয় নাকি?"

রঞ্জন বলল, "হ্যাঁ, হয়। এখানে এরা স্যুট পরে, পাগড়ি মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে যায়। এই লোকটা বিয়ে করতে যাচ্ছে।"

রিঙ্কু বলল, "এদের দিনের বেলায় বিয়ে হয়। বাঙালিদের বিয়ের মতন আলো-টালো জ্বালার খরচ নেই!"

জোজো বলল, "এরা হচ্ছে গোন্দ নামে একটা ট্রা... মানে, উপজাতি। এদের মধ্যে নিয়ম আছে, হাতির বিয়ে দেওয়া খুব ধুমধাম করে। আজ হাতিগুলোরও বিয়ে হবে, তাই ওদের গলাতেও মালা পরানো হয়েছে, দেখেছিস সন্তু!"

রঞ্জন ভুরু কপালে তুলে বলল, "বাঃ, তোমার তো অনেক জ্ঞান দেখছি!"

সন্তু বলল, "ও আপনাকেও ছাড়িয়ে যাবে, রঞ্জনদা!"

জোজো বলল, "আমার মামাবাড়িতে দুটো হাতি ছিল কিনা! সেখানে মাহুতের মুখে শুনেছি। আমার এক মামা সেই মাহুতকে অসম থেকে নিয়ে এসেছিল।"

রঞ্জন ঘ্যাঁচ করে গাড়িতে ব্রেক কষে বলল, "তা হলে জিজ্ঞেস করা যাক, আজ ওই লোকটার বিয়ে, না হাতিগুলোর বিয়ে?"

রিঙ্কু ধমক দিয়ে বলল, "এই রঞ্জন, পাগলামি করবে না!"

রঞ্জন গোঁফ-দাড়ির ফাঁক দিয়ে অনেকখানি হেসে বলল, "আমার নতুন-নতুন জিনিস শিখতে খুব ভাল লাগে। হাতির বিয়ে!"

বছরখানেক ধরে রঞ্জন দাড়ি রাখছে। শুধু রাখছে না, দাড়ি ইচ্ছেমতন বাড়তে দিচ্ছে, এখন তাকে প্রায় ইতিহাসের নানাসাহেবের মতন দেখায়। তার চেহারাটিও সেরকম বিরাট। কিন্তু তার হাসিতে এখনও একটু দুষ্টু ছেলের ভাব ফুটে ওঠে।

কিছু লোক হাতির পিঠে চেপেছে, কিছু লোক পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। সানাইওয়ালারা গাড়ি দেখে যেন বেশি উৎসাহ পেয়ে জোরে-জোরে বাজাতে লাগল।

রঞ্জন তাল দিতে-দিতে বলল, "এদের সঙ্গে বরযাত্রী হয়ে চলে যাব? ভাল খাওয়াবে!"

কাকাবাবু অনেকক্ষণ কোনও কথা বলেননি। এবার বললেন, "রঞ্জন, গাড়ি থামলেই গরম বেশি লাগছে। আগে আমার একটু জল খাওয়া দরকার।"

রঞ্জন সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িতে আবার স্টার্ট দিয়েই এই হাতির শোভাযাত্রাটাকে পাশ কাটিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল।

রিঙ্কু বলল, "এই কী করছ? এত স্পিড দিও না!"

সন্তু খাতা বার করে বলল, "রিঙ্কুদি এক!"

রিঙ্কু বলল, "কেন? আমি কী বলেছি? ওঃ হো, স্পিড! না বাপু, আমি এই খেলা খেলতে পারব না!"

কাকাবাবু হাসতে লাগলেন। রঞ্জন একটা স্বরচিত গান ধরে দিল, "গতি! গতি! যার নাই কোনও গতি, সেই করে ওকালতি! কিংবা যে পথ ভোলে, ভুলুক না, তাতে কী-বা ক্ষতি!"

সামনেই একটা মোড় এল, ডান দিকে বাঁ দিকে দুটো রাস্তা বেরিয়ে গেছে। রিঙ্কু বলল, "পথ ভুল করলে চলবে না! রঞ্জন, এবার লেফট টার্ন নাও, আমরা হাইওয়ে ছাড়ব না। ওইটা হাইওয়ে দেখতে পাচ্ছ না?"

সন্তু বলল, "রিঙ্কুদি দুই!"

জোজো বলল, "দুই না, তিন! হাইওয়ে দু'বার বলেছে।"

রিঙ্কু বলল, "অ্যাই, হাইওয়ের বদলে কী বলব রে?"

সন্তু বলল, "রাজপথ। বাকিগুলো শাখাপথ।"

কাকাবাবু বললেন, "সামনে ওই যে পাহাড়ের ওপর মন্দির দেখা যাচ্ছে, ওইটাই খুব সম্ভবত চিত্রদুর্গা। অনেকদিন আগে এখানে একবার এসেছিলাম, ভাল মনে নেই। পাহাড়টার গায়ে একটা দুর্গ আছে। খুব সম্ভবত এই জায়গাটার আসল নাম চিত্র-দুর্গ, ইংরেজি বানান দেখে-দেখে লোকে এখন বলে চিত্রদুর্গা। এসব দিকে দুর্গা মন্দির থাকা অস্বাভাবিক। ওপরের মন্দিরটা বোধহয় শিবমন্দির।"

রঞ্জন বলল, "আর বেশিদূর গিয়ে কী হবে? ওই পাহাড়টার তলায় যদি কোনও বাংলো-টাংলো পাওয়া যায়, তা হলে সেখানে থেকে গেলেই তো হয়!"

রিঙ্কু বলল, "মোটেই না! রঞ্জন, আজ সন্ধের মধ্যেই আমরা হাম্পি পৌঁছতে চাই!"

জোজো বলল, "মধ্যপ্রদেশে এরকম একটা পাহাড়ের মাথায় মন্দির দেখেছিলুম, সে-পাহাড়টা অবশ্য আরও অনেক উঁচু, সেখানে নরবলি হয়।"

রিঙ্কু একটু চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি দেখেছ মানে? তুমি সেই মন্দিরে নরবলি দিতে দেখেছ?"

জোজো বলল, "আমি যেদিন সেই পাহাড়টার ওপরে উঠি সেদিন শুধু মোষবলি ছিল। তবে আমার মামা নিজের চোখে নরবলি দেখেছে!"

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "এটা তোমার কোন্ মামা? যিনি অসম থেকে মাহুত আর হাতি এনেছিলেন?"

জোজো বলল, "না, সে অন্য মামা!"

রঞ্জন আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার কতজন মামা?"

জোজো উত্তর দেবার আগেই সন্তু বলল, "আমি এ-পর্যন্ত জোজোর এগারোজন মামা আর সতেরোজন পিসেমশাইয়ের হিসেব পেয়েছি।"

রঞ্জন একটুও অবাক না হয়ে বলল "তা তো থাকতেই পারে। কারও কারও মামা-মামি, পিসে-পিসির ভাগ্য ভাল হয়। ভাবো তো, যার কোনও মামা নেই, মেসোমশাই কিংবা পিসেমশাই নেই, সে কত হতভাগ্য! আমি মামি, মাসি আর পিসিদের কথা বাদ দিচ্ছি!"

রিঙ্কু বলল, "কেন, তুমি মাসি-পিসিদের কথা বাদ দিচ্ছ কেন? মাসি-পিসি না থাকাটাও তো দুর্ভাগ্য!"

রঞ্জন বলল, "এইজন্যই বলি রিঙ্কু, যে-কোনও কথা বলার আগে একটু বুদ্ধি খাটাবে! যে-লোকের মাসি নেই, তার কি মেসোমশাই থাকতে পারে? মনে করো, আমার বাবার কোনও বোন নেই, তা বলে কি আমি যার-তার সঙ্গে পিসেমশাই সম্পর্ক পাতাতে পারি। হ্যাঁ, একটা কথা তুমি বলতে পারো বটে যে, মামিমা না থাকলেও মামা থাকতে পারে! মামা-শ্রেণীর লোকেরা একটু স্বার্থপর হয়, মামিমা'কে বাদ দিয়েও তাদের মধ্যে কেউ-কেউ মামা হিসেবে টিকে যায়। কিন্তু পিসিমা-ই নেই অথচ পিসেমশাই, এ যে সোনার পাথরবাটি!"

কাকাবাবু এদের কথা শুনে মজা পেয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

এখন রাস্তার ধারে দু-চারখানা বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা বাস। তার কাছেই বাজার। রঞ্জন সেখানে গাড়ি না থামিয়ে, কয়েকবার বাঁক নিয়ে একেবারে পৌঁছে গেল পাহাড়ের গায়ে দুর্গের দরজায়।

দরজা মানে সিংহদরজা যাকে বলে, তিন-মানুষ উঁচু কাঠের পাল্লা, তার গায়ে লোহার বল্টু বসানো। দু'পাশে দুটি পাথরের সিংহ। তার মধ্যে একটা সিংহের অবশ্য মুণ্ডু নেই।

কাছেই একটা বাড়ির গায়ে লেখা আছে, 'হোটেল'।

রঞ্জন বলল, "আগে এখানে ভাত-মাংস খেয়ে নেওয়া যাক। ওঃ হো, মাংস তো এ তল্লাটে পাওয়া যায় না। এটা নিরামিষের দেশ!"

কাকাবাবু ক্রাচ বগলে দিয়ে গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, "আমার নিরামিষে আপত্তি নেই। তোমাদের কষ্ট হবে। দ্যাখো যদি ডিম পাওয়া যায়।"

হোটেল মানে অবশ্য পুরনো একটা চায়ের দোকানের মতন তবে ভেতরটা খুব পরিষ্কার। পেতলের থালা-গেলাসে খাবার দেওয়া হয়। সেগুলি ঝকমকে করে মাজা। কয়েকজন লোক খেয়ে বেরোচ্ছে, টেবিল সাফ করা হচ্ছে, তাই ওরা অপেক্ষা করতে লাগল বাইরে।

দোকানের বাইরে কয়েকটা ফুলের গাছ। তার মধ্যে একটা বড় গাছ থেকে লম্বা-লম্বা লালচে ফুল ঝুলছে। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে রিঙ্কু বলল, "এগুলো কী ফুল জানিস সন্তু? বল তো!"

সন্তু মুচকি হেসে দু'দিকে ঘাড় নেড়ে বলল, "জানি না। তুমি বলো।"

"বট্‌ল ব্রাশ। এগুলোকে বলে বট্‌ল ব্রাশ।"

"জানতুম। আমি নামটা জানতুম। তবু তোমাকে দিয়ে বলালুম। তোমার আরও দু'বার জরিমানা হল!"

"তার মানে? কেন জরিমানা হবে? বট্‌ল ব্রাশ একটা ফুলের নাম। তার কোনও বাংলা নেই।"

"কে বলল নেই? বট্‌ল-এর বাংলা বোতল আর ব্রাশ-এর বাংলা বুরুশ। এই ফুলটার নাম বোতল-বুরুশ!"

কাকাবাবু হোহো করে হেসে উঠলেন। রঞ্জন বলল, "হ্যাঁ, সন্তু ঠিকই বলেছে, যেমন, টেব্‌ল-এর বাংলা টেবিল আর গ্লাস-এর বাংলা গেলাস!"

সন্তু পকেট থেকে চোট্ট খাতাটা বার করল।

সেই খাতার এক-একটা পাতায় এক-একজনের নাম লেখা আছে। কাল রাত্তিরেই ঠিক হয়েছিল যে, আজ সকাল থেকে বেড়াতে বেরোবার পর কেউ একটাও ইংরেজি শব্দ বলবে না। কেউ ভুল করে বলে ফেললেই একটা ইংরেজি কথার জন্য দশ পয়সা জরিমানা। সন্তু খাতায় সেই হিসেব লিখে রাখছে। কাল সবাই এই খেলা খেলতে রাজি হয়েছিল।

রিঙ্কু বলল, " না, আমি আর এই পচা খেলা খেলব না! আই কুইট!"

রঞ্জন বলল, "অ্যাই, এখন ওসব বললে চলবে না। আজ রাত্তিরে সব হিসেব হবে, জরিমানার টাকাটা দিয়ে তারপর ছুটি। রিঙ্কু, তোমার আরও দু'বার জরিমানা হল।"

জোজো বলল, "ভেতরটা খালি হয়ে গেছে। চলো গিয়ে বসি। এবার আর-একটা মজা হবে মনে হচ্ছে!"

একটাই লম্বা টেবিল, সবাই মিলে কাছাকাছি বসল। একজন সাদা লুঙ্গি-পরা বেয়ারা সবাইকে জলের গেলাস দিয়ে অর্ডার নেবার জন্য দাঁড়াল।

রঞ্জন বলল, "ভাই আমরা ক্ষুধার্থ। আমাদের কিছু খাদ্য দাও। ভাত, ডাল, মাংস, ডিম যা খুশি!"

লোকটি কিছু বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে রঞ্জনের কাছে ঝুঁকে এসে কী যেন বলল।

রঞ্জন বলল, "আমি ভাই তোমার সঙ্গে ইংরিজি বলে জরিমানা দিতে পারব না। খাবারের দাম সবাই মিলে দেবে, আর জরিমানা আমাকে একলা দিতে হবে। তুমি আমার বাংলা কথা শুনে যা বোঝো তাই দাও!"

লোকটি এবার ইংরেজিতে বলল, "হোয়াট ডিড ইউ সে সার?"

রঞ্জন সবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "উঁহু, তুমি যতই ইংরেজি বলো, আমি বাংলা ছাড়া কিছু বলব না। আমাদের খাদ্য দাও, খাদ্য!"

রিঙ্কু বলল, "এইরকম করলে আমাদের আর কিছু খাওয়াই হবে না! আমরা কেউ কন্নড় ভাষা জানি না, এরা কেউ হিন্দিও বোঝে না! বাংলা তো দূরের কথা।"

কাকাবাবু উঠে গিয়ে একটা দেওয়ালের পাশে দাঁড়ালেন। সেখানে খাবারদাবারের নামলেখা একটা তালিকা ঝুলছে। কন্নড় আর ইংরেজি দু'ভাষাতেই লেখা। কাকাবাবু বেয়ারাটির দিকে ইঙ্গিত করে কয়েকটা নামের ওপর আঙুল রাখলেন। তারপর হাত তুলে পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে বোঝালেন যে পাঁচজনের খাবার চাই।

বেয়ারাটি অদ্ভুত মুখের ভাব করে ভেতরে চলে গেল।

কাকাবাবু ফিরে এসে বললেন, "এতে মোটামুটি কাজ চালানো গেল, কী বলো? কিন্তু সন্তু তোর নিয়মটা একটু পালটাতে হবে। আমরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজি বলব না, কিন্তু বাইরের লোকদের সঙ্গে বলতেই হবে! অন্য লোকেরা তো আমাদের সঙ্গে এ-খেলায় যোগ দেয়নি!

সন্তু বলল, "ঠিক আছে। অন্যদের বেলায় অ্যা-অ্যা-অ্যা, মানে অন্যদের সঙ্গে বলা যাবে।"

রিঙ্কু বলল, "অন্যদের সঙ্গে অ্যালাউড? বাঁচা গেল!"

তারপর কাউন্টারের ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "এক্সকিউজ মি, প্লিজ সেন্ড দা বেয়ারার এগেইন!"

সন্তু বলল, "রিঙ্কুদি, তুমি 'অ্যালাউড'টা আমাদের বলেছ! তোমার আর একটা..."

সবাই হেসে উঠল আবার।

এই দোকানে ইডলি-ধোসা-বড়া ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। মাংস তো দূরের কথা, ভাতও নেই। বেয়ারাটি খুব ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে, একটু আগে তার ইংরেজি কথা শুনেও এরা উত্তর দিচ্ছিল না, এখন এদের মুখে ইংরেজির বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

ওদের খাওয়ার মাঝখানে দোকানটির সামনে একটা বড় স্টেশন ওয়াগন থামল। তার থেকে নামল চারজন লোক, তাদের মধ্যে একজনের দিকেই বিশেষ করে চোখ পড়ে। এই গরমেও সেই লোকটি পরে আছে একটা চকচকে সুট, চেহারাটি ছোটখাটো একটি পাহাড়ের মতন, তার চোখে সান গ্লাস, মুখে লম্বা চুরুট।

দুপদাপ করে জুতোর শব্দ তুলে লোকগুলো ঢুকল ভেতরে। টেবিলে বসার আগেই একজন জিজ্ঞেস করল, "কফি হ্যায়? কফি মিলেগা?"

কাকাবাবু খাওয়া বন্ধ করে এই আগন্তুকদের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন।

পাহাড়ের মতন লোকটি কাকাবাবুর দিকে চোখ ফেলেই মহা আশ্চর্যের ভান করে বলল, "ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল, আপ রাজা রায়চৌধুরী হ্যায় না? আপ ইধার?"

বাংলা-অসম-ত্রিপুরা কিংবা বিহার-ওড়িশা বা দিল্লিতে কাকাবাবুকে অনেকে চিনতে পারে, কিন্তু এই কর্ণাটকের একটা ছোট্ট জায়গাতেও যে কেউ তাকে চিনতে পারবে, তা যেন তিনি আশা করেননি। তিনি লাজুকভাবে একটু হেসে বললেন, "এই এদিকে একটু বেড়াতে এসেছি!"

লোকটি এগিয়ে এসে বলল, "বেড়াতে এসেছেন? এখানে?"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু এখানে না। আশেপাশে কয়েকটা জায়গায়। সঙ্গে এই আমার ভাইপো, সন্তু। ওর কলেজের বন্ধু জোজো। আর ইনি রঞ্জন ঘোষাল আর ওঁর স্ত্রী রিঙ্কু ঘোষাল, আমার বিশেষ পরিচিত।"

লোকটি সকলের দিকে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বলল, "আমার নাম মোহন সিং। আমাকে চিনেছেন তো? দিল্লিতে দেখা হয়েছিল একবার।"

তারপর সে কাকাবাবুর কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, "মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, সাচমুচ বলুন তো, আপনাকে এখানে কে পাঠিয়েছে?"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "কেউ তো পাঠায়নি। আমরা নিজেরাই এসেছি।"

মোহন সিং বলল, "নিজেরা এসেছেন তো ঠিক আছে, আপনি কার হয়ে কাজ করছেন?"

মোহন সিং কাকাবাবুর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তখনও তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে আছে

কাকাবাবু এবার একটু কড়া গলায় বললেন, "আপনি ওদিকে গিয়ে বসুন।"

মোহন সিং তবু সরল না। চওড়া করে হেসে বলল, "ঠিক আছে, আপনি অন্য কারও হয়ে কাজ না করেন তো খুব ভাল কথা। আমি আপনাকে একটা কাজ দেব। আপনার ফি কত?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলা আমি পছন্দ করি না। আপনার চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধও আমার সহ্য হচ্ছে না। আপনি, প্লিজ, দূরে গিয়ে বসুন!"

মোহন সিং-এর সঙ্গীরা তিনটে চেয়ার টেনে বসে এদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকেরই বেশ গড়াপেটা চেহারা।

মোহন সিং কাকাবাবুর কাঁধ থেকে হাত তুলে নিল, কিন্তু সরে গেল না। চুরুটের ছাই ঝেড়ে বলল, "আরে মশাই, আপনাকে আমি এমপ্লয় করছি, কম সে কম পঞ্চাশ হাজার খরচ করতে রাজি আছি। আপনাকে এত টাকা কেউ দেবে?"

রঞ্জন বলল, "শুনুন, মিঃ সিং, কাকাবাবু এখন রিটায়ার করেছেন। আমি ওঁর অ্যাসিস্টান্ট। ওঁকে কী কাজ দেবার কথা বলছেন, সেটা আমাকে দিন না! আমার কিছু টাকা-পয়সার দরকার এখন। তা হ্যাঁ, পঞ্চাশ হাজার পেলে মোটামুটি চলে যাবে।"

মশামাছি তাড়াবার মতন বাঁ হাতের ভঙ্গি করে মোহন সিং বলল, "আপ চুপ রহিয়ে। আমি মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছি। জরুরি কাজের কথা।"

রঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি আমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাই না? আমি রিভলভার চালাতে জানি, দড়ির মই বেয়ে উঠতে পারি, গোপন ম্যাপ চিবিয়ে-চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারি, এমনকী আমি পিকক করতেও পারি। দেখবেন?"

তারপর রঞ্জন সত্যিই মাটিতে দুটো হাত দিয়ে পা দুটো শূন্যে তুলে ফেলল। ঝনঝন করে তার পকেট থেকে খসে পড়ল অনেকগুলো খুচরো পয়সা।

সেই অবস্থায় সে হাত দিয়ে হাঁটবার চেষ্টা করল। মোহন সিংহের তুলনায় রঞ্জনের চেহারাটাও নেহাত ছোট নয়। একটুখানি এগিয়েই তার পা শূন্যে টলমল করে উঠল, সে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল মোহন সিংয়ের ওপর। মোহন সিংও এই ধাক্কা সামলাতে না পেরে চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে রঞ্জন খুবই কাচুমাচু গলায় বলল, "আরে ছি ছি, কী কাণ্ড। আউট অব প্র্যাকটিস, বুঝলেন! আবার দু-একদিন প্র্যাকটিস করলেই ঠিক হয়ে যাবে। আপনার লাগেনি তো? আমি খুবই দুঃখিত!"

রঞ্জন মোহন সিংয়ের হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করল। তার সঙ্গের লোকেরাও ছুটে এল দু-দিকে।

মোহন সিং নিজেই উঠে দাঁড়াল কোনওরকমে।

রঞ্জন বলল, "এক্সট্রিমলি সরি, আমায় মাপ করে দিন, এর পরের বার দেখবেন, কোনও ভুল হবে না!"

মোহন সিং কটমট করে তাকিয়ে বলল, "বেওকুফ!"

তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে অবজ্ঞার সুরে বলল, "আপনি রিটায়ার করেছেন? একেবারে বুড়া বনে গেছেন! সে কথা আগে বললেই হত!"

মোহন সিংয়ের চুরুটটা ছিটকে চলে গেছে অনেক দূরে। সেটা আর না কুড়িয়ে সে গিয়ে বসল একটা চেয়ারে। বেয়ারা এর মধ্যেই কফি দিয়ে গেছে। সে কফিতে চুমুক দিতে লাগল ঘনঘন।

রঞ্জনের কাণ্ড দেখে সন্তু আর জোজোর খুব হাসি পেয়ে গেলেও হাসতে পারছে না। সন্তু হাসি চাপবার জন্য নিজের উরুতে চিমটি কেটে আছে। রিঙ্কুর মুখখানাও লালচে হয়ে গেছে, সেও আসলে প্রাণপণে হাসি চাপছে। রঞ্জনকে সে আগে কোনওদিন পিকক করতে দ্যাখেনি।

মোহন সিং আর কোনও কথা বলল না। কফি শেষ করে দলবল নিয়ে উঠে দাঁড়াল। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে দরজার কাছে চলে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল হঠাৎ।

কাকাবাবুর দিকে আঙুল তুলে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনাদের কি হামপির দিকে যাবার প্ল্যান আছে?"

কাকাবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ।"

মোহন সিং বলল, "বেলুড় যান, হ্যালিবিড যান, শ্রবণবেলগোলা যান, এই কর্ণাটকে অনেক দেখবার জায়গা আছে। লেকিন, হামপি যাবেন না এখন।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমি কোথায় যাব না যাব, তা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বলুন তো? আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পারিনি।"

মোহন সিং তবু বলল, "আর যেখানে খুশি যান, হামপি যাবেন না। তা হলে আপনাদের অনেক অসুবিধেয় পড়তে হবে!"

এর উত্তর না দিয়ে কাকাবাবু হাসিমুখে চেয়ে রইলেন।

মোহন সিং পেছন ফিরে গটগট করে বেরিয়ে গেল!

জোজো দরজা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এসে চোখ বড়-বড় করে বলল, "চম্বলের ডাকাত! মোহন সিং! এর নাম আমি অনেকবার আমার পিসেমশাইয়ের মুখে শুনেছি।"

রিঙ্কু বলল, "মোহন সিং তো কমন নাম। অনেকেরই হতে পারে। আমার মনে হল, সিনেমার ভিলেন! আমজাদ খানের মতন চেহারা।"

সন্তু নিজের কাজ ভোলেনি। সে ছোট খাতাটা বার করে বলল, "রিঙ্কুদি, বাইরের লোক চলে গেছে, তুমি দুটো ইংরেজি শব্দ বলেছ!"

রিঙ্কু সে-কথা অগ্রাহ্য করে বলল, "রঞ্জন কী কাণ্ডটাই করল!"

এবার সকলের চেপে রাখা হাসি বেরিয়ে এল একসঙ্গে। শুধু রঞ্জন হাসল না।

সে নিজের দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, "ইশ, পঞ্চাশ হাজার টাকার কাজটা ফসকে গেল!"

কাকাবাবু বললেন, "কোথা থেকে লোকটা হঠাৎ এসে উদয় হল বলো তো? আমাকে চেনে কিন্তু আমি ওকে চিনি না। ও গায়ে পড়ে আমাদের হামপি যেতে বারণ করলই বা কেন? তা হলে কী করবে, হামপি যাবে, না অন্য কোথাও যাবে?"

রিঙ্কু বলল, "আমরা হামপি দেখব বলে বেরিয়েছি, সেখানে তো যাবই। ওই লোকটা বারণ করেছে বলে আরও বেশি করে যাব। ও বারণ করবার কে?"

◀ ২ ▶

বড় দরজাটা দিয়ে ঢোকার পর দেখা গেল, দুপাশে বিশাল উঁচু দেওয়াল, তার মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি। পাহাড়টা কেটে-কেটে দুর্গ বানানো হয়েছে, কিন্তু দূর থেকে শুধু পাহাড় বলেই মনে হয়।

পাহাড়ের ওপরটা পর্যন্ত ঘুরে আসতে কতক্ষণ লাগবে? বড়জোর এক ঘন্টা।

জোজো বলল, "চল সন্তু, যাবি?"

সন্তু কাকাবাবুর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, "সিঁড়ি আর পাহাড়, এই দুটোই আমাকে বড় জব্দ করে দেয়। আমি যাব না, তোরা ঘুরে আয় ওপর থেকে।"

রঞ্জন বলল, "আমারও পাহাড়ে চাপার শখ নেই, আমিও ওপরে যাব না। ততক্ষণ গাছের ছায়ায় একটু ঘুমিয়ে নেব।"

রিঙ্কু বলল, "তোমরা কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যে ঠিক ফিরে আসবে। ঠিক তিনটের সময় আমরা স্টা.....স্টা....স্টা...ইয়ে, যাত্রা শুরু করব।"

আরও একটু ওপরে ওঠার পর একটা জায়গায় বড়বড় কয়েকটা গাছের তলায় চমৎকার সবুজ ঘাস। রঞ্জন সেখানে শুয়ে পড়েই চোখ বুজল।

রিঙ্কু বলল, "মোহন সিং-এর গাড়িটা নিচে দেখা যাচ্ছে। ওরা এখনও যায়নি।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা ওপরের মন্দিরে পুজো দিতে গেছে। ওদের একজনের হাতে শালপাতায় মোড়া ফুলটুল দেখেছিলুম।"

রিঙ্কু বলল, "তা হলে তো সন্তুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। ওই বিচ্ছিরি লোকটা যদি ওদের সঙ্গে গণ্ডগোল করে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেজন্য চিন্তা নেই। সন্তু ওরকম লোক অনেক দেখেছে।"

রঞ্জন চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে বলল, "ওই সন্তু বিচ্ছুটা চলে গেছে? তা হলে এখন একটু প্রাণ খুলে ইংরেজি বলা যাক। হ্যাঁ, কী ইংরেজি বলব? কিছু মনে পড়ছে না যে!"

রিঙ্কু বলল, "সত্যি, আমাদের এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে, ইংরেজি শব্দ বাদ দিয়ে কথাই বলতে পারি না। অন্য সময় খেয়ালই থাকে না।"

রঞ্জন বলল, "এখন তো তুমি দিব্যি বাংলা বলছ, রিঙ্কু। একটু আগে স্টার্ট বলে ফেলতে গিয়ে স্টা-স্টা-স্টা বলে এমন তোতলাতে শুরু করলে! তোমার অনেক ফাইন হয়ে গেছে এরই মধ্যে।"

রিঙ্কু বলল, "তোমারও কম হয়নি।"

কাকাবাবু বলল, "ফাইন দেবার ভয়ে সন্তু তো কথাই বলছে না প্রায়। আজ রাত্তিরে যেখানে থাকব সেখানে বসে হিসেবটিসেব কষে, প্রত্যেকের ফাইন চুকিয়ে দিয়ে এ-খেলাটা শেষ করে দিতে হবে।"

রিঙ্কু বলল, "আমরা আজ রাত্তিরে কোথায় থাকব? তুঙ্গাভদ্রা ড্যামের গেস্ট হাউসে?"

রঞ্জন বলল, "গিয়ে দেখা যাক। সেখানে জায়গা না পাওয়া গেলে কোনও হোটেল-টোটেল খুঁজতে হবে। এই রে, হোটেল কথাটা আবার সন্তুর কাছে উচ্চারণ করা যাবে তো? হোটেলের বাংলা কী সরাইখানা?"

কাকাবাবু বললেন, "হোটেল আর ট্যাক্সি, এই কথা দুটো এখন সারা পৃথিবীতে চলে। এর আর বাংলা করার দরকার নেই।"

রিঙ্কু বলল, "এই জায়গাটা কী শান্ত আর নির্জন লাগছে। এক সময় এখানে কত সৈন্য-সামন্ত যাতায়াত করত, এখানে কত যুদ্ধ হয়েছে, এখন কিছু বোঝাই যায় না।"

রঞ্জন বলল, "রিঙ্কু, তুমি যেখানে বসে আছ, ওইখানেই যুবরাজ বিক্রম মাণিক্য, ইয়ে, খুন হয়েছিল। হ্যাঁ, চারজন বিদ্রোহী তার দেহটাকে টুকরো-টুকরো করে ফেলে, তার মুণ্ডুটা এখানে পড়েছিল অনেকদিন!"

রিঙ্কু একটু চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর বলল, "কাকাবাবু, রঞ্জন কিন্তু যখন-তখন এই রকম ইতিহাস বানায়। ওর কথা বিশ্বাস করবেন না।"

রঞ্জন বলল, "এই, আমি ক্লাস নাইন, মানে নবম শ্রেণীতে ইতিহাস পরীক্ষায় ফার্স্ট, মানে প্রথম হয়েছিলুম না?"

কাকাবাবু বললেন, "এইসব দুর্গে ওরকম খুনোখুনি হওয়া অসম্ভব কিছু তো নয়। আমরা যেখানে যাচ্ছি..."

কাকাবাবুর কথা শেষ হবার আগেই পাহাড়ের ওপর দিকে প্রচণ্ড জোরে দু'বার দুমদুম শব্দ হল। ঠিক যেন বোমা ফাটার আওয়াজ। অনেকগুলো কাক একসঙ্গে ডেকে উঠে ছড়িয়ে গেল আকাশে।

রিঙ্কু সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কী হল? সন্তু আর জোজো গেছে ওদিকে। রঞ্জন, চলো আমরা গিয়ে দেখি!"

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, আওয়াজটা বেশি দূরে হয়নি। সন্তু আর জোজোর এর মধ্যে আরও উঠে যাবার কথা।"

রঞ্জন বলল, "খুব সম্ভবত ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটাচ্ছে। নতুন রাস্তা-টাস্তা বানাবে।"

রিঙ্কু বলল, "আমি দেখে আসছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে সে ছুট লাগাল। রঞ্জন কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি ভাবছেন তো যে, আমার বউ একা-একা গেল, আমারও ওর সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল? রিঙ্কুকে আপনি ভাল করে চেনেন না। ও একাই তিনশো!"

পাহাড়ের সিঁড়িটা এঁকেবেঁকে উঠেছে, একটু দূরেই একটা বাঁক নিয়েছে বলে ওপরের দিকটা দেখা যায় না। রিঙ্কুও তরতর করে ছুটতে ছুটতে সেদিকে মিলিয়ে গেল।

কাকাবাবু পেছন ফিরে বললেন, "মোহন সিং-এর গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা এর মধ্যেই নেমে এসেছে।"

রঞ্জন বলল, "গাড়িতে একটা বায়নোকুলার আছে, সেটা নিয়ে আসা উচিত ছিল। মোহন সিং-রা নামল কোন্ দিক দিয়ে? দেখতে পেলাম না তো।"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই আর একটা রাস্তা আছে অন্যদিক দিয়ে।"

একটু পরেই দেখা গেল রিঙ্কু আর সন্তু-জোজো একসঙ্গে নেমে আসছে। সন্তুর হাতে একটা পাতাওয়ালা গাছের ডাল, তার ডগায় কয়েকটা হলুদ রঙের ফুল। ওরা গল্প করতে-করতে নামছে আস্তে-আস্তে।

সেদিকে তাকিয়েই রঞ্জন বলল, "কাকাবাবু, শিগগির নেমে চলুন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওদের জন্য অপেক্ষা করবে না?"

রঞ্জন বলল, "ওদের দেখেই তো বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, ওরা কোনও বিপদে পড়েনি। এবার ওরা একটু আমাদের খোঁজাখুঁজি করুক!"

কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি নামতে লাগলেন। রঞ্জন দৌড়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলল, তারপর কাকাবাবু এসে পৌঁছতেই তাঁকে তুলে নিয়ে স্টার্ট দিল।

বাজারের কাছে পেট্রোল-পাম্প। সেখানে মোহন সিংদের গাড়িটাও থেমে আছে। সামনের সিটে জানলার ধারে বসে আছে মোহন সিং, রঞ্জনকে দেখে সে ঘুরিয়ে নিল মুখখানা।

রঞ্জনই গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেয়া সিংজি, আপলোগও কি হামপি যাতা হ্যায়?"

মোহন সিং রঞ্জনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল, কোনও কথা বলল না।

রঞ্জন আবার বলল, "আরে আপ রাগ করতা হ্যায় কাঁহে? আমি তো ইচ্ছে করে আপনাকে ফেলে দিইনি, ব্যালান্স সামলাতে পারিনি। আপনি কী কাজ দেবার কথা বলছিলেন, আমাকে দিন না।"

পেছন থেকে মোহন সিং-এর এক সঙ্গী রঞ্জনের কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, "আপনা কাম করো। ইধার ঝঞ্ঝাট মাত করো।"

তারপর সে রঞ্জনকে আস্তে করে ঠেলে দেবার একটা ভাব দেখাল। লোকটার গায়ে অসম্ভব জোর, সেইটুকু ঠেলার চোটেই রঞ্জন হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়, গাড়িটাকে ধরে সামলে নিল। লোকটি হেসে উঠে বলল, "মোহন সিংজির সঙ্গে এবার থেকে সমঝে কথা বলবে।"

রঞ্জন একটুও রাগ না করে বলল, "উঃ, আপনার তো খুব গায়ের জোর! রোজ ব্যায়াম করেন বুঝি? আপনার নাম কী?"

লোকটি বলল, "বিরজু সিং।"

রঞ্জন বলল, "আপনারা দুজনেই সিং। বাঃ বাঃ! তা হলে হামপিতে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে?"

মোহন সিং পিচ করে মাটিতে থুতু ফেলল। তাই দেখাদেখি বিরজু আরও থুতু ফেলে অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "হুঁ।"

ওদের গাড়িতে তেল ভরা হয়ে গিয়েছিল, ওরা বেরিয়ে গেল আগে। রঞ্জন নিজের গাড়ির চাবি পাম্পের লোকের হাতে দিয়ে কাকাবাবুর কাছে এসে বলল, হামপিতে গিয়ে বেশ মজা হবে মনে হচ্ছে। ঠিক যেন একটা গল্পের মতন শুরু।

কাকাবাবু বললেন, "এবার শুধু বেড়াতে বেরিয়েছি। এবার আর কোনও গল্প-টল্পর দরকার নেই। জলের বোতলটা ভরে নাও।"

পেট্রোল নিয়ে বেরিয়ে রঞ্জন কিছু কলা আর পেয়ারাও কিনে ফেলল। তখনই দেখা গেল রিঙ্কুরা জোরে হেঁটে আসছে এদিকে। গাড়িটা নজরে পড়তেই ওরা থেমে গিয়ে কী যেন বলাবলি করতে লাগল।

রঞ্জন বলল, "আমাদের দেখতে না পেয়ে ওরা অনেক দৌড়োদৌড়ি করেছে, কিন্তু সেকথা স্বীকার করবে না, বুঝলেন তো! আসলে কিন্তু বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "রিঙ্কুর বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। সে তো এত সহজে ঘাবড়াবার মেয়ে নয়।"

রিঙ্কুরা কাছে এসে গাড়িতে উঠে পড়ে বলল, "আমরা এক ঘণ্টার বেশি সময় নিইনি। এবার চলো।"

রঞ্জন বলল, "তোমরা আমাদের খুঁজতে কোথায়-কোথায় গিয়েছিলে?"

রিঙ্কু খুব অবাক হয়ে বলল, "খুজব কেন? তোমরা গাড়ির তেল নেবে, এ তো জানা কথাই! আমরা ভাল মিষ্টি কিনে আনলুম এই ফাঁকে। নিজেরা কয়েকটা খেয়েও এসেছি।"

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "পাহাড়ের ওপর আওয়াজটা হয়েছিল কিসের?"

রিঙ্কু পালটা প্রশ্ন করল, "বলো তো কিসের? আন্দাজ করো!"

রঞ্জন বলল, "আমি তো কাকাবাবুকে আগেই বলে রেখেছি। ডিনা... এই সন্তু, আমি কিন্তু ডিনামাইটের বাংলা বলতে পারব না। ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটাচ্ছিল।"

রিঙ্কু বলল, "মোটেই না।"

রঞ্জন বলল, "তবে কি কেউ সত্যিকারের বোমা ছুঁড়েছিল? সন্তু, বোমা কথাটা কিন্তু বাংলা! আমি তো বম্ব্ বলিনি!"

রিঙ্কু বলল, "না, এবারও হল না। ওখানে একটা চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণ হচ্ছিল।"

"কী হচ্ছিল? চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণ! তার মানে? সিনেমার শুটিং!"

সন্তু আর জোজো দুজনেই হাততালি দিয়ে উঠল। রিঙ্কু হাসতে হাসতে বলল, "আমরা ঠিক জানতুম, রঞ্জন ইংরেজি করে বলবেই।"

রঞ্জন একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "আসল ব্যাপারটা কী হয়েছে, তাই বলো না!"

সন্তু বলল, "ওখানে একটা চলচ্চিত্র তোলা হচ্ছে। দু'দলের ডাকাতের মারামারির দৃশ্যে বন্দুকের গুলির শব্দ হল। ওখানে প্রচুর লোকের ভিড়।"

জোজো বলল, "ওখানে মোহন সিংকেও দেখলুম। সে ডাকাতের সর্দার হয়েছে। আমি যে ওকে চম্বলের ডাকাত বলেছিলুম, সেটা খুব ভুল ছিল না!"

রিঙ্কু বলল, "আমি আগেই ওকে চলচ্চিত্রের খলনায়ক বলেছিলুম!"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু মোহন সিংকে যে একটু আগে এখানে দেখা গেল? এর মধ্যেই সে নেমে এল কী করে?"

সন্তু বলল, "আর একটা লোককে মোহন সিং-এর মতন সাজিয়েছে। তারও প্রায় ওইরকম চেহারা। আসল মারামারির দৃশ্যগুলো ওই নকল মোহন সিং করবে!"

জোজো বলল, "ওদের বলে স্টান... স্টান... থাকগে, ওর বাংলা করা যাবে না।"

গাড়িটা আবার ছুটতে লাগল বড় রাস্তা দিয়ে। রঞ্জন বলল, "এখন কিন্তু কেউ ঘুমোবে না, তা হলে আমারও ঘুম পেয়ে যাবে।"

সে এক টিপ নস্যি নিল নাকে।

রিঙ্কু ম্যাপটা বিছিয়ে বলল, "রঞ্জন, হামপির আগে হস্‌পেট বলে একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে এটা একটা বড় জায়গা।"

কাকাবাবু বললেন, "ওই হসপেটেই আমাদের থাকতে হবে। হামপিতে কোনও থাকার জায়গা নেই।"

সন্তু বলল, "আমরা যে তুঙ্গাভদ্রা নদীর ধারে অতিথিশালায় থাকব ঠিক ছিল? তুঙ্গাভদ্রা নামটা কী সুন্দর।"

কাকাবাবু বললেন, "ওখানে বড় জোর রাতটা থাকা যাবে। ওখান থেকে হামপি বেশ দূর হবে, যাওয়া-আসা করা যাবে না।"

জোজো হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আমরা যে হামপি দেখতে যাচ্ছি, সেখানে কী আছে?"

সন্তু বলল, "হামপিতে হামপি আছে!"

জোজো বলল, "ও!"

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "তুই যে গম্ভীরভাবে ও বললি, হামপি মানে তুই কী বুঝলি রে, জোজো? পাহাড়, জঙ্গল, না সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ?"

জোজো বলল, "আমি একবার আমার ছোটমামার সঙ্গে কোকোডিমা বলে একটা দ্বীপে গেসলুম। সেই দ্বীপটা কোথায় তোমরা বলতে পারো?"

জোজোর কথা ঘোরাবার ক্ষমতা দেখে কাকাবাবু পর্যন্ত একটু হেসে উঠলেন।

গল্প করতে-করতে অনেকটা রাস্তা চলে আসা গেল। বিকেল হয়ে এল আস্তে। এখনও গরম কমবার নাম নেই। পশ্চিমের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে।

একটা চৌরাস্তার মোড়ে এসে রঞ্জন গাড়িটা থামাল। এরপর কোনদিকে যেতে হবে, রিঙ্কু ঠিক বুঝতে পারছে না ম্যাপ দেখে।

রঞ্জন বলল, "নেমে তা হলে জিজ্ঞেস করা যাক। কয়েকটা চায়ের দোকানও রয়েছে। ইচ্ছে করলে এখানে চা খাওয়া যেতে পারে।"

সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। পাশাপাশি তিনটে চায়ের দোকান। লম্বা-লম্বা বেঞ্চ আর খাটিয়া পাতা আছে বাইরে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি লরি আর একটি সাদা রঙের গাড়ি।

একটি খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছেন একজন বৃদ্ধ, তাঁর মাথার চুল, মুখের দাড়ি সব ধপধপে সাদা। বৃদ্ধটি বেশ অসুস্থ মনে হয়। তাঁর মাথার কাছে বসে একটি খুব সুন্দরী মেয়ে হাওয়া করছে পাখা দিয়ে. একজন মাঝবয়েসী লোক বৃদ্ধটিকে খাইয়ে দিচ্ছে চা।

কাকাবাবু অন্য একটি দোকানে বসলেন। বৃদ্ধটিকে একবার দেখে তাঁর ভুরু একটু কুঁচকে গেল। তার চেনা কোনও একজন মানুষের সঙ্গে ওই বৃদ্ধটির মুখের মিল আছে, কিন্তু কার সঙ্গে যে মিল তা কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। তবে তা নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামালেন না।

একটু পরে সেই বৃদ্ধটিকে ধরাধরি করে তোলা হল সাদা গাড়িটিতে। সেখানেও তিনি বসতে পারলেন না, শুয়ে পড়লেন মেয়েটির কোলে মাথা দিয়ে।

রঞ্জন কয়েকজনকে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে এসে বলল, "কাকাবাবু, রাস্তা পেয়ে গেছি, আর বেশি দূর নেই, বড়জোর এক ঘন্টা। তবে তুঙ্গাভদ্রা গেস্ট হাউসে নাকি এখন অনেক লোক। ওই যে থুরথুরে বুড়ো লোকটিকে দেখছেন, উনিও দলবল নিয়ে সেখানেই যাচ্ছেন শুনলুম।"

রিঙ্কু বলল, "অত বুড়োলোকের বেড়াবার শখ কেন? দেখে তো মনে হয় যখন-তখন মরে যাবে! আমাদের তো টেলিফোন করা আছে, আমরা তুঙ্গাভদ্রা গেস্ট হাউসেই থাকব।"

সন্তু পকেট থেকে খাতা বার করল।

রিঙ্কু বলল, "এই, এই, টেলিফোন বলব না তো কী বলব রে।"

সন্তু বলল, "শুধু বাংলা বলতে চাইলে এইভাবে বলা যায়। আমাদের তো দূরভাষে বলা আছে, আমরা তুঙ্গাভদ্রা অতিথি নিবাসে থাকব!"

রিঙ্কু বলল, "ধ্যাত, এইরকমভাবে কেউ কথা বলে? আমাদের বাড়ির একজন পুরুতঠাকুর এইভাবে কথা বলতেন।"

সন্তু বলল, "মোটে তো একদিন। কাল থেকে আবার যে-যার নিজের মতন কথা বলবে। রঞ্জনদা, তোমারও একটা ফাইন হয়েছে।"

রঞ্জন প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, "অ্যাই, অ্যাই, পেয়েছি! সন্তু 'ফাইন' বলেছে! সন্তুরও এবার জরিমানা। তুই নিজেরটা লেখ্ সন্তু!"

জোজো বলল, "আচ্ছা সন্তু, আমি যদি পুরো ফরাসি ভাষায় কথা বলি, তাতে তো কোনও আপত্তি নেই? আজ তো শুধু ইংরিজি বলা চলবে না!"

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "তুই ফরাসি জানিস বুঝি?"

জোজো বলল, "খুব ভাল জানি। আমি যখন বাবার সঙ্গে চার মাস প্যারিসে ছিলুম, তখন গড়গড় করে ফ্রেঞ্চ বলতে শিখেছি। চোখ বুজে বলতে পারি। শুনবে?"

রঞ্জন বলল, "শুনি, শুনি!"

জোজো সত্যি চোখ বুজে বলল, "উই, উই, পারদোঁ ম্যাসিও, ম্যার্সি বকু, জ্য ন পার্ল পা ফ্রাঁসে!"

রঞ্জন বলল, "হুঁ, ফ্রেঞ্চ ভাষা চোখ বুজেই বলতে হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "চমৎকার বলেছে! কিন্তু জোজো, তোমার এই ভাষা যে আমরা কেউ বুঝতে পারব না!"

রিঙ্কু বলল, "আর দেরি করে কী হবে, এইবার চলো। চা খাওয়া তো হয়ে গেছে। চা-টা একেবারে অখাদ্য।"

এদিকটায় ছোট ছোট পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তা। তুঙ্গাভদ্রার বাঁধ অনেকটা উঁচুতে। সেই বাঁধের গায়ে বেশ বড় আর পুরনো আমলের দোতলা অতিথিশালা। সামনে আরও তিনখানা গাড়ি দাঁড়ানো। তার মধ্যে সেই সাদা গাড়িটাও রয়েছে। একতলা-দোতলায় অনেক লোকজনের ব্যস্ততা।

একজন কেয়ারটেকারকে খুঁজে বার করা গেল. সে রঞ্জনের কোনও কথায় পাত্তাই দিতে চায় না। প্রথম থেকেই বলতে লাগল, "জায়গা নেই, জায়গা নেই!" রঞ্জন বারবার জানাবার চেষ্টা করতে লাগল যে, বাঙ্গালোর থেকে টেলিফোন করা হয়েছে ঘর রাখবার জন্য, তবু লোকটি গ্রাহ্য করল না।

রঞ্জন বলল, "আপনি বলতে চান এত বড় ডাকবাংলোতে একটা ঘরও খালি নেই? এখন আমাদের হোটেল খুঁজতে যেতে হবে?"

লোকটি বলল, "একটাই মাত্র রুম রাখা আছে। সেটা রাজা রায়চৌধুরী নামে একজন ভি আই পি'র জন্য।"

রঞ্জন বলল, "উফ, আপনাদের নিয়ে আর পারা যায় না, মশাই! নিন,

খুলুন, খুলুন। এতক্ষণে আমার নাম জিজ্ঞেস করছেন? আমিই তো রাজা রায়চৌধুরী।"

লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে জিভ কেটে বলল, "আরে ছি ছি, সে কথা বলেননি কেন? আপনাদের জন্য দোতলায় ভাল ঘর রাখা আছে। তিনখানা খাট। আসুন, আসুন! আমি চাবি আনছি!"

রঞ্জন সন্তুকে বলল, "এখানকার লোকগুলো কী রকম সৎ দেখলি? কাউকে অবিশ্বাস করে না। যে-কেউ এসে নিজের নাম রাজা রায়চৌধুরী বললেই ঘর খুলে দিত।"

কাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে বললেন, "আমাদের পূর্ব পরিচিত একজন বন্ধুও এখানে রয়েছে দেখছি।"

কাকাবাবুর কথা শুনে সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দোতলার বারান্দায় একজন লোক রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে মুখটা দেখা না গেলেও কোনও সন্দেহ নেই, সে মোহন সিং।

কাকাবাবু বললেন, "ভালই হল, ওর সঙ্গে এবার ভাল করে আলাপ করা যাবে।"

ডাকবাংলোর দু'জন আর্দালি এসে মালপত্র ওপরে নিয়ে গেল। কেয়ারটেকার ঘরের চাবি খুলে দিয়ে বলল, "আপনারা রাত্তিরে খাবেন তো? খাবার অর্ডার এখনই দিয়ে দেবেন?"

রিঙ্কু জিজ্ঞেস করল, "কী কী পাওয়া যাবে?"

লোকটি বলল, "ভাত-রুটি, মুরগি, সব্‌জি, ডাল, ডিমের কারি।"

রঞ্জন বলল, "কফি আছে আপনাদের?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, কফি পাবেন।"

রঞ্জন বলল, "এখন আমাদের কফি আর ডিমের ওমলেট দিতে বলুন। রাত্তিরে আমরা মাংস-ভাত খাব।"

রিঙ্কুর দিকে ফিরে সে বলল, "আমরা তো ওবেলা নিরামিষ খেয়েছি, তাই আগে ডিম খেয়ে সেটা মেক-আপ করে নেওয়া যাক, তারপর মাংস হবে। ঠিক আছে?"

রিঙ্কু বলল, "সন্তু তুই লিখেনে, রঞ্জন আমাকে শুধু-শুধু মেক-আপ বলেছে।"

রঞ্জন বলল, "তাই তো! মুখ দিয়ে অটোমেটি....না, না, বলিনি, বলিনি, পুরোটা বলিনি, মুখ দিয়ে ফস করে এক-একটা ইংরেজি কথা বেরিয়ে আসে। ওর বদলে আমার কী বলা উচিত ছিল?"

রিঙ্কু বলল, "মিটিয়ে। মিটিয়ে বলা যেত।"

রঞ্জন বলল, "ডিম খেয়ে মিটিয়ে? যাঃ, এটা কীরকম যেন শুনতে লাগে!"

জোজো বলল, "ইয়ে বলতে পারতে, রঞ্জনদা! বাংলায় এই একটা চমৎকার শব্দ আছে, ইয়ে, এই ইয়ে দিয়ে সব কিছু বোঝানো যায়। এভরিথিং?"

সন্তু বলল, "হুঁ! এভরিথিং শব্দটা কি ফরাসি?"

লম্বা বারান্দাটা এখন খালি, মোহন সিংকে ঘরটায় আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পাশের ঘরটির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, একদম কোণের ঘরটায় অনেক লোকজনের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একটি লোক সে-ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এদিকে আসতে আসতে সন্তুদের ঘরের সামনে থমকে দাঁড়াল!

রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন!"

রঞ্জন এমনভাবে লোকটিকে ডাকল যেন অনেক দিনের চেনা।

লোকটি ঘরের মধ্যে না ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "একটা কথা জানতে চাই, আপনাদের মধ্যে কি কেউ ডাক্তার আছে?"

রঞ্জন বলল, "না, পাশ করা ডাক্তার কেউ নেই, তবে আমার স্ত্রী আমার ওপরে প্রায়ই নানারকম ডাক্তারি করেন।"

লোকটি বলল, "আপনাদের কাছে থার্মোমিটার আছে?"

রঞ্জন বলল, "ইশ, খুব দুঃখিত। বেড়াতে বেরোবার সময় থার্মোমিটার আনার কথা আমাদের মনেই পড়েনি। আনা উচিত ছিল নিশ্চয়ই!"

লোকটি বেশ নিরাশ হয়ে বলল, "আমাদের সঙ্গের একজন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে একশো পাঁচ ডিগ্রি টেম্পারেচার উঠে গেছে। ইনি খুব নাম-করা, সম্মানিত লোক।"

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "কী নাম?"

লোকটি বলল, "ভগবতীপ্রসাদ শর্মা।"

রঞ্জন বলল, "আমি আবার এত মুখ্যু যে, অনেক বিখ্যাত লোকদেরই নাম শুনিনি।"

কাকাবাবু ঘরের জানলার পর্দা সরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে নদী দেখবার চেষ্টা করছিলেন, হঠাৎ চমকে পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী নাম বললেন? ভগবতীপ্রসাদ শর্মা? মানে, হিস্টোরিয়ান?"

লোকটি বলল, "হাঁ, হাঁ, খুব বড় হিস্টোরিয়ান। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। আমি তাঁর ভাইয়ের ছেলে, আমি চাচাকে প্রায় জোর করে নিয়ে এসেছি, এখন যদি কিছু একটা বিপদ হয়ে যায়..."

কাকাবাবু বললেন, "ভগবতীপ্রসাদ শর্মার তো অনেক বয়েস। প্রায় পঁচাশি-ছিয়াশি হবেই। আমি একবার তাঁকে দেখতে যেতে পারি?"

সেই লোকটি বলল, "হাঁ, হাঁ, যান না। আমি দেখি, নিচে কেয়ারটেকারের কাছে খোঁজ করে কোনও ডাক্তার পাওয়া যায় কি না!"

লোকটি চলে যেতেই কাকাবাবু নিজের হাত-ব্যাগটা খুলে রিভলভার বার করলেন। স্টোর চেম্বার খুলে দেখে নিলেন ভেতরে গুলি আছে কি না! তারপর সেটার ডগায় কয়েকবার ফুঁ দিয়ে পকেটে ভরলেন।

রঞ্জন আর জোজো অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কাকাবাবু হেসে ওদের বললেন, "ও ঘরে খুব সম্ভবত মোহন সিং আছে। লোকটা রেগে আছে আমাদের ওপর। তোমরা একটু সাবধানে থেকো।"

ক্রাচ খটখট করে বারান্দা পেরিয়ে এলেন কোণের ঘরটার কাছে। দরজা ভেজানো। তিনি আস্তে ঠেলে দরজাটা খুললেন।

অতি বৃদ্ধ ভগবতীপ্রসাদ একটা খাটে শুয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। তাঁর মাথায় জলপট্টি। তিন-চারজন লোক ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে খাটের দু'পাশে। তাদের মধ্যে একজন মোহন সিং, তার হাতে একটা টেপ রেকর্ডার, সেটা সে ধরে আছে অসুস্থ বুড়ো লোকটির একেবারে মুখের কাছে।

কাকাবাবুকে ঢুকতে দেখেই মোহন সিং কুটিলভাবে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

কাকাবাবু সেদিকে গ্রাহ্য না করে এগিয়ে এলেন।

মোহন সিং জিজ্ঞেস করল, "আপ ডাগদার হ্যায়? আপকো ইধার কেয়া চাইয়ে?"

কাকাবাবু সে কথার উত্তর না দিয়ে ক্রাচ দুটো খাটের পাশে দাঁড় করিয়ে বৃদ্ধলোকটির একটি হাত ধরলেন! তারপর মোহন সিং-দের দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বললেন, "আপনারা এঁর কথা রেকর্ড করছেন, অথচ ইনি কী বলছেন, তা বুঝতে পারছেন না?"

মোহন সিং-এর পাশের লোকটি বলল, "ইনি পণ্ডিত লোক, জ্বরের ঘোরে ইনি যে-সব কথা বলছেন, সব রেকর্ড করে রাখছি। পরে ভাল করে শুনব। এখন বোঝা যাচ্ছে না!"

কাকাবাবু বললেন, "ইনি ওষুধ চাইছেন! সরবিট্রেট!"

লোকটি বলল, "এখানে আমরা কোথায় ওষুধ পাব? সেইজন্যই তো ডাক্তার ডাকতে গেছে একজন।"

কাকাবাবু বললেন, "এঁর ব্যাগ কোথায়? সেটা খুব ভাল করে দেখুন। এঁর এত বয়েস হয়েছে, নিশ্চয়ই সঙ্গে কিছু ওষুধ রাখেন।"

ওরা দু-তিনজনে মিলে একসঙ্গে ব্যাগ ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল। তারপর প্রায় চার-পাঁচরকম ওষুধ বার করে আনল। কাকাবাবু তার মধ্য থেকে একটা শিশি নিয়ে খুব ছোট্ট একটা ট্যাবলেট বার করলেন, সেটাকে আবার ভেঙে আদ্ধেক করলেন। তারপর খুব যত্ন করে সেই টুকরোটা ঢুকিয়ে দিলেন বৃদ্ধের জিভের তলায়।

তারপর মুখ তুলে কাকাবাবু বললেন, "আপনারা মাথার কাছ থেকে সরে যান। জানলা খুলে হাওয়া আসতে দিন।"

বৃদ্ধের বিড়বিড় করা বন্ধ হয়ে গেল, এক মিনিট পরেই তিনি চোখ মেলে তাকালেন। প্রথমেই কাকাবাবুকে দেখতে পেয়ে তিনি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "তুম কৌন?"

কাকাবাবু বললেন, "শর্মাজি, আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী। অনেকদিন আগে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল দেরাদুনে। আপনি আমাকে চিঠিও লিখেছেন কয়েকটা।"

ভগবতীপ্রসাদ শর্মা কয়েক মুহূর্ত অপলকভাবে তাকিয়ে রইলেন কাকাবাবুর মুখের দিকে।

তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "তুমি...তুমি রাজা রায়চৌধুরী? তুমি মহারাজ কনিষ্কের মুণ্ডু খুঁজে পেয়েছিলে, তাই না?"

একে এত বৃদ্ধ, তার ওপর এমন অসুস্থ, তবু তাঁর এরকম স্মৃতিশক্তি দেখে কাকাবাবু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

বৃদ্ধের চোখ দুটি হঠাৎ যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি ঘরের অন্য সকলের দিকে তাকালেন, মোহন সিংকে জিজ্ঞেস করলেন, "শিবপ্রসাদ কোথায়?"

মোহন সিং বলল, "তিনি ডাক্তার ডাকতে গেছেন। আপনি কেমন আছেন, একটু ভাল বোধ করছেন কি?"

বৃদ্ধ চুপ করে রইলেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "শর্মাজি, আপনি এই বয়েসে এতদূর এসেছেন কেন? আপনার বাড়িতে এখন বিশ্রাম নেওয়াই উচিত।"

মোহন সিং বলল, "আমরা ওনাকে নিয়ে এসেছি। আমরা ওঁর দেখভাল করব। এখনই ডাক্তার এসে যাবে। আপনি ওনাকে বেশি কথা বলাবেন না।"

বৃদ্ধ নিজের কম্পিত হাত তুলে কাকাবাবুর একটা হাত চেপে ধরে অন্যদের বললেন, "তোমরা সবাই ঘরের বাইরে যাও! রাজা রায়চৌধুরী, শুধু তুমি থাকো!"

মোহন সিং বলল, "চাচাজি, আমরা আপনার সেবা করব। এখন আপনি বেশি কথা বলবেন না।"

বৃদ্ধ আবার বললেন, "তোমরা সবাই বাইরে যাও। রাজার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

খুব অনিচ্ছের সঙ্গে মোহন সিং আর তার দলবল বাইরে চলে গেল। বৃদ্ধ কাকাবাবুকে ইঙ্গিত করলেন, দরজাটা বন্ধ করে দেবার জন্য।

মোহন সিং টেপ রেকর্ডারটা চালু করে বিছানার ওপর রেখে গেছে। বৃদ্ধ নিজেই এবার উঠে বসে সেটা বন্ধ করে দিলেন। কাকাবাবুকে খুব কাছে ডেকে বললেন, "একটা বিশেষ কাজে এসেছি এখানে, রাজা। এই শরীর নিয়ে আমার এখানে আসা উচিত ছিল না। কিন্তু এটাই হবে আমার শেষ আবিষ্কার। যদি আমি হঠাৎ মরে যাই, তবে তোমাকে সে দায়িত্ব নিতে হবে। তুমি ঠিক পারবে।

কাকাবাবু বললেন, "আপনি উঠছেন কেন, শুয়ে থাকুন। আর কোনও ওষুধ খাবেন?"

বৃদ্ধ বললেন, "না, এখন একটু ভাল বোধ করছি। শোনো, আগে কাজের

কথা বলি। তুমি তোমার কানটা আমার মুখের কাছে নিয়ে এসো, যেন আর কেউ শুনতে না পায়! তোমার কানে কানে বলব।"

কাকাবাবু মাথাটা ঝুঁকিয়ে আনলেন।

সেই বৃদ্ধ চোখের নিমেষে বালিশের তলা থেকে একটা রিভলবার বার করে কাকাবাবুর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "সাবধান! একটু নড়লেই তোমার জীবন শেষ! এইবার বলো তো রাজা রায়চৌধুরী, তুমি আমাকে ফলো করে এখানে এসেছ কেন? তোমার কী মতলব?"

কাকাবাবু মাথা সরালেন না। কিন্তু সেই অবস্থাতেই হেসে বললেন, "এ তো ভারী মজার ব্যাপার দেখছি! আমি আপনাকে ফলো করব কেন? আপনি একটা দলবলের সঙ্গে এখানে এসেছেন, আর আমিও কয়েকজনকে নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছি। আমরা আলাদা আলাদাভাবে আসতে পারি না?"

বৃদ্ধ বললেন, "তুমি সত্যি বেড়াতে এসেছ, না অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ? তুমি তো এমনি-এমনি কোথাও যাও না!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি এমনি কোথাও যাই না! আমি কি ইচ্ছেমতন বেড়াতে পারব না? আমি আজকাল আর অন্য লোকের কাজ নিই না। বেড়াতেই ভালবাসি।"

"সত্যি কথাটা বলো। নইলে, আমি ঠিক গুলি করব।"

"গুলি করুন! আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করতে পারব না যে প্রোফেসর ভগবতীপ্রসাদ শর্মা মানুষ খুন করতে পারেন!"

"সত্যি দেখতে চাও গুলি করতে পারি কি না? আমি বলব, তুমি আমার গলা টিপে ধরতে এসেছিলে, তাই আমি সেল্‌ফ ডিফেন্সে গুলি করেছি!"

"আমি আপনার গলা টিপে ধরতে যাব কেন? একটা কিছু মোটিভ তো থাকা দরকার। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, আপনার গায়ে হাত তোলার কথা আমি চিন্তাই করি না। আপনার হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নেওয়া কি আমার পক্ষে খুব শক্ত হত?"

বৃদ্ধ ফিসফিস করে বললেন, "রাজা রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি ভাল করেই চিনি, দরজার আড়াল থেকে মোহন সিং-রা দেখছে, তাই আমি এই অভিনয় করছি। মোহন সিং-এর দল তোমাকে দেখে চিন্তায় পড়ে গেছে। আমি এখন তোমাকে যে-কয়েকটা কথা বলছি, তা খুব মন দিয়ে শোনো। আর কেউ যেন জানতে না পারে। আমি হঠাৎ মরে গেলে তুমি আমার কাজটা সম্পূর্ণ করবে।"

এরপর বৃদ্ধ আরও আস্তে-আস্তে কয়েকটা কথা বললেন, শুনতে-শুনতে কাকাবাবুর কপাল কুঁচকে গেল।

তারপর আবার গলা চড়িয়ে বৃদ্ধ বললেন, "এবার তোমায় ছেড়ে দিলাম। যদি প্রাণের মায়া থাকে, তা হলে খবর্দার আমার সামনে তুমি আর আসবে না।"

এই সময় দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা পড়ল। একজন কেউ চেঁচিয়ে বলল, "ডাক্তার আ গয়া। খোলিয়ে, খোলিয়ে!"

বৃদ্ধ চোখ টিপে বললেন, "মনে রেখো, আমার কথাগুলো।"

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন।

শর্মাজির ভাইপো কোথা থেকে একজন ডাক্তার জোগাড় করে এনেছে। সবাই বৃদ্ধের খাটের দিকে এগিয়ে গেল। শুধু মোহন সিং কাকাবাবুর কাঁধটা খামচে ধরে বলল, "রায়চৌধুরী, প্রোফেসর সাহেব তোমাকে কী কথা বললেন? সাফ খুলে বলো!"

কাকাবাবু বললেন, "বলছি, তুমি বারান্দার ওই কোণে চলো। খুব জরুরি কথা।"

মোহন সিং কাকাবাবুর কাঁধটা ছাড়ল না, প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলল। একটা ক্রাচ পিছলে গিয়ে কাকাবাবু প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন একবার। তবু রিভলভারটা বার করলেন না। তাঁর ক্রাচ দুটো খসে পড়ে গেল মাটিতে।

বারান্দার এই কোণটা বেশ অন্ধকার মতন। দিনের বেলা এখান থেকে তুঙ্গাভদ্রা নদীর বাঁধ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখন সবকিছুই ঝাপসা।

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, "তোমাদের প্রোফেসর-সাহেবের সঙ্গে আমার অনেক দিনের চেনা। তিনি আমার কানে-কানে বললেন, তুমি ওই মোহন সিংকে একটু ভদ্রতা শিখিয়ে দিও তো! ও সবসময় নিজেকে সিনেমার ভিলেন মনে করে।"

মোহন সিং ধমক দিয়ে বলল, "তুমি আমার সঙ্গে মজা মারছ, ঠিক করে বলো।"

কাকাবাবু বললেন, "ভদ্রলোকের কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে নেই, জানো না? হাত সরাও!"

মোহন সিং আরও কিছু বলতে গেল, তার আগেই হঠাৎ কাকাবাবু একটু নিচু হয়ে তার ডান চোখে খুব দ্রুত একটা ঘুসি চালালেন। মোহন সিং একটা আর্ত চিৎকার করে কাকাবাবুর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে চোখ চাপা দিল।

কাকাবাবু এবার মোহন সিং-এর কাঁধটা ধরে এক ঝটকায় তার শরীরটা উলটে দিলেন। মোহন সিং বারান্দার রেলিং-এর ওপারে শূন্যে ঝুলতে লাগল। এতই ভয় পেয়ে গেছে সে যে, মুখ দিয়ে শুধু আঁ-আঁ শব্দ করছে, আর কোনও কথা বলতে পারছে না। তার অত বড় শরীরটা যে কাকাবাবু অবলীলাক্রমে তুলে ফেলতে পারবেন, তা যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

কাকাবাবু বললেন, "এবার আমি তোমাকে নিচে ফেলে দিতে পারি। কিন্তু ভদ্রলোকেরা মানুষকে চট করে এত কঠিন শাস্তি দেয় না। আর কখনও নিজের বন্ধুবান্ধব ছাড়া অন্য কারও কাঁধে হাত দিয়ে কথা বোলো না। আর দু'নম্বর হল, *ইন্ডিয়া ইজ আ ফ্রি কান্ট্রি, যার যেখানে খুশি যেতে পারে।* আমি হামপি-তে যাব কি যাব না, তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন?"

মোহন সিং দু' হাত দিয়ে রেলিংটা ধরার চেষ্টা করছে। কাকাবাবুর মুঠি একটু আলগা হয়ে গেলেই সে পড়ে যাবে। এর মধ্যেই সে একবার চেঁচিয়ে উঠল, "বিরজু, বিরজু!"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার ওই বিরজু লোকটা পেট্রোল পাম্পে আমাদের রঞ্জনকে অকারণে একটা ধাক্কা দিয়েছিল। তাকেও বলে দিও যেন যখন তখন সে গায়ের জোর না দেখায়।"

খুব জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি মোহন সিংকে ফিরিয়ে আনলেন বারান্দায়। সেখানে তাকে ঠেসে ধরে কাকাবাবু আবার বললেন, "ভগবতীপ্রসাদ শর্মা আমার গুরুর মতন। উনি হুকুম করলে আমি ওঁর পা-ধোওয়া জলও খেতে পারি। উনি বুঝেছেন যে, আমরা শুধু ছুটিতে বেড়াতে এসেছি, আমাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। আমরা তোমাদের কোনও ব্যাপারে ডিসটার্ব করব না। তোমরাও আমাদের ডিসটার্ব কোরো না।"

মোহন সিংকে ছেড়ে দিয়ে কাকাবাবু ক্রাচ দুটো তুলে নিলেন। তারপর হাঁটতে শুরু করলেন পেছন ফিরে।

মোহন সিং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সে যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে, কাকাবাবুর হাতে এত জোর। তার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ শব্দ হচ্ছে।

◀ ৩ ▶

সন্তু চোখ মেলে দেখল, তার পাশে জোজো গভীরভাবে ঘুমিয়ে আছে। আলোয় ভরে গেছে ঘর। এখন ক'টা বাজে কে জানে? রোদ্দুরের রং দেখে মনে হয়, বেশ বেলা হয়েছে। রঞ্জন আগের রাত্রেই বলে রেখেছিল, আজ সে অনেক দেরি করে উঠবে। কোনও তাড়া তো নেই।

জোজোকে না ডেকে সন্তু বাইরে বেরিয়ে এল।

দোতলায় আর কোনও মানুষজনের চিহ্ন নেই। পাশের ঘরগুলো খালি। মোহন সিং-এর দলবল, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, সবাই উধাও।

হাওয়ায় একটু শীত-শীত ভাব। সন্তু পরে আছে শুধু পাজামা আর গেঞ্জি, সেই অবস্থাতে সে চলে এল বারান্দার একধারে। এখান থেকে তুঙ্গভদ্রা নদী ভাল করে দেখা যায় না, বাঁধটা অনেক উঁচু, তাতে খানিকটা ঢাকা পড়ে গেছে।

সন্তু উঁকি দিয়ে দেখল, নিচের বাগানে একটা লোহার বেঞ্চে বসে আছেন কাকাবাবু। গায়ে একটা চাদর। অন্যমনস্কভাবে আঙুল বোলাচ্ছেন গোঁফে।

সন্তু নেমে এল বাগানে। কাকাবাবুর পায়ের কাছে একটা চায়ের ট্রে, তাতে দুটি কাপ, দুটি কাপেই চা ঢালা হয়েছিল। কিন্তু কাকাবাবু ছাড়া বাগানে আর কোনও লোককে দেখতে পাওয়া গেল না।

কাকাবাবু প্রথমটায় সন্তুকে দেখতে পেলেন না। কাকাবাবু কিছু একটা নিয়ে চিন্তা করছেন, সন্তু তাই কোনও কথা না বলে এগিয়ে গেল বাঁধের দিকে। এখানে নদী বেশ চওড়া, সকালের আলোয় রূপোর মতন ঝকঝক করছে। নদী দেখতে সন্তুর সব সময়ই ভাল লাগে। কোনও নদীই একরকম নয়। কতদিন আগে থেকে বইছে এই নদী, এর দু'পারে কত মানুষ থেকে গেছে, কত গ্রাম-নগর ধ্বংস হয়েছে, তবু নদী ঠিক একইরকমভাবে বয়ে চলেছে।

সন্তুর ইচ্ছে হল—এই নদীতে নেমে একবার সাঁতার কাটবে। জোজোকে ডাকা দরকার। জোজো অবশ্য সাঁতার জানে না, জলকে ভয় পায়, তবু জোজোকে পারে দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে। একদম একলা-একলা জলে নামতে ভাল লাগে না। এখানে আর কেউ স্নান করছেও না, দু-একটা মাছ-ধরা নৌকো দেখা যাচ্ছে শুধু।

সন্তু বাঁধ থেকে নেমে আসতেই কাকাবাবু তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "সবাই এখনও ঘুমোচ্ছে? এবার ডাকো, ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়া যাক।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি একদম চান-টান করে বেরোব, না দুপুরে আবার ফিরে আসব?"

কাকাবাবু বললেন, "এখনও গরম পড়েনি, বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা আছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়াই ভাল, হামপি দেখতে অনেকক্ষণ লাগবে। সবাই মিলে চান করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে না?"

এই সময় দেখা গেল রঞ্জন আর রিঙ্কু নেমে আসছে বাগানের দিকে। রঞ্জনের চুল উসকোখুসকো, চোখে এখনও ঘুম লেগে আছে মনে হয়। রিঙ্কু কিন্তু এরই মধ্যে বেশ ফিটফাট হয়ে গিয়েছে।

রঞ্জন একটু দূর থেকেই বলল, "সুপ্রভাত কাকাবাবু, আপনার কাছে ঘড়ি আছে? এই রিঙ্কু শুধু-শুধু আমাকে ধাক্কা মেরে-মেরে বিছানা থেকে তুলল। আমি যত বলছি, এখন সাড়ে ছ'টার বেশি হতেই পারে না। এখনও ভোর রয়েছে।"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "আমার হাতে ঘড়ি নেই, কিন্তু আকাশে তো মস্ত বড় একটা ঘড়ি রয়েছে। সেটার দিকেই তাকিয়ে বলা যায়, এখন অন্তত সাড়ে আটটা বেজে গেছে।"

রঞ্জন বলল, "তা হলে তো ঠিকই আছে। দক্ষিণ দেশে ন'টার পর সকাল হয়, তার আগেকার সময়টাকে এরা বলে ভোর।"

রিঙ্কু বলল, "রঞ্জনকে না ডাকলে ও সারাদিন ঘুমোতে পারে, জানেন!"

রঞ্জন বলল, "তাতেই বোঝা যায়, আমার হেল...হেল... মানে স্বাস্থ্য কত ভাল। আবার দরকার হলে আমি সারারাত জেগে থাকতে পারি। এখন একখানা বেশ ভাল করে অবগাহন স্নান করতে হবে, কী বলো শ্রীমান সন্তু? আমার সঙ্গে সন্তরণ প্রতিযোগিতা হবে নাকি? শুনেছি তুমি ভাল সাঁতার জানো। তুঙ্গাভদ্রা নদী এপার-ওপার করার চ্যা...চ্যা... বাজি ফেলবে?"

হঠাৎ রঞ্জন অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে, বাংলা খেলা তো কাল রাত্তিরেই শেষ হয়ে গেছে। আমি এত কষ্ট করে বাংলা বলছি কেন? গুড্ মর্নিং-এর বদলে সুপ্রভাত বলে ফেললুম! আজ সারাদিন প্রাণ ভরে ইংরেজি বলব!"

রিঙ্কু বলল, "শুধু-শুধু ইংরেজি বলার দরকারই বা কী? গুডমর্নিং-এর বদলে সুপ্রভাত শুনতে তো বেশ ভালই লাগে!"

রঞ্জন বলল, "তুমি বাজে কথা বোলো না। তোমার কাল সবচেয়ে বেশি ফাইন হয়েছে। টাকাটা তুমি আজই সন্তুর কাছে জমা করে দাও, মেরে দেবার চেষ্টা কোরো না!"

কাল রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর হিসেব করা হয়েছিল, কে কতগুলো ইংরেজি বলে ফেলেছে। রিঙ্কু আর রঞ্জন প্রায় সমান-সমান, রিঙ্কু আঠাশ টাকা আর রঞ্জনের সাতাশ।

রঞ্জন আবার সন্তুকে বলল, "কী, আমার সঙ্গে সুইমিং কমপিটিশানে নামতে রাজি আছ? তুঙ্গভদ্রা এপার-ওপার, একশো টাকা বাজি। চ্যালেঞ্জ!"

রিঙ্কু বলল, "রাজি হয়ে যা, সন্তু! একশো টাকা পেয়ে যাবি। রঞ্জন সাঁতারই জানে না!"

রঞ্জন আকাশ থেকে পড়ার মতন অবাক হয়ে বলল, "আমি সাঁতার জানি না? আমি একটা জেনুইন বাঙাল, আমাদের সাতপুরুষ পূর্ববাংলার নদী-নালার দেশে ...তুমি জানো, ওখানে চার বছরের বাচ্চারাও পুকুরে ডুব-সাঁতার দিতে শিখে যায়।"

রিঙ্কু বলল, "তুমি তো আর কোনদিন পূর্ববাংলায় ছিলে না! তোমায় আমি কোনওদিন সাঁতার কাটতে দেখিনি!"

রঞ্জন বলল, "দেখোনি, আজ দেখিয়ে দিচ্ছি! আমি কলকাতার গঙ্গা কতবার এপার-ওপার করেছি! ও হ্যাঁ, জোজো কোথায়? সে নিশ্চয়ই আমার থেকেও বড় চ্যাম্পিয়ান? জোজো খুব সম্ভব কোনও সমুদ্র এপার-ওপার করেছে।"

সন্তু বলল, "জোজো এখনও জাগেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের সাঁতারের কেরামতি এখন দেখতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তোমরা যদি স্নান করেই বেরোতে চাও তো বাথরুমেই স্নান করে নাও। আমার মনে হয়, হামপি দেখতে হলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়াই ভাল।"

রঞ্জন বলল, "কাকাবাবু, আপনার আর সন্তুর চা খাওয়া হয়ে গেছে দেখছি। আমরাও এই বাগানে বসেই বেড-টি খাব! অ্যাই সন্তু, একটু চায়ের কথা বলে দে না ভাইটি!"

সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু চা খায়নি আমার সঙ্গে। অন্য একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি চা খেতে-খেতে গল্প করছিলেন আমার সঙ্গে।"

গেস্ট হাউসের একজন বেয়ারা এদিকেই আসছিল কাপগুলো নিতে, তাকেই বলে

দেওয়া হল চায়ের কথা। দোতলার বারান্দায় দেখা গেল জোজোকে। সন্তু তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, আমরা যে হামপি দেখতে যাচ্ছি, সেখানে আসলে কী দেখার আছে একটু বুঝিয়ে বলুন তো!"

কাকাবাবু বললেন, "হামপি এখানকার একটি গ্রামের নাম। এককালে ওইখানেই ছিল বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানী। বিজয়নগরের কথা ইতিহাসে পড়েছ নিশ্চয়ই।"

রঞ্জন বলল, "আমি অঙ্কে খুব ভাল তো, সেইজন্য ইতিহাস আর ভূগোলে খুব কাঁচা। তা ছাড়া ইস্কুল ছাড়বার পর তো আর ইতিহাস পড়িনি! বিজয়নগর নামে একটা রাজ্য ছিল বুঝি?"

রিঙ্কু ধমক দিয়ে বলল, "অ্যাই রঞ্জন, তুমি বিজয়নগরের কথা জানো না! বিজয়নগর আর বাহমনি, এই দুটো রাজ্যের মধ্যে সবসময় লড়াই হত!"

সন্তু বলল, "হরিহর আর বুক্ক নামে দুই ভাই বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল দক্ষিণ ভারতে। দিল্লিতে তখন পাগলা রাজা মহম্মদ বিন তুঘলকের আমল। সেটা ফোরটিন্থ সেঞ্চুরির মাঝামাঝি।"

রঞ্জন সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "বাহ্, তোর তো বেশ ইতিহাসে মাথা। সেঞ্চুরি পর্যন্ত মনে আছে। হ্যাঁ বুঝলাম, বিজয়নগর নামে একটি রাজ্য ছিল, তার রাজারা সবসময় মারপিট করত। তারপর?"

কাকাবাবু বললেন, "হামপিতে সেই এককালের বিরাট শহর বিজয়নগরের রুইনস আছে। সেইগুলোই দেখতে যাচ্ছি।"

রঞ্জন অবহেলার সঙ্গে বলল, "ওঃ হিস্টোরিক্যাল রুইনস? তার মানে তো দু-চারটে ভাঙা দেওয়াল আর আধখানা মন্দির, আর-একটা লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা গেট। যে-জায়গাটায় হাতি থাকত সেই জায়গাটাই দেখিয়ে গাইডরা বলবে, এটাই ছিল মহারানির প্রাসাদ। এই তো? এ-আর দেখতে কতক্ষণ লাগবে? বড়জোর একঘন্টা! এই হিস্টোরিক্যাল রুইনস-টুইনসগুলো সাধারণত খুব বোরিং হয়।"

রিঙ্কু বলল, "মোটেই না! আমার এসবগুলো দেখতে খুব ভাল লাগে।"

রঞ্জন বলল, "ঠিক আছে, আমি গাছতলায় শুয়ে থাকব। তোমরা যত খুশি পেট ভরে দেখো দু'ঘন্টা, তিনঘন্টা, তার বেশি তো লাগবে না! লাঞ্চের আগেই শেষ হয়ে যাবে। আমি বলি কী, এই গেস্ট হাউস ছাড়ার দরকার নেই, আমরা এখানেই ফিরে আসব আবার। রাত্তিরটা জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।"

জোজো বাগানে এসে সন্তুর পাশে দাঁড়িয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, "হামপিতে যদি ভাঙাচোরা জিনিস ছাড়া আর কিছুই দেখবার না থাকে, তা হলে ওই মোহন সিং সেখানে যেতে আমাদের বারণ করল কেন? কাকাবাবুকে শাসালই বা কেন?"

রঞ্জন বলল, "দ্যাট ইজ আ মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন। আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছিলুম। আমরা হামপি বেড়াতে গেলে ওর অসুবিধের কী আছে?

তা ছাড়া ওই গণ্ডারটা কাকাবাবুকে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা কাজ দিতে চেয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "এখন একটু-একটু মনে পড়ছে, ওই মোহন সিং-এর ভাই সুরয সিংকে আমি একবার জব্দ করেছিলুম। সুরয সিং এখন জেল খাটছে। সেইজন্যে আমার ওপর মোহন সিং-এর রাগ থাকতে পারে। পঞ্চাশ হাজার টাকার লোভটা কেন দেখিয়েছিল বুঝতে পারছি না। আমাকে কোনও ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল বোধহয়।"

রিঙ্কু বলল, "ওর কথায় আমরা ভয় পাব নাকি! আমরা হামপি দেখতে এসেছি, সেখানে যাবই। কাকাবাবুর সঙ্গে ওরকম একটা জায়গা দেখার চান্স আর কখনও পাব? কাকাবাবু সবকিছু ভাল বুঝিয়ে দিতে পারবেন। চলো, চলো, সবাই তৈরি হয়ে নাও!"

আধঘন্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়া হল। গেস্ট হাউসটা না ছেড়ে সেখানে রেখে যাওয়া হল কিছু জিনিসপত্র। সবাই ওঠার পর রঞ্জন গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, "ওই মোহন সিং ব্যাটা সিনেমায় ডাকাতের পার্ট করে, ব্যবহারটাও ডাকাতের মতন। আবার ওদের দলে একজন আশি নব্বই বছরের থুত্থুরে বুড়ো, সে নাকি একজন নামকরা পণ্ডিত, এই অদ্ভুত কম্বিনেশনটা আমি বুঝতে পারছি না।"

রিঙ্কু বলল, "ওরা দলবল মিলে সবাই হামপিতে গেছে নিশ্চয়ই। চলো, একটু পরেই সব বোঝা যাবে।"

ওদের দু'জনের এই কথা শুনে কাকাবাবু একটু মুচকি হাসলেন, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না।

কিছুদূর যাবার পর একটা ছোট্ট শহর মতন দেখা গেল। সেটার নাম হসপেট। কিছু দোকানপাট, হোটেল আর রেল স্টেশন আছে।

গেস্ট হাউসে শুধু ডিম আর পাউরুটি ছাড়া আর কিছু ছিল না বলে ওরা সেখানে ব্রেকফাস্ট খায়নি। ডিম আর টোস্ট তো রোজই খাওয়া হয়, বাইরে বেড়াতে এসেও ওসব খেতে ভাল লাগে না। রিঙ্কুর আজ পুরি-তরকারি-জিলিপি খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে।

সেরকম দু-তিনটে দোকান দেখা গেল। রঞ্জন গাড়ি দাঁড় করাল একটা দোকানের সামনে। সকালবেলার শীত-শীত ভাবটা এরই মধ্যে চলে গেছে, আজ অবশ্য সঙ্গে খাবার জল নেওয়া হয়েছে তিন বোতল।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে কাকাবাবু বললেন, "এখান থেকে হামপি আর ছ-সাত কিলোমিটার দূরে। কিন্তু একসময় বিজয়নগর রাজ্য শুরু হয়েছিল প্রায় এখান থেকেই। এইদিক দিয়েই পর্তুগিজরা আসত গোয়া থেকে। ওরা ঘোড়া বিক্রি করত। বিজয়নগরের রাজারা ঘোড়া আমদানি করত ইওরোপ থেকে। পর্তুগিজরা সেই ঘোড়া সাপ্লাই দিত।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "ইউরোপ থেকে ঘোড়া কিনত কেন? আমাদের দেশে তখন ঘোড়া পাওয়া যেত না?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, পাওয়া যেত। কিন্তু সেগুলো ছোট-ছোট! ইওরোপের ঘোড়া অনেক বড় আর তেজি বেশি। তখনকার দিনে যে-রাজার যত বেশি শক্তিশালী অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী থাকত, তারাই যুদ্ধে জিতে যেত।"

সন্তু বলল, "আমাদের দেশের ঘোড়াগুলো সব টাট্টু ঘোড়া?"

কাকাবাবু বললেন, "সব নয় বেশির ভাগ। ভাল জাতের গোড়া বিদেশ থেকেই এসেছে।"

রঞ্জন বলল, "সেইসব ভাল ভাল ঘোড়া যুদ্ধেই মরে গেছে নিশ্চয়ই। এখানকার টাঙার ঘোড়াগুলো দেখুন, বেতো-বেতো, রোগা-রোগা!"

এই শহরের রাস্তা দিয়ে টাঙ্গার মতন একরকম গাড়ি যাচ্ছে অনেক। রঞ্জনের কথাই ঠিক, সেগুলো কোনও তাগড়া ঘোড়াই নয়।

পাঁচজনের এই দলটি গিয়ে বসল একটা রেস্তোরাঁর দোতলায়। এর মধ্যে রঞ্জনের চেহারাটাই আগে চোখে পড়ে। লম্বা-চওড়া, মুখভর্তি দাড়ি, আজ সে মাথায় একটা টুপি পরেছে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতন। অনেকেই তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

খাবারের অর্ডার দেবার পর রঞ্জন বলল, "হামপিতে যাবার পর যতদূর মনে হচ্ছে ওই মোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা হবেই। সে যদি আবার ধমকাধমকি শুরু করে, তা হলে আমাদের স্ট্র্যাটেজি কী হবে, সেটা আগে ঠিক করে ফেলা যাক।"

রিঙ্কু বলল, "ইশ, ধমকালেই হল নাকি! বিজয়নগরটা কী ওর মামাবাড়ি? ও যদি গায়ে পড়ে আর-একটা কথা বলতে আসে, তা হলে ওকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দেব!"

রঞ্জন বলল, "কাকাবাবু, জানেন তো, রিঙ্কুর ধারণা, ভারতবর্ষের সব পুলিশ ওর হুকুম শুনতে বাধ্য।"

রিঙ্কু বলল, "কেন শুনবে না? একজন লোক যদি অন্যায় করে, পুলিশ তাকে ধরবে না?"

জোজো বলল, "তোমরা আমার ওপর ছেড়ে দাও! এবার মোহন সিং কিছু করতে এলে আমি একাই ওকে টিট করব!"

রঞ্জন বলল, "তা জোজো পারবে। জোজো সব পারে।"

টেবিলের ওপর থেকে একটা ছোট প্লাস্টিকের বাটি তুলে নিল জোজো। সেই বাটিতে রয়েছে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। এদিককার লোকেরা খুব ঝাল খায়, সব খাবারে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে নেয়। জোজো পকেট থেকে রুমাল বার করে তাতে ঢেলে নিল লঙ্কার গুঁড়োগুলো। তারপর রুমালটা পুঁটুলি বেঁধে পকেটে রাখল।

সন্তু বলল, "হাতটা ধুয়ে নে জোজো। নইলে কখন নিজের হাত চোখে লাগিয়ে কান্নাকাটি শুরু করবি।"

রিঙ্কু বলল, "এসব করবার দরকার নেই। লোকটাকে আমি ঠিক পুলিশে ধরাব!"

রঞ্জন বলল, "অর্থাৎ কিছুই ঠিক হল না। কাকাবাবু কিছু বলছেন না, তার মানে তিনি কিছু একটা ঠিক করে রেখেছেন। যাকগে! বিজয়নগর দেখার পর আমরা কোথায় যাব?"

রিঙ্কু বলল, "এরপর আমরা গোয়া যাব!"

রঞ্জন বলল, "সে তো অনেক দূরে! অতখানি কে গাড়ি চালাবে?"

সন্তু বলল, "রঞ্জনদা, ওই যে তুঙ্গাভদ্রা নদী আমরা দেখলাম, সেই নদী কোনও এক জায়গায় কৃষ্ণা নদীতে মিশেছে। সেইখানটায় একবার গেলে হয় না?"

রঞ্জন বলল, "গ্রেট আইডিয়া, একসঙ্গে দুটো নদীর জল লুটোপুটি, হুটোপুটি করছে, সেটা তো দেখতেই হবে! সেখানে আমরা সাঁতার কাটব, কী বলো সন্তু?"

রঞ্জন এ-কথায় এত উৎসাহিত হয়ে গেল যে, ঝটপট সাত-আটখানা পুরি আর আলুর দম খেয়ে নিয়েই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি, সবাই তাড়াতাড়ি করো। আগে আমরা ইতিহাস-ফিতিহাস দেখা সেরে নিই, তারপর চলে যাব তুঙ্গাভদ্রার ধার দিয়ে দিয়ে কৃষ্ণা নদীর দিকে। আঃ, কৃষ্ণা নদী, কী সুন্দর নাম!"

রঞ্জনের তাড়ায় গরম গরম কফি পেয়ালায় ঢেলে খেতে হল জোজো আর সন্তুকে। তারপর আবার গাড়িতে চড়া।

হামপিতে ঢোকার মুখে একদল গাইড দাঁড়িয়ে থাকে। বিজয়নগরের ভাঙা রাজধানী অনেকটা ছড়ানো, দেখবার জিনিসগুলো বেশ দূরে-দূরে, গাইডের সাহায্য ছাড়া খুঁজে পাওয়া মুশকিল। রঞ্জনের গাড়িটা গেটের কাছে থামতেই চার-পাঁচজন গাইড ছুটে এল।

কাকাবাবু বললেন, "গাইড নেবার দরকার নেই। জায়গাগুলো আমার মোটামুটি মনে আছে।"

গাইডরা সবাই মিলে একসঙ্গে বলতে লাগল, "অনেক নতুন নতুন জায়গা বেরিয়েছে। অনেক জায়গা খুঁড়ে নতুন জিনিস বেরিয়েছে!"

রঞ্জন বলল, "আরে ভাই, হামলোগ নতুন জিনিস দেখনে নেহি আয়া। হামলোগ পুরনো ইতিহাস দেখে গা!"

একজন গাইড তবু জোর করে সামনের দরজা খুলে কাকাবাবুর পাশে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, কাকাবাবু একটা হাত তুলে তাকে আটকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আমাদের গাইড হতে চান তো? তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। রাম রায় যখন বিজয়নগর আক্রমণের কথা শুনলেন, তখন তিনি কী করছিলেন?"

লোকটি থতমত খেয়ে বলল, "রাম রায়?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি রাম রায়ের নামও শোনেননি? তা হলে আপনি

আমাদের গাইড হবেন কী করে? আমার সঙ্গে এই ছেলেমেয়েরা যে অনেক প্রশ্ন করবে?"

গাইডটি গাড়ির দরজা থেকে একটু সরে গেল। তারপর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে কলা দেখিয়ে বলল, "ঠিক আছে, যাও না, যাও! তোমরা কিছুই দেখতে পাবে না! কিছুই দেখতে পাবে না!"

রঞ্জন আবার গাড়ি স্টার্ট দিল বটে, কিন্তু ভুরু কুঁচকে বলল, "লোকটা কি আমাদের অভিশাপ দিল নাকি?"

রিঙ্কু হাসতে হাসতে বলল, "লোকটা খুব রেগে গেছে! ও বেচারা কী করে বুঝবে যে বিখ্যাত আরকিওলজিস্ট রাজা রায়চৌধুরী এই গাড়িতে আছেন, আর তিনি ওকে ইতিহাসের পড়া ধরবেন!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, রাম রায় কে ছিলেন? এখানকার শেষ রাজা?"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, রাজা নন। ব্যাপারটা বোঝাতে গেলে অনেকটা লম্বা ইতিহাস বলতে হয়।"

রঞ্জন বলল, "না, না, দরকার নেই। ইতিহাস যত ছোট হয়, ততই ভাল। ফজলি আমের চেয়ে যেমন ন্যাংড়া আম মিষ্টি সেইরকমই, বড় ইতিহাসের চেয়ে ... মানে, আমরা যখন ওইসব ভাঙা দেওয়াল-টেওয়াল দেখব, তখন ছোট্ট করে ইতিহাসটা শুনে নেব।"

রিঙ্কু ধমক দিয়ে বলল, "রঞ্জন, তোমার শুনতে ইচ্ছে না করে চুপ করে থাকো। কাকাবাবু, আপনি বলুন তো!"

কাকাবাবু বললেন, "সামনে অত ভিড় কিসের বলো তো? পুলিশ-টুলিসও দেখা যাচ্ছে।"

রাস্তাটা সবে একটা বাঁক নিয়েছে, একটু দূরে দেখা গেল প্রচুর লোক জমে আছে। আরও কিছু লোক সেই দিকে ছুটছে। একটা বোমা ফাটার মতন জোর শব্দও হল।

কাকাবাবু বললেন, "ওইখানেই মেইন গেট। কিছু একটা ঘটেছে মনে হচ্ছে!"

একটা বড় গেট দেখা যাচ্ছে। সেখানেই লোকেরা ঠেলাঠেলি করছে, কয়েকজন পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে সরিয়ে দিতে চাইছে তাদের।

রঞ্জন সেই গেটের উলটো দিকের মাঠে গাড়িটা থামিয়ে বলল, "আপনারা বসুন, আমি দেখছি।"

গাড়ির চাবিটা আঙুলে ঘোরাতে-ঘোরাতে সে এগিয়ে গেল। একটু বাদেই হাসতে হাসতে ফিরে এসে বলল, "আজ আর ভেতরে ঢোকাই যাবে না। আজ সব বন্ধ!"

রিঙ্কু ভুরু কুঁচকে বলল, "ভেতরে ঢোকা যাবে না মানে? কেন ঢোকা যাবে না?"

রঞ্জন দাড়ি চুমরে বলল, "এখন ওই গাইডটার অভিশাপের মানে বুঝতে পারছি।

ও সব জানত। আমাদের সঙ্গে গাড়িতে এ পর্যন্ত এসে কিছুই না জানার ভান করে পয়সা আদায় করার তালে ছিল।"

রিঙ্কু বলল, "গাইডের কথা বাদ দাও! ভেতরে যাওয়া যাবে না কেন, কী হয়েছে?"

রঞ্জন বলল, "বললুম না, আজ বন্ধ। ভিজিটারস নট অ্যালাউড! ওখানে একটা সিনেমার শুটিং হচ্ছে। পুলিশ কাউকে কাছে যেতে দিচ্ছে না।"

রিঙ্কু আরও রেগে গিয়ে বলল, "সিনেমার শুটিং হচ্ছে বলে আমরা যেতে পারব না? কতদূর থেকে এসেছি, এমনি-এমনি ফিরে যাব? আমি গিয়ে ওদের বলছি! এটা বেআইনি!"

রিঙ্কুর সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু আর জোজোও নেমে গেল গাড়ি থেকে। কাকাবাবু গাড়ির মধ্যে বসে থেকেই দরজাটা খুলে দিলেন হাওয়া খাওয়ার জন্য। রঞ্জন নাকে একটিপ নস্যি নিয়ে বলল, "এইবার দেখা যাবে রিঙ্কুর তেজ কেমন গ্যাস বেলুনের মতন ফুটো হয়ে যায়! ওর সাধের পুলিশরাই ওকে কড়কে দেবে!"

রিঙ্কুরা ফিরে এল মিনিট-দশেক বাদে। ওদের মুখ-চোখ দেখেই বোঝা গেল কিছু সুবিধে হয়নি। রিঙ্কু রাগে একবারে ছটপট করছে।

রঞ্জন মজার সুরে জিজ্ঞেস করল, "কী হল? পারমিশন পেয়ে গেছ?"

সন্তু বলল, "শুটিং-এর সময় কাউকে ঢুকতে দেবে না।"

জোজো বলল, "খুব জোর একটা ফাইটিং সিন হচ্ছে মনে হচ্ছে। ওরা বলল, বিকেল পাঁচটার আগে কাউকে ভেতরে যেতে দেবে না।"

রঞ্জন রিঙ্কুকে খোঁচা মেরে বলল, "তুমি পুলিশের কাছে নালিশ করলে না? সিনেমা তো করছে মোহন সিং! তোমার পুলিশরা কী বলল?"

রিঙ্কু রাগে-দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, "এইসব ঐতিহাসিক জায়গা এখন ন্যাশনাল মনুমেন্টস। সিনেমার শুটিং হচ্ছে বলে পাবলিক সেখানে ঢুকতে পারবে না? এটা অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়। কতকগুলো কনস্টেবল ওখানে রয়েছে, তারা কোনও কথাই শুনতে চায় না!"

রঞ্জন বলল, "তা হলে এখন কী করা যায় সেটা বলো? বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এখানে এই রোদ্দুরের মধ্যে বসে থাকার কোনও মানে হয় না!"

রিঙ্কু বলল, "এখানে বসে থাকব না, বিকেলে আবার ফিরে আসব!"

রঞ্জন বলল, "তাতেও কোনও সুবিধে হবে না। সিনেমার শুটিং পাঁচটা বললে সাতটায় শেষ হবে! কিংবা আজ হয়তো শেষই হবে না। কালও এইরকম চলবে! আমি যা বুঝতে পারছি, হামপি দেখার কোনও আশা আমাদের নেই। এইজন্যই মোহন সিং এখানে আসতে বারণ করেছিল। খুব খারাপ কিছু বলেনি!"

রিঙ্কু বলল, "তুমি বলতে চাও, আমরা এই জায়গাটা না দেখে ফিরে যাব? অসম্ভব!"

রঞ্জন বলল, "তা ছাড়া আর উপায় কী বলো! আমি তো তোমাদের বাধা দিইনি! অবশ্য আমি পার্সোনালি খুব একটা হতাশ হইনি। আমার ভাই অত ইতিহাসের দিকে ঝোঁক নেই। ভাঙা দেওয়াল, ভাঙা দুর্গ আর মন্দির-টন্দির সব জায়গাতেই প্রায় এক। তোমরা চাও তো, অন্য জায়গায় তোমাদের ওইসব জিনিস দেখিয়ে দেব। এখন আমি সাজেস্ট করছি, এখানে শুধু-শুধু বসে থেকে কোনও লাভ নেই। চলো, কৃষ্ণা আর তুঙ্গভদ্রা নদীর সঙ্গমের দিকে যাই, রাস্তায় খাবারদাবার কিনে নেব, সেখানে পিকনিক করব, একসঙ্গে দুটো নদীর জলে সাঁতার কাটব! ইতিহাসের চেয়ে জ্যান্ত প্রকৃতি অনেক ভাল!"

রিঙ্কু বলল, "আমরা বিজয়নগর না দেখে ফিরে যাব? কাকাবাবু, আপনি কিছু বলছেন না?"

কাকাবাবু আকাশের দিকে চেয়েছিলেন। আকাশে অনেকগুলি চিল কিংবা শকুন উড়ছে একসঙ্গে। সম্ভবত বোমার শব্দে তারা এখান থেকে উড়ে গেছে।

কাকাবাবু সেখান থেকে চোখ নামিয়ে বললেন, "রঞ্জন, তোমার ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ নেই। কিন্তু এখানে অন্য একটা ভারী চমৎকার দেখার বা শোনার জিনিস আছে। রাজধানী বিজয়নগর প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেলেও এর ভেতরে একটা মন্দির আছে, সেটা খুব বেশি ভাঙেনি। তার নাম এরা এখন বলে, বিঠলস্বামী টেম্পল! সেই মন্দিরটার মজা কী জানো তো, সেটা হচ্ছে মিউজিক্যাল টেম্পল! তার মানে, সেই মন্দিরের এক-একটা থামে একটু জোরে আঘাত করলে নানারকম সুর বেরোয়।"

রঞ্জন চোখ বড়-বড় করে বলল, "থামে আঘাত করলে সুর বেরোয়?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সাতটা থামে টোকা মারলে তুমি সা-রে-গা-মা শুনতে পাবে। আর এক জায়গায় পুরো একটা গানের সুর। একটা থামে তবলার লহরা!"

রঞ্জন গান-বাজনা খুব ভালবাসে। সে খুব কৌতূহলের সঙ্গে কাকাবাবুর কথা শুনল। তারপর বলল, "এটা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না, কাকাবাবু! মন্দিরের থামে টোকা দিলে সা-রে-গা-মা, তবলার লহরা শোনা যায়? যাঃ, হতেই পারে না! আষাঢ়ে গপ্পো!"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "ইস্তাম্বুলে এরকম মন্দির আছে!"

রঞ্জন বলল, "ইস্তাম্বুলে তো আমরা এখন যেতে পারছি না ভাই! তা ছাড়া ইস্তাম্বুলে কোনও মন্দির আছে বলেও শুনিনি।"

রিঙ্কু বলল, "রঞ্জন, তুমি বড্ড ইয়ে হয়ে গেছ! কাকাবাবু কি তোমায় মিথ্যে কথা বলবেন!"

রঞ্জন বলল, "আমি সে-কথা বলছি না। তবে, সিয়িং ইজ বিলিভং! মানে, নিজের চোখে না দেখলে, নিজের কানে না শুনলে এসব কথা বিশ্বাস করা যায় না! তুমি আমার সঙ্গে বাজি ধরবে! কত, একশো টাকা?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি ওর সঙ্গে বাজি ধরছ কেন? কথাটা তো বলেছি আমি! চলো, তা হলে মন্দিরটা দেখে আসা যাক!"

রঞ্জন বলল, "যাব কী করে? যাবার উপায় নেই বলেই তো আপনি আমাকে এত ধোঁকায় ফেলে দিলেন!"

কাকাবাবু বললেন, "কেন যাওয়া যাবে না? ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।"

কাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে পড়তেই রঞ্জন একগাল হেসে বলল, "ও তাই বলুন! আপনার আইডেন্টিটি কার্ড দেখলেই পুলিশরা আপনাকে রাস্তা ছেড়ে দেবে! আপনাকে কেউ আটকাবে না, সেকথা এতক্ষণ বললেই হত।"

রিঙ্কু কিংবা সন্তু-জোজোর মুখে অবশ্য কোনও আশার ভাব ফুটল না। তারা এইমাত্র পুলিশের সঙ্গে তর্ক করে এসেছে। অতি সাধারণ সব কনস্টেবল, তারা কোনও কথাই বুঝতে চায় না। সিনেমা কোম্পানির কিছু লোকও সেখানে রয়েছে, তারা খালি চেঁচিয়ে বলছে, "হঠাও, ভিড় হটাও!"

এরা কি কাকাবাবুকে পাত্তা দেবে?

কাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে বললেন, "তোমরা গাড়ি বন্ধ করে চলে এসো আমার সঙ্গে।"

ভিড় ঠেলে কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন একেবারে সামনে। সন্তু মনে মনে একটু ভয় পাচ্ছে। সে জানে, কাকাবাবু কোনওদিন কাউকে আইডেন্টিটি কার্ড দেখান না। এমনকী কাকাবাবুর সেরকম কোনও কার্ড আছে কি না তাই-ই সে জানে না।

এই দলটাকে খুব সামনে এগিয়ে আসতে দেখে দু'জন কনস্টেবল রুক্ষভাবে বলল, "হঠো, হঠো, দূর হঠো!"

কাকাবাবু আঙুল তুলে একটু দূরের একজন ষণ্ডামার্কা লোককে দেখিয়ে পুলিশদের বললেন, "আমরা এই সিনেমা ইউনিটের লোক। ওই লোকটাকে ডাকো, ও ঠিক বুঝবে!"

রঞ্জন সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "আমাকে গলাধাক্কা দিয়েছিল! কী যেন নাম ওর, বিরজু সিং, তাই না?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "এবার দ্যাখো না, কী মজা হয়!"

পুলিশরা কাকাবাবুর কথা শুনেও দ্বিধা করছিল, কাকাবাবু আবার তাদের বললেন, "আমরা মোহন সিং-এর মেহমান। কেন দেরি করছ, ওই বিরজু সিং-কে এখানে ডেকে আনো!"

এবার একজন সেপাই ছুটে গেল। বোঝা গেল যে, মোহন সিং-এর নামটা এদের খুব চেনা, সেই নামটাকে ওরা ভক্তি করে কিংবা ভয় পায়।

সেপাইয়ের কথা শুনে এগিয়ে এল বিরজু সিং। কাকাবাবুকে দেখে সে যেন ভূত দেখার মতন চমকে উঠল। ভুরু দুটো কপালে তুলে সে বলল, "আপ? রাজা রায়চৌধুরী?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমি একা নই। মোহন সিং-কে খবর দাও, আমার সঙ্গে আরও চারজন আছে, আমরা ভেতরে যাব!"

বিরজু সিং আর কোনও কথা না বলে উলটো দিকে ফিরে এক দৌড় দিল।

দূরে আবার শোনা গেল বোমা ফাটার মতন শব্দ। কতকগুলো ঘোড়া চিঁ-হিঁ-হিঁ করে উঠল। অবশ্য আসল জায়গাটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

একটু বাদেই দূর থেকে ধুলো উড়িয়ে ছুটে এল একটা ঘোড়া। তার পিঠে জরি মখমলের পোশাক-পরা একজন বিরাট চেহারার লোক। কোমরবন্ধের একদিকে তলোয়ার, আর-একদিকে পিস্তল। মাথায় পালক দেওয়া শিরস্ত্রাণ। ইতিহাস বইয়ের পাতায় এই রকম মানুষের ছবি আঁকা থাকে।

সিনেমার পার্টের জন্য মেকআপ নিলেও সন্তুরা চিনতে পারল মোহন সিংকে। জোজো পকেটে হাত দিয়ে চেপে ধরল শুকনো লঙ্কার পুঁটলিটা, রঞ্জন হাতে নিল নস্যির কৌটো।

ঘোড়া চালিয়ে মোহন সিং থামল একেবারে কাকাবাবুর সামনে। প্রায় এক মিনিট হাঁ করে তাকিয়ে থেকে সে আস্তে-আস্তে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী, আপনি সত্যি এসেছেন? এসে বলেছেন কী যে আপনি আমার মেহমান?"

কাকাবাবু হাল্‌কাভাবে বললেন, "হ্যাঁ, এসে পড়লাম। আমাদের সিনেমার শুটিং দেখার খুব ইচ্ছে। পুলিশরা ঢুকতে দিচ্ছিল না, তাই তোমার নাম বললাম। কেন, তোমার কোনও আপত্তি আছে নাকি?"

ঘোড়া থেকে নেমে মোহন সিং কাকাবাবুর একেবারে নাকের সামনে এসে দাঁড়াল।

একটু দূরে বিরজু সিং আরও কয়েকটি গুণ্ডা ধরনের লোক নিয়ে আসছে।

কাকাবাবু পিছন ফিরে একজন পুলিশকে বললেন, "আমাদের গাড়িটার ওপর একটু নজর রেখো ভাই। আমরা খানিক বাদেই ফিরে আসব!"

তারপর তিনি মোহন সিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "চলো, এবার যাওয়া যাক!"

মোহন সিং হঠাৎ যেন বদলে গেল। বেশি-বেশি বিনয় দেখিয়ে সে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "নমস্তে, নমস্তে! আইয়ে, আইয়ে! আপনার মতন গুণী লোক শুটিং দেখতে এসেছেন, এ তো অতি ভাগ্যের কথা। জানেন মিঃ রায়চৌধুরী, এর আগে অনেক মন্ত্রী আর সরকারি অফিসার শুটিং দেখতে চেয়েছিল, কারও কথায় পাত্তা দিইনি। কিন্তু আপনাদের কথা আলাদা!"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা বেশিক্ষণ থাকব না। মোহন সিং, আপনার মেকআপ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি শুটিং করতে করতে চলে এসেছেন? আপনার ব্যস্ত হবার কোনও দরকার নেই। আমরা ঘুরে-ঘুরে চারপাশটা দেখেই চলে যাব।"

মোহন সিং বলল "আপনার যতক্ষণ ইচ্ছে হয় থাকবেন। প্রোফেসর শর্মাজি

আমাদের বলে রেখেছেন যে, মিঃ রাজা রায়চৌধুরী এলে তাঁকে খাতির-যত্ন করবে। আপনি এই জায়গাটার হিস্ট্রির বিষয়ে অনেক কিছু জানেন। শুটিং-এর সময় আপনি অ্যাডভাইস দিতে পারবেন।"

জোজো হঠাৎ উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল।

সবাই সেদিকে ফিরতেই জোজো বলল, "আমার চোখে কী যেন কামড়েছে হঠাৎ!"

তারপরেই দু'হাতে চোখ চাপা দিয়ে সে আর্তনাদ করতে লাগল, "উঃ, জ্বলে গেল! চোখ জ্বলে গেল! আমি অন্ধ হয়ে যাব!"

রঞ্জন সন্তুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

রিঙ্কু ব্যস্ত হয়ে বলল, "জল! কোথায় জল পাওয়া যাবে? ওর চোখে জলের ঝাপটা দিতে হবে।"

মোহন সিং পেছন ফিরে হুকুম দিল, "বিরজু, এই মেহমানদের টেন্টে নিয়ে যাও। চা-পানি পিলাও। আমি শর্মাজিকে খবর দিয়ে আসছি।"

অন্ধ মানুষের মতন জোজোকে ধরে-ধরে নিয়ে চলল সন্তু। জোজো অনবরত "উঃ আঃ, মরে গেলুম," বলে যাচ্ছে। সন্তু তার কানে-কানে ফিসফিস করে বলল, "তোকে হাতটা ভাল করে ধুয়ে নিতে বলেছিলুম না!"

একটু দূরেই পরপর তিনটে তাঁবু খাটানো। বাইরে রঙিন ঝালর আর ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। একটা তাঁবু বেশ বড়, তার মধ্যে অনেকগুলি চেয়ার। একপাশে তবলা, ঢোল, সেতার, সারেঙ্গি এইসব রাখা। আর-একপাশে অনেকগুলো তলোয়ার, খন্তা, কোদাল আর শাবল।

ওদের সেই তাঁবুর মধ্যে এনে বিরজু সিং বলল, "আপলোগ বৈঠিয়ে। আমি এক্ষুনি পানি নিয়ে আসছি।"

একটু পরেই একজন লোক এক জাগ জল নিয়ে এল। রিঙ্কু সেটা নিয়ে বলল, "জোজো, চোখ খোলো। আমি ঝাপটা দিয়ে দিচ্ছি।"

জোজো কিছুতেই চোখ খুলতে পারছে না, রঞ্জন এসে চেপে ধরল তার হাত। সন্তু জোর করে তার চোখের পাতা খুলে দেবার চেষ্টা করল, রিঙ্কু জল ছিটিয়ে দিতে লাগল তার মুখে।

রঞ্জন বলল, "নিজের অস্ত্রে নিজেই ঘায়েল!"

রিঙ্কু বলল, "চুপ। এখন ওসব বলে না!"

মিনিট-পাঁচেক বাদে জোজো অনেকটা সুস্থ হল। তার জামা ভিজে গেছে অনেকখানি। একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে সে বসে রইল আচ্ছন্নের মতন।

কাকাবাবু বললেন, "কিছু ক্ষতি হবে না। এত জলের ঝাপটায় চোখটা বরং পরিষ্কার হয়ে গেল। তা হলে আর দেরি করে কী হবে? চলো, যাওয়া যাক। জোজো, আর কোনও অসুবিধে নেই তো?"

জোজো এখনও চোখ খুলছে না। সে বলল, "না, ঠিক আছে, যেতে পারব।"

রঞ্জন বলল, "জোজো চোখ বুজে-বুজে শুটিং দেখবে। তাতেই বোধহয় বেশি ভাল দেখা যাবে!"

বিরজু সিং বলল, "না, না, আপনারা বসুন। শুটিং শুরু হতে দেরি আছে। এই রোদ্দুরের মধ্যে কোথায় ঘুরবেন। এখানে বসে আরাম করুন।"

কাকাবাবু বললেন, শুটিং শুরু না হলেও আমরা ততক্ষণ মন্দির-টন্দিরগুলো দেখি। বিঠলস্বামীর মন্দিরটা এদের দেখাব বলেছি।"

বিরজু বলল, "ওই মন্দিরের সামনে একটা অন্য সেট তৈরি হচ্ছে। বাঁশ বাঁধা হচ্ছে। এখন গেলে কিছুই দেখতে পাবেন না। বিকেলবেলা আপনাদের নিয়ে যাব সেখানে!"

কাকাবাবু বললেন, "বিকেল পর্যন্ত তো আমরা এখানে থাকব না?"

এই সময় মোহন সিং ফিরে এসে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনারা এসেছেন শুনে প্রোফেসর শর্মাজি খুব খুশি হয়েছেন। উনি একবার ডাকছেন আপনাকে। জরুরি কথা আছে। আপনি পাঁচ মিনিটের জন্য ঘুরে আসবেন? আপনার লোকেরা ততক্ষণ বসুক এখানে।"

কাকাবাবু ক্রাচ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঠিক আছে, শর্মাজির সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। কতদূর যেতে হবে?"

মোহন সিং বলল, "এই তো কাছেই। উনি এইরকম আর-একটা তাঁবুতে আছেন। উনি এই ফিল্মে পার্টও করছেন জানেন তো? দেখবেন চলুন, কীরকম মেকআপ নিয়েছেন।"

কাকাবাবু ভুরু তুলে বললেন, "তাই নাকি? উনি সিনেমায় পার্ট করছেন? এই বয়েসে?"

মোহন সিং বলল, "জি হাঁ। উনি রাম রায় সেজেছেন! খুব মানিয়েছে!"

সেই থুত্থুরে বুড়ো লোকটি সিনেমায় পার্ট করছে শুনে সন্তু-রঞ্জনদের মুখে একটা হাসির ঢেউ খেলে গেল।

কাকাবাবু ওদের বললেন, "তোরা বোস তা হলে। আমি চট করে ঘুরে আসি। অন্য কোথাও চলে যাসনি যেন!"

কাকাবাবুকে নিয়ে ওরা চলে যাবার পর সন্তু তাঁবুর এক কোণায় গিয়ে একটা তলোয়ার তুলে নিল হাতে। রঞ্জনও আর-একটা তুলে নিয়ে সামনের দিকে দু'বার ঘুরিয়ে বলল, "কী সন্তু, হবে নাকি সোর্ড-ফাইট?"

সন্তু বলল, "আমি তলোয়ার খেলতে জানি না। আপনি শিখেছেন বুঝি?"

রঞ্জন দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, "অনেকদিন আগে। স্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জারের চেয়ে একটু কম ভাল পারি। এদেশে চ্যাম্পিয়ান।"

সন্তু বলল, "সিনেমার জন্য অনেক সেট বানাতে হয়। মাটি-ফাটি খুঁড়তে লাগে বোধহয়। সিনেমায় যত রাজবাড়ি-ফাড়ি দেখা যায়, সবই তো নকল!"

তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বিরজু সিং আবার ঢুকতেই ওরা তলোয়ার দুটো রেখে দিল।

বিরজু সিং-এর হাতে একটা ট্রে-তে চার গেলাস শরবত। বেশ লম্বা-লম্বা গেলাস, তাতে ভর্তি শরবতের ওপর বরফের টুকরো ভাসছে।

রঞ্জন প্রথমেই হাত বাড়িয়ে একটা গেলাস তুলে নিয়ে বলল, "আরে, এসব আবার কেন?"

বিরজু বলল, "বাইরে গরম। একটু ঠাণ্ডা খেয়ে নিন!"

রঞ্জন বলল, "জোজো, খেয়ে নে, তোর চোখ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

রিঙ্কু বলল, "আমি শরবত খাব না।"

বিরজু তার কাছে এসে বলল, "খান, খেয়ে দেখুন। পেস্তা আর মালাইয়ের শরবত। শুটিং-এর সময় সবাই দু-তিন গেলাস করে খায়।"

রঞ্জন প্রথম চুমুক দিয়ে বলল, "চমৎকার। আমারও দু-তিন গেলাস খেতে ইচ্ছে করছে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিঙ্কুকে নিতে হল গেলাসটা।

বিরজু সিং রঞ্জনকে বলল, "আপনি আর-এক গেলাস নেবেন? আমি আনছি।"

রঞ্জন বলল, "না, না, আমার আর চাই না। এমনিই বলছিলাম।"

রঞ্জন দ্বিতীয় চুমুকেই সবটা শেষ করে ফেলল। বিরজু সিং বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

রিঙ্কু বলল, "আমার ভাল লাগছে না। বড্ড বেশি মিষ্টি! সবটা খাব না!"

সন্তু আর জোজো প্রায় শেষ করে এনেছে। রঞ্জন বলল, "রিঙ্কু, তুমি সবটা খাবে না? তা হলে আমাকে দিয়ে দাও!"

জোজোর হাত থেকে খসে পড়ল গেলাসটা। মেঝেতে দড়ির কার্পেট পাতা, তাই গেলাসটা ভাঙল না।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী হল রে? গেলাসটা ফেলে দিলি?"

জোজো একটা বিরাট হাই তুলে বলল, "আমার ঘুম পাচ্ছে।"

সন্তু নিচু হয়ে গেলাসটা তুলতে যেতেই ঝিমঝিম করে উঠল তার মাথা। কী হচ্ছে তা বোঝবার আগেই সে জ্ঞান হারিয়ে ঘুরে পড়ে গেল কার্পেটের ওপর।

◀ ৪ ▶

চোখ মেলার পর সন্তু দেখতে পেল আকাশ। কয়েকটা তারা ঝিকমিক করছে। চারপাশে জমাট বাঁধা অন্ধকার। দু-এক মিনিট সন্তু আকাশের দিকেই তাকিয়ে রইল। সে যে কোথায় শুয়ে আছে তা নিয়ে চিন্তাও করল না।

একটু-একটু করে ঘুমের ঘোর কেটে তার মাথাটা পরিষ্কার হতে লাগল। সে চিত হয়ে শুয়ে আছে। পাশের দিকে হাত চাপড়ে বুঝতে পারল, বিছানা নেই, পাথর ও ঘাস। এটা তা হলে কোন্ জায়গা?

চারপাশে ঝিঁঝি ডাকছে। আকাশ ছাড়া আর কোনও দিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাছের ডালপালার মধ্যে বাতাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। এটা কি তা হলে কোনও জঙ্গল?

প্রায় খুব কাছেই একটা শেয়ালের ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। শেয়ালটা হঠাৎ এত জোরে ডেকে উঠেছে যে, তার বুকটা ধক করে উঠেছে। এদিক-ওদিক হাত চালিয়ে সে একটা পাথরের চাঁই খুঁজে পেয়ে সেটা ধরে বসে রইল।

কিন্তু শেয়ালটা তাকে কামড়াতে এল না। শুকনো পাতার ওপর দৌড়োবার শব্দ শুনে বোঝা গেল, সেটা দূরে চলে যাচ্ছে।

শেয়ালটার ডাক শুনে চমকাবার জন্যই তার মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল একেবারে।

এবারে সে মনে করবার চেষ্টা করল কী-কী ঘটেছে। সকালবেলা সবাই মিলে বেড়াতে আসা হল হামপিতে। মোহন সিং তাদের খাতির করে বসাল একটা তাঁবুতে। কাকাবাবুকে ডেকে নিয়ে গেল, ওদের শরবত খেতে দিল। তারপর? আর কিছু মনে নেই।

ওই শরবতের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল।

ওরা কি মৃত ভেবে সন্তুকে এই পাহাড়ি জঙ্গালে ফেলে দিয়ে গেছে?

সন্তু নিজের গায়ে হাত বুলোল। তার নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে। তা হলে সে মরেনি। উঠে দাঁড়িয়ে সে দু-তিনবার লাফাল। না, তার শরীরে ব্যথা-ট্যাথাও কিছু নেই। সে শুধু অজ্ঞান হয়েছিল এতক্ষণ।

অন্য সবাই কোথায় গেল?

অন্ধকারটা এখন অনেকটা চোখে সয়ে গেছে। একটু-একটু জ্যোৎস্নাও আছে। অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে গাছপালা। এই বনে শেয়াল ছাড়া আরও কোনও হিংস্র জন্তু আছে নাকি? পাথরের চাঁইটা সন্তু আবার তুলে নিল মাটি থেকে।

কাকাবাবুর অসম্ভব সাহস। বাঘের গুহায় মাথা গলাবার মতন তিনি মোহন সিং-এর নাম করেই হামপির মধ্যে ঢুকলেন। তারপর মোহন সিং-এর সঙ্গেই নির্ভয়ে কোথায় চলে গেলেন! কাকাবাবুও কি ওই শরবত খেয়েছেন? মোহন সিং আগেই কাকাবাবুকে সরিয়ে নিয়ে গেল। কাকাবাবু থাকলে বোধহয় একচুমুক দিয়েই ওই শরবত যে বিষাক্ত তা বুঝতে পারতেন।

জোজো আর রঞ্জনদার কী হল? রিঙ্কুদি সবটা খায়নি। রঞ্জনদা খেয়েছে দেড় গেলাস। সর্বনাশ!

এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। জায়গাটা ঢালু মতন। মনে হচ্ছে কোনও পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গা। এখান থেকে নামতে হবে।

একটুখানি যেতেই সন্তুর পায়ে কিসের যেন ধাক্কা লাগল। পাথর কিংবা গাছ নয়, কোনও জন্তু কিংবা মানুষ!

প্রথমে ভয় পেয়ে সন্তু ছিটকে সরে এল। কিন্তু প্রাণীটা কোনও নড়াচড়া করছে না দেখে সে ভাবল, তাদেরই দলের কেউ হতে পারে। হ্যাঁ, মানুষই, একপাশ ফিরে শুয়ে আছে। প্যান্ট পরা।

কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সে মানুষটির মুখে হাত বুলিয়ে দেখল দাড়ি নেই। তার মানে রঞ্জনদা নয়। তা হলে জোজো।

সে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল, "জোজো, এই জোজো, ওঠ্।"

কোনও সাড়াশব্দ নেই। সন্তু নাকের নিচে হাত নিয়ে দেখল, নিশ্বাস পড়ছে। গা-টা ঠাণ্ডা নয়। তা হলে জোজোও বেঁচে আছে।

বেশ কয়েকবার ধাক্কা দেবার পর জোজো হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "কে? কে? কে? কে?"

সন্তু বলল, "ভয় নেই, আমি! আমি! আমি! উঠে বোস!"

জোজো বলল, "আমি কে? কে আমি?"

সন্তু বলল, "আমায় চিনতে পারছিস না? উঠে বোস। এখানে সাপ-টাপ থাকতে পারে।"

সন্তু জানে যে জোজো সাপের কথা শুনলেই দারুণ ভয় পায়। কিন্তু এখন সে তা শুনেও উঠল না। কাতর গলায় বলল, "সন্তু, আমার মাথাটা পাথরের মতন ভারী হয়ে আছে। আমায় টেনে তোল। আমি উঠতে পারছি না, এত জলতেষ্টা পেয়েছে যে গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।"

সন্তু তাকে ধরে-ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, "এটা একটা পাহাড়, এখানে জল কোথায় পাব? চল, নিচে নেমে দেখি।"

"আমি হাঁটতে পারব না রে, সন্তু। পায়ে জোর নেই। বুকটা ধড়ফড় করছে!"

"চেষ্টা করতেই হবে। আমাকে ধরে আস্তে-আস্তে চল।"

"কাকাবাবু কোথায়?"

"জানি না! রঞ্জনদাদেরও খুঁজতে হবে। ভাগ্যিস তোকে পেয়ে গেলুম!"

"আমার মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমি আর বাঁচব না, কিছুতেই বাঁচব না এবার। মা-বাবার সঙ্গে আর দেখা হবে না! এই অন্ধকারের মধ্যে তুই কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে?"

"অত ভেঙে পড়িস না, জোজো। পাহাড়ের নিচে গেলে একটা কোনও রাস্তা পাওয়া যাবেই। সত্যি, আমার অন্যায় হয়েছে। তুই এবার আসতে চাসনি, তোকে

আমি প্রায় জোর করে নিয়ে এসেছি। এরকম যে কাণ্ড হবে ভাবতেই পারিনি। এবার তো শুধু বেড়াবার কথা ছিল!"

"আমরা এই পাহাড়ের ওপর এলুম কী করে? আমরা কতদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলুম? আজ কত তারিখ?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না এখনও!"

খানিকটা নেমে আসার পর সন্তু দাঁড়াল। জোজোকে প্রায় পিঠে করে বয়ে আনতে হচ্ছে বলে সে হাঁপিয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে শুকনো পাতার ওপর খরখর শব্দ হচ্ছে, তা শুনে চমকে-চমকে উঠতে হয়। মানুষ না কোনও জন্তু? হঠাৎ দূরে আর-একটা শেয়াল ডেকে উঠতেই জোজো ভয় পেয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সন্তুকে।

সন্তু বলল, "সিধে হয়ে দাঁড়া, জোজো। তুই আর-একটু হলে আমাকে ফেলে দিচ্ছিলি! শেয়ালের ডাক চিনিস না? শেয়াল আমাদের কী করবে?"

জোজো বলল, "যদি এই জঙ্গলে বাঘ থাকে?"

"বাঘ থাকলে এতক্ষণে আমাদের খেয়ে ফেলত অজ্ঞান অবস্থাতেই!"

"পাহাড়ের ওপর দিকে বাঘ থাকে না, নিচের দিকে থাকতে পারে!"

"তা বলে কি আমরা নিচে নামব না? শুধু-শুধু ভয় পেয়ে কোনও লাভ নেই। সব সময় বাঁচার চেষ্টা করতে হয়। এবার তুই নিজে-নিজে হাঁটতে পারবি না?"

"হ্যাঁ পারব।"

"আমি ভাবছি, রঞ্জনদারা কোথায় গেল? আর সবাইকেও এই পাহাড়েই ফেলে দিয়ে গেছে? কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে খুঁজব কী করে?"

"চেঁচিয়ে ডাকব?"

"ওরা যদি এখনও অজ্ঞান হয়ে থাকে? তবু ডেকে দেখা যাক!"

দু'জনে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার করতে লাগল, "রঞ্জনদা! রিঙ্কুদি! কাকাবাবু!"

বেশ কয়েকবার গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কাছাকাছি দু-একটা গাছের পাখিরা ভয় পেয়ে ডানা ঝটপটিয়ে উঠল।

জোজোর হাত ধরে সন্তু বলল, "দিনের আলো না ফুটলে জঙ্গলের মধ্যে ওদের খোঁজা যাবে না। বরং তার আগে আমরা নিচে নেমে দেখি, অন্য কোনও সাহায্য পাওয়া যায় কি না! আমার হাত ছাড়িস না!"

জোজো বলল, "আমি জলতেষ্টায় মরে যাচ্ছি! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! মনে হচ্ছে তিন-চারদিন জল খাইনি।"

আর খানিকটা নামতেই জঙ্গলের মধ্যে একটা রাস্তা পাওয়া গেল। সামান্য জ্যোৎস্নার আলোয় সেই রাস্তা ধরে-ধরে ওরা এগোতে লাগল। পাহাড়টা বেশি উঁচু নয়, টিলার মতন। সমতলে পৌঁছতে আর ওদের দেরি হল না।

সামনেই ওরা দেখতে পেল একটা নদী। জলে কেউ নেমেছে, সেই আওয়াজ

হচ্ছে। একটুখানি এগিয়ে একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সন্তু দেখল, একটা কোনও জন্তু জল খাচ্ছে, সেটা কুকুরও হতে পারে, শেয়ালও হতে পারে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একবার জন্তুটা এদিকে মুখ ফেরাল। আগুনের গোলার মতন জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখ।

জন্তুটা ওদের দেখতে পেল কি না কে জানে, কিন্তু এদিকে তেড়ে এল না। হঠাৎ জল খাওয়া থামিয়ে সে নদীটার ধার দিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

সন্তু আর জোজো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জন্তুটা অনেক দূর চলে যাবার পর জোজো ফিসফিস করে বলল, "লেপার্ড? হায়না? উল্‌ফ?"

সন্তু বলল, "বুঝতে পারলুম না। চল, আমরাও জল খেয়ে নিই!"

জোজো আঁতকে উঠে বলল, "এই নদীর জল খাব? নোংরা, পলিউটেড, কত কী থাকতে পারে।"

সন্তু বলল, "খুব বেশি তেষ্টার সময় ওসব ভাবলে চলে না।"

জোজো তবু বলল, "এইমাত্র একটা জন্তু যে-জল খেয়ে গেল, আমরা সেই জল খাব?"

সন্তু বলল, "এই হাওয়াতেই তো জন্তু-জানোয়াররা নিশ্বাস নেয়, তা বলে কি আমরা নিশ্বাস নেব না? তুই যদি জল না খেয়ে আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারিস তো থাক, পরে ভাল জল খুঁজে দেখব।"

সন্তু চলে গেল নদীর ধারে। হাঁটু গেড়ে বসে এক আঁজলা জল তুলে দেখল, বেশ টলটলে আর স্বচ্ছ। নদীতে স্রোত আছে। সেই জল সন্তু মুখে দিল, তার বিস্বাদ লাগল না। সে পেট ভরে জল খেয়ে নিল।

এবার জোজোও ছুটে এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। জন্তুদের মতনই চোঁ-চোঁ করে জল টানতে লাগল ঠোঁট দিয়ে। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। প্রায় দু-তিন মিনিট পরে সে মুখ তুলে বলল, "আঃ বাঁচলুম! সাধে কী বলে জলের আর এক নাম জীবন! জল খেতে-খেতে আমি আর-একটা কী ভাবলুম বল তো সন্তু?"

"কী?"

"তোর খিদে পাচ্ছে?"

"সেরকম কিছু টের পাচ্ছি না। অজ্ঞান অবস্থায় বোধহয় খিদে থাকে না।"

"কিন্তু আমরা যদি তিন-চারদিন না খেয়ে থাকতুম, তা হলে খালি পেটে এতটা জল খেলেই গা গুলিয়ে উঠত, পেট ব্যথা করত। আমরা সকালে বেশ হেভি ব্রেকফাস্ট খেয়েছিলুম, পুরি-তরকারি, তারপর শুধু দুপুর আর রাত্তিরটা খাওয়া হয়নি। খুব সম্ভব একদিনের বেশি কাটেনি।"

"এটা বোধহয় তুই ঠিকই ধরেছিস!"

"নদীর ওপারে দ্যাখ, এক জায়গায় মিটমিট করে আলো জ্বলছে, একটা ঘর রয়েছে।"

নদীটা বেশি চওড়া নয়। প্রায় একটা সরু খালের মতন। কতটা গভীর তা অবশ্য বলা যায় না। জলে বেশ স্রোত আছে, হেঁটে পার হবার চেষ্টা করে লাভ নেই। সন্তু এক্ষুনি এটা সাঁতরে চলে যেতে পারে, কিন্তু জোজোর কী হবে? জোজো সাঁতার জানে না! কতবার জোজোকে সন্তু বলেছে সাঁতারটা শিখে নিতে।

সন্তু চারপাশটা দেখে নিয়ে বলল, "আমার যতদূর মনে হচ্ছে, নদীর ওপার দিয়েই আমাদের যেতে হবে। হসপেট থেকে হামপি আসবার পথে আমরা কোনও পাহাড় দেখিনি। হামপিতে ঢোকার আগে আমি হামপির পেছন দিকে কয়েকটা টিলা লক্ষ্য করেছিলুম। সেইরকম একটা টিলাতেই আমাদের ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল বোধহয় অজ্ঞান অবস্থাতেই আমাদের শেয়াল-টেয়াল ছিঁড়ে খাবে।"

জোজো বলল, "অত সহজ নয়! আমাদের মেরে ফেলা অত সহজ নয়! অ্যাই সন্তু, তুই তখন বললি কেন রে, তুই এবারে আমাকে জোর করে এনেছিস? আমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি! এসেছি তো কী হয়েছে? এ তো অতি সামান্য বিপদ! জানিস, একবার আফ্রিকায় আমি আর আমার এক মামা কী অবস্থায় পড়েছিলুম? নরখাদকেরা আমাদের দু'জনকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে..."

সন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "বুঝেছি, বুঝেছি, তুই এখন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিস। কিন্তু এখন এই নদীটা পার হওয়া যাবে কী করে?"

জোজো বলল, "নো প্রবলেম। নদীটার ধার দিয়ে-দিয়ে হাঁটি, কোনও একটা জায়গায় নদীটা শেষ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই!"

সন্তু বলল, "নদীর শেষ খুঁজতে গিয়ে যদি সমুদ্রে পৌঁছে যাই? শোন, তোকে আমি পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি। আমার লাইফ সেভিংসের ট্রেনিং আছে। কিন্তু তার আগে তোকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, তুই জলে নেমে ভয় পাবি না, ভয় পেয়ে আমার গলা আঁকড়ে ধরবি না! তা হলে কিন্তু তোকে আমি ফেলে দেব!"

জোজো বলল, "ঠিক আছে। এ তো অতি সহজ ব্যাপার। আমি আলতো করে তোর পিঠটা ছুঁয়ে থাকলেই ভেসে থাকতে পারব। আমি প্রায় থ্রি-ফোর্থ সাঁতার জানি। একবার ক্যাস্পিয়ান সাগরে..."

সন্তু আবার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "থ্রি-ফোর্থ সাঁতার বলে কিছু হয় না। হয় কেউ সাঁতার জানে, অথবা জানে না। এখন বেশি কথা বলার সময় নেই। জুতো খুলে ফ্যাল!"

জোজো বলল, "ওটা কী রে, সন্তু?"

ওদের বাঁ পাশে নদীর জলে একটা ঝুড়ির মতন কী যেন ভাসছে। সাধারণ ঝুড়ির পাঁচ-ছ' গুণ বড়। সন্তু সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "ইউরেকা! আর জামা-প্যান্ট ভেজাতে হল না। এটা তো একটা ডিঙি নৌকো। আমি কোনও গল্পের বইতে পড়েছিলুম, সাউথ ইন্ডিয়ার কোনও-কোনও নদীতে নৌকোগুলো হয় গোল-গোল। বুঝতে পেরেছি, এটা একটা খেয়াঘাট, তাই নৌকোটা এখানে বাঁধা রয়েছে।"

সন্তু আগে নৌকোটাতে উঠল, তারপর জোজোর হাত ধরে টেনে নিল। দেখলে মনে হয় গোল ঝুড়িটা মানুষের ভারে ডুবে যাবে, কিন্তু ওঠার পর বোঝা গেল, সেটা বেশ মজবুত। কিন্তু বৈঠা হাতে নিয়ে চালাতে গিয়ে সন্তু মুশকিলে পড়ে গেল। বালিগঞ্জ লেকে সন্তু অনেকবার রোয়িং করেছে, কিন্তু এরকম গোল নৌকো তো কখনও চালায়নি। এটা খালি ঘুরে-ঘুরে যায়, সামনের দিকে এগোয় না।

সন্তু বলল, "এটা চালাবার আলাদা টেকনিক আছে, ঠিক ম্যানেজ করতে পারছি না। এক কাজ করা যাক। তুই নৌকোটাতে বোস, আমি জলে নেমে এটাকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি।"

জোজো শিউরে উঠে বলল, "তুই জলে নামবি? যদি এই নদীতে কুমির থাকে?"

সন্তু বিরক্ত হয়ে বলল, "কী পাগলের মতন কথা বলছিস? এইটুকু ছোট নদীতে কুমির থাকবে? একটু আগে আমরা এটা সাঁতরে পার হবার কথা ভাবছিলুম না?"

জোজো বলল, "তা ঠিক। কিন্তু নৌকো দেখলে আর জলে নামার কথা মনে থাকে না!"

সন্তু জামা আর জুতো খুলে নেমে গেল নদীতে। নদীটা খুব অগভীর নয়, স্রোতের টানও আছে বেশ। সন্তু সাঁতার দিতে-দিতে নৌকোটাকে ঠেলতে লাগল। কাজটা খুব সহজ না হলেও খানিক বাদে ওরা পৌঁছে গেল অন্য পারে।

নদীর এদিকের ঘাটেও একটা এরকম গোল নৌকো বাঁধা। বোঝা গেল, এটা ফেরিঘাট, দু'দিক থেকে লোকেরা এসে নিজেরাই নৌকো চালিয়ে পারাপার করে।

এপারে একটা ছোট্ট মন্দির, তার মধ্যে আলো রয়েছে। একটা বড় মাটির প্রদীপে মোটা করে পাকানো সলতে জ্বলছে। ভেতরের ঠাকুর ফুল-পাতা দিয়ে একেবারে ঢাকা, দেখাই যায় না। কোনও মানুষের সাড়াশব্দ নেই।

ওরা মন্দিরের পেছনটায় একটা কুঁড়েঘর দেখতে পেল। সেখানে একটা বিছানা পাতা রয়েছে, কিন্তু কোনও লোক শুয়ে নেই। বোধহয় এটা মন্দিরের পুরুতঠাকুরের ঘর, কিন্তু আজ রাত্তিরে তিনি অন্য কোথাও গেছেন। দরজাটা খোলা। একটা হ্যারিকেন টিমটিম করছে।

সেই ঘরের মধ্যে গোটা-তিনেক সাইকেল। শিকল দিয়ে বাঁধা। সন্তু সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একটা সাইকেল পেলে অনেক সুবিধে হয়।

সন্তু বলল, "এখানে কোনও লোক থাকলে তাকে বলে-কয়ে একটা সাইকেল ধার নিতাম!"

জোজো বলল, "না বলেও ধার নেওয়া যায়। পরে ফেরত দিলেই হবে।"

"ঘরের দরজা খুলে রেখে গেছে, এদেশে কি চুরি-টুরি হয় না?"

"আমরা একটা সাইকেল নিলে উনি ঠিক বুঝতে পারবেন, আমরা চুরি করিনি। বিপদে পড়ে ধার নিয়েছি। কাকাবাবুদের খুঁজে বার করা দারুণ জরুরি এখন আমাদের কাছে, তাই না?"

"শিকল দিয়ে বাঁধা, তাতে তালা লাগানো। খুলব কী করে?"

"ও তো একটা পুঁচকে তালা, ভাঙতে পারবি না, সন্তু?"

"আমি তালা ভাঙা কখনও শিখিনি। তুই পারবি? একটা হাতুড়ি-টাতুড়ি পেলেও হত।"

জোজো এগিয়ে গিয়ে বিছানা থেকে বালিশটা তুলে ফেলল। তার তলায় একগোছা চাবি। একগাল হেসে জোজো বলল, "দেখলি, বুদ্ধি থাকলেই উপায় হয়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই এই তালারও চাবি আছে।"

সন্তু একটা-একটা করে চাবি লাগিয়ে তালা খোলবার চেষ্টা করতে লাগল। জোজো উঁকি দিল খাটিয়ার নিচে। সেখানে অনেক হাঁড়ি-বাটি রাখা। একটা-একটা করে টেনে সে দেখল, কোনওটার মধ্যে চাল, কোনওটার মধ্যে ডাল। একটা হাঁড়িতে বাতাসা। জোজো একমুঠো বাতাসা মুখে পুরে বলল, "সন্তু, খেয়ে নে, আগে খেয়ে নে! বেশ ভাল খেতে, কর্পূর দেওয়া আছে, চমৎকার গন্ধ!"

সন্তু মুখ ফিরিয়ে বলল, "এই, ওগুলো খাচ্ছিস? ওগুলো পুজোর বাতাসা মনে হচ্ছে!"

জোজো বলল, "তাতে কী হয়েছে? পুজো দেবার পর সেই প্রসাদ তো মানুষেই খায়। আমাদের যা খিদে পেয়েছে, একটু কিছু খেয়ে গায়ের জোর করে নেওয়া দরকার। ওই দ্যাখ, জলের কলসিও আছে।"

তালাটা খোলা হয়ে গেছে। সন্তুও লোভ সামলাতে পারল না! সেও কুড়ি-পঁচিশটা বাতাসা খেয়ে নিল। জোজো কলসি থেকে জল গড়াতে গড়াতে বলল, "পুরুতমশাই লেখাপড়াও জানে। এই দ্যাখ, পাশের টুলে বই-খাতা রয়েছে। একটা কলমও আছে। আমরা একটা চিঠি লিখে রেখে গেলে উনি নিশ্চয়ই ঠিক বুঝবেন!"

সন্তু বলল, "এটা ভাল আইডিয়া, লিখে দে একটা চিঠি। ইংরিজিতে লিখিস।"

জোজো খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "পুরুতমশাই-এর ইংরিজি কী রে?"

সন্তু একটা সাইকেল বার করতে করতে বলল, "প্রিস্ট! তাড়াতাড়ি করে দু-তিন লাইনে সেরে দে।"

সন্তু সাইকেলটা নিয়ে এল রাস্তায়। এতক্ষণ বাদে তার মনটা একটু হাল্‌কা হয়েছে। সাইকেলে তাড়াতাড়ি হামপি পৌঁছনো যাবে। একবার রাস্তা ভুল হলেও অন্য রাস্তায় ফিরতে অসুবিধে হবে না।

জোজো বেরিয়ে এসে বলল, "বিছানার ওপর চাপা দিয়ে এসেছি, ফিরলেই চোখে পড়বে। আমি কিছু এক্সট্রা বাতাসাও পকেটে নিয়ে এসেছি। পরে কাজে লাগতে পারে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই সাইকেল চালাতে জানিস?"

জোজো অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "সাইকেল? আমি মোটরবাইক চালাতে জানি খুব ভাল। কিন্তু সাইকেলে প্র্যাকটিস নেই।"

সন্তু বলল, "বুঝেছি। পেছনে ক্যারিয়ার নেই, তুই সামনের রডের ওপর বোস।"

সাইকেলে আলো নেই। অল্প-অল্প জ্যোৎস্নায় রাস্তাটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। খানিকটা দূর এগোতেই ওরা দূরে একজন লোককে দেখতে পেল, এদিকেই আসছে।

সন্তু বলল, "ওই বোধহয় পুরুতমশাই!"

জোজো বলল, "কোনও কথা বলার দরকার নেই। জোরে চালিয়ে চলে যা! ফিরে গিয়ে তো চিঠিটা পড়বেই। অবশ্য যদি ইংরিজি পড়তে পারে। আমি গোটা-গোটা অক্ষরে লিখেছি।"

সন্তু লোকটির পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। লোকটি কোনও সন্দেহ করেনি।

আরও খানিকটা দূর যাবার পর বোঝা গেল, ওরা ভুল পথে আসেনি। সামনে এক জায়গায় বেশ কয়েকটা আলো দেখা যাচ্ছে! ওই জায়গাটা হামপি না হলেও লোকজন আছে নিশ্চয়ই। তাদের খোঁজখবর নেওয়া যাবে।

সেই আলোর দিকে লক্ষ্য রেখে আরও কিছুটা আসার পর দেখা গেল একটা মন্দিরের চূড়া। একটা কিসের শব্দও শোনা যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়, এখন রাত দেড়টা-দুটো অন্তত হবেই।

সন্তু বলল, "মন্দিরের কাছে অত আলো, লোকজন জেগে আছে মনে হচ্ছে, তা হলে ওটা নিশ্চয়ই সেই শুটিং-এর জায়গা।"

জোজো বলল, "একেবারে সাইকেল নিয়ে হুড়মুড়িয়ে ওখানে পৌঁছনো কি ঠিক হবে? মোহন সিং আমাদের যদি আবার দেখে ফেলে?"

সন্তু বলল, "ঠিক বলেছিস। শেষ পর্যন্ত সাইকেল নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না!"

আলোর অনেকটা কাছে এসে ওরা সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। মন্দিরের দিক থেকে বেশ কিছু লোকের অস্পষ্ট গুঞ্জন ভেসে আসছে, আরও একটা অন্যরকম আওয়াজ। কিছু একটা চলছে ওখানে।

সন্তু সাইকেলটা একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। তারপর চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে বলল, "আমরা দু'জন একদম পাশাপাশি না হেঁটে একটু দূরে-দূরে থাকব, বুঝলি? একজন ধরা পড়লে আর-একজন তবু পালাতে পারব। যে-করেই হোক, পুলিশে খবর দিতেই হবে। মোহন সিং-এর এতবড় দলের বিরুদ্ধে তো আমরা দু'জনে কিছু করতে পারব না!"

জোজো একটু অভিমানের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "আমি ধরা পড়লেও তুই পালিয়ে যাবি?"

সন্তু বলল, "দু'জনেই চেষ্টা করব ধরা না পড়তে! এখানকার অবস্থাটা একটু দেখে নিয়ে হসপেট থানায় আমাদের পৌঁছতেই হবে।"

মন্দিরের এই পাশটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। গেটের বাইরে রাইফেল নিয়ে বসে আছে চার-পাঁচজন পুলিশ। তারা ঘুমে ঢুলছে।

জোজো ফিসফিস করে বলল, "ওই তো পুলিশ। ওদের কাছে গিয়ে বললেই তো হয়, মোহন সিং আমাদের বিষ খাইয়েছিল।"

সন্তু একটু চিন্তা করে বলল, "উঁহুঃ, ওদের কাছে বলে লাভ নেই। ওরা সাধারণ কনস্টেবল, মোহন সিং ওদের ভাড়া করে এনেছে। ওরা আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না। থানায় গিয়ে ডায়েরি করাতে হবে যে, কাকাবাবু, রিঙ্কুদি, রঞ্জনদাদাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে ওরা অ্যাকশান নিতে বাধ্য।"

"পুলিশগুলোকে এড়িয়ে আমরা ভেতরে ঢুকব কী করে?"

"পাঁচিলের পাশ দিয়ে-দিয়ে চল। অন্য কোনও ঢোকার জায়গা আছে কি না খুঁজতে হবে। ওরা আমাদের দেখলে মোহন সিং-এর হাতে ধরিয়ে দেবে।"

দেওয়াল ঘেঁষে-ঘেঁষে খানিকটা যেতেই দেখা গেল, এক জায়গায় দেওয়ালটা একেবারে ভাঙা। সেখানে কাঁটাতার দেওয়া রয়েছে। কিন্তু কোনও পাহারাদার নেই।

সন্তু একটা কাঁটাতার তুলে ধরল, জোজো সেই ফাঁক দিয়ে গলে গেল। তারপর সন্তুও ঢুকে পড়ল।

মন্দিরের সামনের চাতালে একটা বড় ফ্লাড লাইট জ্বলছে। একদল লোক খন্তা-শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে চলেছে। লোকগুলোর চেহারা মোটেই কুলিদের মতন নয়, প্যান্ট-শার্ট পরা। এর মধ্যেই একটা কুয়োর মতন গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে সেখানে।

জোজো বলল, "এটাই তা হলে বিঠলস্বামীর মন্দির। এর সামনে সিনেমার জন্য সেট তৈরি হচ্ছে বলেছিল না?"

সন্তু অনেকটা এগিয়ে লোকগুলোকে ভাল করে দেখল। বিরজু সিং ছাড়া চেনা আর কেউ নেই।

বেশ খানিকটা দূরে মাঠের মধ্যে আর-একটা আলো দেখা গেল। সেটা ইলেকট্রিকের আলো নয়, মশাল। সন্তু আর জোজো এগিয়ে গেল সেদিকে। সেই জায়গাটা যেন তাদের চুম্বকের মতন টানল।

মাঠের মধ্যে সিংহাসনের মতন একটা চেয়ার পাতা। তার ওপরে জরির পোশাক পরে রাজা সেজে বসে আছে এক থুত্থুরে বুড়ো। তার মুখ-ভর্তি পাতলা-পাতলা সাদা দাড়ি, তার ভুরু পর্যন্ত পাকা। সেই বৃদ্ধ রাজা কিন্তু দিব্যি আরাম করে একটা সিগারেট টানছে।

তার পায়ের কাছে পড়ে আছে একজন। নীল রঙের নাইলনের দড়ি দিয়ে তার সারা শরীর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা। একপাশে পড়ে আছে একজোড়া ক্রাচ। কাকাবাবু!

◀ ৫ ▶

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে কেউ নামছে। ক্ষীণ একটা আলোর রেখা এসে পড়ল।

পায়ের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে, একজন নয়, অনেকে আসছে। রিঙ্কু একেবারে কোণের দিকে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘরটা যে মাটির নিচে তা রিঙ্কু আগেই বুঝতে পেরেছিল। মোটা পাথরের দেওয়াল, কোনওদিক দিয়েই আলো আসে না। দেওয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে, তার ওপর জমে আছে পুরু শ্যাওলা।

রাজধানী বিজয়নগরে এরকম গুপ্তকক্ষ থাকা অস্বাভাবিক কিছু না। এটা কী ছিল বন্দিশালা? সিঁড়িটাও রিঙ্কু আগেই খুঁজে পেয়েছিল, ওপর পর্যন্ত উঠে দেখে এসেছে, একটা শক্ত দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। খুব লম্বা সিঁড়ি, প্রায় তিনতলা পর্যন্ত উঁচু মনে হয়।

একটা বিচ্ছিরি শরবত খেয়ে এই কাণ্ড হয়ে গেল!

রিঙ্কু খেতে চায়নি, তাকে জোর করে খানিকটা খাওয়ানো হয়েছে। চোখের সামনে সে দেখল, জোজো আর সন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। রঞ্জন চিৎকার করে বলেছিল, "এদের কী হল? বিষ খাইয়েছে? আমায় জব্দ করতে পারবে না, আমি সব হজম করে ফেলব!" হাতের গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রঞ্জন ছুটে গিয়ে তুলে নিয়েছিল একটা তলোয়ার। সন্তু আর জোজোর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল, "খবরদার এদের গায়ে হাত ছোঁয়াতে পারবে না!"

বিরজু সিং বিকটভাবে হেসে উঠেছিল হা-হা করে!

রঞ্জন তলোয়ারটা হাতে ধরে রাখতে পারল না। প্রথমে সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, তারপর তার কপালটা ঠুকে গেল মেঝেতে। রঞ্জনও জ্ঞান হারিয়েছে।

রিঙ্কু বুঝতে পেরেছিল, রঞ্জনদের সাহায্য করার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। তারও ঘুম-ঘুম পাচ্ছে, আঙুলের ডগাগুলো অবশ হয়ে আসছে। শরবতের মধ্যে ওরা কী মিশিয়েছে, বিষ না কড়া ধরনের ঘুমের ওষুধ?

রিঙ্কু তখনও চোখ চেয়ে আছে দেখে বিরজু সিং বলেছিল, "চিল্লামিল্লি কোরো না। কোনও লাভ হবে না!"

রিঙ্কু জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমরা আমাদের মেরে ফেলবে? কেন? আমরা তোমাদের কী ক্ষতি করেছি?"

এর উত্তরে বিরজু সিং আবার হেসেছিল।

দুটি মেয়ে এরপর এসে রিঙ্কুকে টানতে টানতে নিয়ে গেল, তখনও রিঙ্কুর জ্ঞান আছে, কিন্তু বাধা দেবার শক্তি নেই। তারা এক জায়গায় তাকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়েছে, তাও রিঙ্কু টের পেয়েছে। তারপর একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার জায়গায় তাকে রেখে ওরা চলে গেল, একটু পরে রিঙ্কু ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছে তা জানে না। এখন দিন না রাত তাও বোঝার উপায় নেই।

আবার ওরা আসছে।

রিঙ্কু প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়ির মুখটা থেকে অনেকটা দূরে। প্রথমে দুটো টর্চ হাতে নিয়ে নামল দুজন, পেছনে আরও কেউ আসছে। ওদের টর্চের আলো ঘুরে-ঘুরে এসে রিঙ্কুর মুখের ওপর পড়ল। রিঙ্কু ওদের দেখতে পাচ্ছে না।

এরপর হাতে মোমবাতি নিয়ে নেমে এল আর-একটি মেয়ে, তার অন্য হাতে একটা খাবারের থালা। এবারে দেখা গেল, টর্চ হাতে দু'জনের মধ্যে একজন মেয়ে, একজন পুরুষ।

টর্চ হাতে মেয়েটি রিঙ্কুর দিকে এগিয়ে এসে তাকে ভাল করে দেখল। খুব যেন অবাক হয়ে গেছে। রিঙ্কুর চোখের ওপর টর্চ ফেলে সে বলল, "ভেরি স্ট্রেঞ্জ! এত সিমিলিয়ারিটি! তোমার কোনও যমজ বোন আছে?"

চোখ বুজে ফেলে রিঙ্কু বলল, "না!"

পুরুষটি জিজ্ঞেস করল, "কাম চলে গা?"

মেয়েটি বলল, "বহুত আচ্ছা চলে গা! না বলে দিলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে, এ অন্য মেয়ে।"

পুরুষটি বলল, "এ কি সব ঠিকঠাক পারবে?"

মেয়েটি বলল, "না পারার কী আছে? কাঁদতে তো পারবে। সব মেয়েই কাঁদতে জানে। বাকিটা আমি শিখিয়ে দেব!"

পুরুষটি বলল, "তব তো ঠিক হ্যায়। জানকী, ইনকো খানা খিলাও! কাপড়া বদল কর দেও। যাস্তি টাইম নেহি হ্যায়।"

মেয়েটি রিঙ্কুর কাঁধ চাপড়ে বলল, "ডরো মত। সব ঠিক হয়ে যাবে!"

টর্চ-হাতে মেয়েটি ও পুরুষটি ওপরে উঠে গেল, রইল শুধু মোম-হাতে মেয়েটি। সে প্রায় রিঙ্কুরই সমবয়েসী। হাতের থালাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে সে নরম গলায় ডাকল, "আও বহিন, খানা খা লেও!"

রিঙ্কু সাড়া দিল না। সে মোটেই ওই খাবার মুখে তুলবে না। একবার ওদের শরবত খেয়েই যা অবস্থা হয়েছে, তারপর আর কেউ ওদের খাবার খেতে যাবে!

মেয়েটি কাছে এসে রিঙ্কুর হাত ধরে বলল, "খাবার খেয়ে নাও, তোমার খিদে পায়নি?"

রিঙ্কু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "না, আমি খাব না!"

মেয়েটি হেসে বলল, "না খেয়ে কতক্ষণ থাকবে? দুর্বল হয়ে যাবে যে। সারা রাত জেগে কাজ করতে হবে, তা কি পারবে?"

মেয়েটির গলায় খানিকটা সহানুভূতির সুর পেয়ে রিঙ্কু জিজ্ঞেস করল, "কাজ মানে? আমায় কী কাজ করতে হবে?"

মেয়েটি হাসতে হাসতে দুলে দুলে বলল "তুমি ফিল্মে চান্স পেয়ে গেছ। ফিল্মে পার্ট করবে। এক ঘণ্টা পরেই শুটিং!"

রিঙ্কু চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বলল, "ফিল্মে পার্ট করব? বললেই হল? মোটেই আমি পার্ট করব না। সেইজন্য ওরা এখানে আমাকে আটকে রেখেছে?"

মেয়েটি আবার রিঙ্কুর হাত ধরে বলল, "এসো বহিন, খেতে বসে যাও। খেতে-খেতে কথা হবে। আমার নাম জানকী। তুমি আমাকে জানকী বলে ডেকো।"

রিঙ্কু বলল, "বলছি তো, ওই খাবার আমি খাব না। যদি ওতে বিষ মেশানো থাকে?"

জানকী অবাক হয়ে বলল, "বিষ! কেন, খাবারে বিষ থাকবে কেন? ঠিক আছে, এর থেকে একটা আমি মুখে দিচ্ছি, তা হলে তোমার বিশ্বাস হবে তো!"

প্লেটটাতে একগোছা লুচি আর আলুর দম রয়েছে। মেয়েটি একখানা লুচি নিয়ে, একটু আলুর দম মুখে পুরল। রিঙ্কু আগে দেখে নিল, সে সবটা খায় কি না! খাবার দেখে তার খিদে পেয়ে গেছে ঠিকই। কতক্ষণ সে খায়নি কে জানে।

এবার সে খেতে শুরু করে দিল।

জানকী বলল, "তোমাকে দেখতে ঠিক সুজাতাকুমারীর মতন। সেইরকম মুখ, সেইরকম হাইট, সেইরকম ফিগার। সুজাতাকুমারীর এই ফিল্মে বড় পার্ট আছে, হিরোইনের পরেই সে। কিন্তু তার অসুখ হয়ে গেছে। শুটিং তো বন্ধ রাখা যায় না। তোমাকে দিয়ে কাজ চলে যাবে!"

রিঙ্কু বলল, "আমি রাজি আছি কি নেই তা না জিজ্ঞেস করেই আমাকে দিয়ে পার্ট করাবে? বললেই হল! আমার সঙ্গে অন্য যারা ছিল, তারা কোথায়?"

জানকী বলল, "তোমার সঙ্গে আর কে ছিল?"

রিঙ্কু বলল, "আমার সঙ্গে আরও তিনজন ছিল। তাদের ওরা অজ্ঞান করে রেখেছে। তা ছাড়া কাকাবাবু ছিলেন, তিনি ক্রাচ নিয়ে হাঁটেন।"

জানকী রীতিমত অবাক হয়ে বলল, "তাদের তো আমি দেখিনি, বহিন। আমি অন্যদের কথা কিছু জানি না।"

রিঙ্কু ধমক দিয়ে বলল, "জানো না মানে? তুমিও তো এদেরই দলের!"

ধমক খেয়ে কাচুমাচুভাবে জানকী বলল, "বিশ্বাস করো বহিন, আমি কিছুই জানি না। আমার কাজ ফিমেল আর্টিস্টদের মেক-আপ করা। আমি তোমাকে সাজিয়ে দিতে এসেছি। আমাকে কস্তুরীজি বললেন, "এই মেয়েটার দিমাগের ঠিক নেই। একটু পাগল আছে। তুই ওকে সাজিয়ে দিবি ভাল করে, তারপর ওর কাছে বসে থাকবি!"

রিঙ্কু জিজ্ঞেস করল, "কস্তুরী কে?"

জানকী বলল, "কস্তুরীজিকে জানো না? তিনিই তো এই ফিল্মের হিরোইন। ওই যে একটু আগে টর্চ হাতে এসেছিলেন!"

রিঙ্কু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "ও হিরোইন না ভিলেন? ডাকাত দলের সর্দারনির মতন চেহারা। ও আমাকে পাগল বলে, এত সাহস!"

জানকী বলল, "না, না তুমি পাগল কেন হবে! ও ঠাট্টা করে বলেছে। তুমি ওর জন্য ফিল্মে চান্স পেয়ে গেলে। যদি ভাল পার্ট করো, তা হলে তোমার কত নাম হবে। অনেক টাকা হবে। তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে নাও, তারপর তোমাকে সাজিয়ে দিতে হবে। এই দ্যাখো, কস্তুরীজি তোমার জন্য কত ভাল শাড়ি রেখে গেছেন।"

এক পাশে একটা পুঁটলি পড়ে আছে, রিঙ্কু আগে দ্যাখেনি।

জানকী সেটা খুলল। তার মধ্যে রয়েছে নানারকম জরি বসানো একটা ঝকঝকে শাড়ি, ওড়না, একজোড়া ভেলভেটের চটি এইসব। আর-একটা ছোট বাক্সে ক্রিম, পাউডার, লিপস্টিক, কাজল ও কয়েকটা তুলি।

জানকী বলল, "হিস্টোরিক্যাল বই তো, সেইজন্য তোমাকে বেশি সাজগোজ করতে হবে।"

খাওয়া শেষ করে রিঙ্কু বলল, "জল? জল নেই?"

জানকী বলল, "ওঃ হো, পানি আনা হয়নি। আচ্ছা, একটু বাদেই নিয়ে আসছি। তার আগে দ্যাখো তো, এই কাঞ্জিভরম শাড়িটা তোমার পছন্দ হয়েছে?"

রিঙ্কু নিজের শাড়ির আঁচলেই হাতটা মুছে নিল। তারপর ওড়নাটা তুলে নিয়ে ভাল করে দেখার ভান করে হঠাৎ সেটা জানকীর গলায় দিয়ে টেনেই একটা ফাঁস বেঁধে দিল।

ভয়ে জানকীর চোখ কপালে উঠে গেল, সে আঁ-আঁ করতে লাগল।

রিঙ্কু ফাঁসটা আর-একটু টেনে বলল, "চ্যাঁচাবার চেষ্টা করলেই একদম দম বন্ধ করে মেরে ফেলব! তুমি এই ডাকাতদের দলে থাকো, আবার বলছ, তুমি কিছু জানো না? আমার সামনে ভালমানুষ সাজছ? জোর করে কাউকে বন্দী করে রেখে, তারপর তাকে দিয়ে সিনেমার পার্ট করানো যায়? চালাকি আমার সঙ্গে?"

শাড়িখানার একদিক দিয়ে সে আগে জানকীর হাত দু'খানা পেছনে নিয়ে গিয়ে বাঁধল শক্ত করে, তারপর অন্য দিক দিয়ে বাঁধল পা। এবার গলা থেকে ওড়নার ফাঁসটা খুলে নিয়ে সে জানকীর মুখ বেঁধে দিল। জানকীর আর কথা বলার কিংবা নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না।

জানকী মেয়েটা বোধহয় সত্যিই নিরীহ, সে এমনই ভয় পেয়ে গেছে যে, খুব একটা বাধা দেবার চেষ্টাও করেনি।

রিঙ্কু গিঁটগুলো পরীক্ষা করে দেখল, জানকী নিজে থেকে বাঁধন খুলতে পারবে না, চ্যাঁচাতেও পারবে না।

এবারে রিঙ্কু একটু নরম হয়ে বলল, "তুমি অবশ্য আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কিছু করোনি। কিন্তু তুমিই ভেবে দ্যাখো, আমার সঙ্গে যে আরও চারজন ছিল, তারা কোথায় গেছে আমি জানি না। তিনজনকে আমি অজ্ঞান হয়ে যেতে

দেখেছি, এরা বিষ খাইয়েছে। এই অবস্থায় আমি এদের সিনেমায় পার্ট করতে পারি? আগে তাদের খুঁজে দেখতে হবে।"

জানকীর চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে এল!

রিঙ্কু বলল "কাঁদলে কী হবে, তবু তোমাকে আমি ছাড়ছি না। আমার অবস্থাটা একটু ভেবে দ্যাখো, আমাকে তো পালাতেই হবে। এইরকম অবস্থায় খানিকক্ষণ থাকলে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। কেউ-না-কেউ খানিক বাদে খুঁজতে এসে তোমাকে খুলে দেবে। কিংবা কাকাবাবুদের আমি যদি পেয়ে যাই, তা হলে আমিই এসে তোমাকে ছেড়ে দেব, কেমন?"

আঁচল দিয়ে জানকীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে রিঙ্কু বলল, "লক্ষ্মী মেয়ের মতন বসে থাকো, আমি চলি!"

সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে এল রিঙ্কু। কিন্তু ওপরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ!

সেই কস্তুরী জানকীকে শুদ্ধু এখানে বন্ধ করে রেখে গেছে? তা হলে উপায়!

রিঙ্কুর একটা কথা মনে পড়ে গেল। জানকী জল আনবে বলেছিল। তা হলে কি বাইরে কোনও পাহারাদার আছে? রিঙ্কু দরজায় তিনটে টোকা দিল। হয়তো এদের কিছু সঙ্কেত আছে, সেটা কী কে জানে। সে আরও কয়েকবার টকটক করল দরজায়।

এবার দরজাটা খুলে গেল। একজন বন্দুকধারী লোক উঁকি মেরে বলল, "কেয়া হুয়া?"

রিঙ্কু মুখটা একপাশে ফিরিয়ে বলল, "উ লেড়কি পানি মাঙ্‌তা। থোড়া পানি লে আইয়ে!"

পাহারাদারটি অবহেলার সঙ্গে বলল, "আমি কোথায় পানি পাব? আমি যাব না। আমাকে এখানে থাকতে বলেছে।"

বাইরে প্রায় ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। রিঙ্কু চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে আবার বলল, "তা হলে আপনি দরজা বন্ধ করে দিন। আমি জল নিয়ে আসছি। দেখবেন, যেন মেয়েটা বেরিয়ে না আসে! তা হলে কস্তুরীজি খুব রাগ করবেন!"

আঁচলটা মাথায় দিয়েছে রিঙ্কু, তা দিয়ে, মুখের একপাশটা ঢেকে সে বেরিয়ে পড়ল। পাহারাদারটি কোনও সন্দেহ করল না। তরতর করে হেঁটে রিঙ্কু মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

সেই অন্ধকারের মধ্যে হোঁচট খেতে-খেতে রিঙ্কু দৌড়ল। সে কোন্ দিকে যাচ্ছে জানে না। তার শুধু একটাই চিন্তা, যে-জায়গাটায় সে বন্দী ছিল, সেখান থেকে যতদূর সম্ভব দূরে চলে যেতে হবে। সে জল নিয়ে ফিরে না গেলেই খটকা লাগবে পাহারাদারটির মনে।

খানিকটা দূর যাবার পর রিঙ্কু দেখতে পেল মশালের আলো। সেই আলো ঘিরে

ছায়ামূর্তির মতন জনাচারেক লোক বসে আছে। রিঙ্কু এবার খুব সাবধানে পা টিপেটিপে এগোতে লাগল। ওই লোকগুলো কারা আগে দেখতে হবে।

একটা তাঁবুর দড়িতে পা লেগে রিঙ্কু হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল আর-একটু হলে। তাঁবুটার মধ্যেও একটা লণ্ঠন জ্বলছে। রিঙ্কু তাঁবুটার পেছন দিকে চলে গিয়ে একটা ফাঁক দিয়ে চোখ লাগিয়ে দেখল। তাঁবুটা খালি। যতদূর মনে হচ্ছে, এই তাঁবুর মধ্যে তাদের শরবত খাইয়ে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়েছিল। রঞ্জন-সন্তু-জোজোরা এখানে এখন নেই।

তাঁবুটা পার হয়ে আরও কিছুটা যাবার পর রিঙ্কু দেখল, মশালের আলো ঘিরে যারা বসে আছে, তারা পুলিশ। গোল হয়ে বসে তারা কিছু খাচ্ছে।

এবার রিঙ্কুর সব দুশ্চিন্তা চলে গেল। পুলিশদের যখন পাওয়া গেছে, তখন আর কোনও ভয় নেই। পুলিশের সাহায্য না পেলে সে একা-একা কী করে অন্য সবাইকে খুঁজে বার করবে?

রিঙ্কু একেবারে কাছে গিয়ে বলল, "নমস্তে! আমি খুব বিপদে পড়েছি। আপনাদের সাহায্য চাই!"

পুলিশরা খাওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে তাকাল।

রিঙ্কু বলল, "এরা সব ডাকাত! এরা আমার সঙ্গের অন্য লোকজনদের বন্দী করে রেখেছে!"

একজন পুলিশ বলল, "ডাকু? ইয়ে লোগ তো ফিল্ম ইউনিট হ্যায়!"

আর-একজন পুলিশ বলল, "এদের ফিল্মের গল্পটা বোধহয় ডাকাতদের নিয়ে। অনেক লড়াই আর গোলাগুলি!"

অন্য একজন পুলিশ বলল, "না, না হিসটোরিক্যাল। বিজয়নগরকা কাহানী!"

রিঙ্কু ব্যাকুলভাবে বলল, "আপনারা বুঝতে পারছেন না? এরা ফিল্মের লোকের ছদ্মবেশে ডাকাত। এরা আমাদের বিষ-মেশানো শরবত খেতে দিয়েছিল!"

একজন পুলিশ তার থালার পাশ থেকে একটা গেলাস তুলে নিয়ে বলল, "বিষ মেশানো শরবত? এই তো আমরা শরবত খাচ্ছি। বিষ-টিষ তো কিছু নেই।"

সে ঢকঢক করে শেষ করে ফেলল গেলাসের বাকি শরবতটা!

পেছনে একটা ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ শোনা গেল। একজন পুলিশ চেঁচিয়ে বলল, "মোহন সিংজি! ও সিংজি, ইধার আইয়ে!"

রিঙ্কু আরও এগিয়ে এসে বলল, "আপনারা বুঝতে পারছেন না। আমাকে শিগগিরই থানায় নিয়ে চলুন!"

একজন পুলিশ ধমক দিয়ে বলল, "আপ চুপসে ইধার খাড়া রহিয়ে।"

রিঙ্কু সামনে তাকিয়ে দেখল, বড় গেটটার বাইরে রয়েছে একটা গাড়ি। রঞ্জনের গাড়ি সে দেখেই চিনল। এই পথ দিয়েই ওরা ভেতরে এসেছিল। ঘোড়ার খুরের শব্দটা খুব কাছে এসে গেছে।

রিঙ্কু খুব জোরে সামনের দিকে দৌড়তেই দু'জন পুলিশ লাফিয়ে উঠে তাকে ধরে ফেলল। রিঙ্কু তাদের একজনের হাত কামড়ে দেবার চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়াতে পারল না।

ঘোড়া হাঁকিয়ে যে এল, সে মোহন সিং নয়, সে ফিল্মের নায়িকা কস্তুরী। তার এক হাতে একটা চাবুক।

একজন পুলিশ গদগদ হয়ে বলল, "কস্তুরীদেবী! আইয়ে আইয়ে! দেখিয়ে ইয়ে লেড়কি কী সব উলটোপালটা বলছে!"

কস্তুরী অবাক হবার ভান করে বলল, "এ তো সেই পাগলিটা। আবার পালাবার চেষ্টা করছিল! কী মুশকিল হয়েছে জানেন, একে পাগলির পার্ট দেওয়া হয়েছিল, তাতে এ সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে গেছে।"

সবক'টি পুলিশ একসঙ্গো হেসে উঠল।

কস্তুরী বলল, "শিগগির এর হাত বাঁধুন, মুখ বাঁধুন। না হলে এ কামড়ে দিতে পারে!"

একজন পুলিশ বলল, "আমাকে তো কামড়ে দিয়েছে একবার। ওরে বাপরে, এমন পাগল!"

কস্তুরী শপাং করে চাবুকটা রিঙ্কুর মুখের সামনে ঘুরিয়ে বলল, "এই লেড়কি! আবার যদি গণ্ডগোল করবি তো চাবকে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেব!"

রিঙ্কু তবু তেজের সঙ্গো বলল, "তোমরা আমার সঙ্গোর লোকজনদের আটকে রেখেছ কেন? তারা কোথায়? তুমি ভেবেছ, তোমাদের ফিল্মে আমি পার্ট করব? মোটেই না! কিছুতেই না!"

রিঙ্কু আর কিছু বলতে পারল না। একজন পুলিশ তার মুখ চেপে ধরে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে দিল, আর-একজন পুলিশ শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল তার হাত।

কস্তুরী ঘোড়া থেকে নেমে সেই দড়ির অন্য দিকটা ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল রিঙ্কুকে।

◀ ৬ ▶

মোহন সিং কাকাবাবুকে নিয়ে গেল শর্মাজির সঙ্গো দেখা করাতে। অন্য একটা তাঁবুতে কাকাবাবুকে বসিয়ে বিনীতভাবে বলল, "আপনি একটু আরাম করুন রায়চৌধুরী সাব, আমি শর্মাজিকে খবর দিচ্ছি। সকাল থেকে ওঁর শরীরটা আবার খারাপ যাচ্ছে।"

কাকাবাবু শান্তগলায় বললেন, "অত বুড়ো মানুষকে তোমরা এখানে নিয়ে এলে কেন? উনি কেমন আছেন, তা দেখতেই তো আমি এসেছি।"

মোহন সিং হেসে বলল, "কী করব, বলুন! ওঁর যে সিনেমায় পার্ট করার শখ হয়েছে। উনি বিজয়নগরের হিস্ট্রি নিয়ে রিসার্চ করে নতুন-নতুন খবর বার করেছেন। তাই নিয়ে গল্প লিখেছেন। সে গল্প নিয়ে সিনেমা হচ্ছে বলে উনি নিজেই বুড়ো রাজার পার্ট করতে চান।"

কাকাবাবু বললেন, "বুড়ো বয়েসের শখ। কিন্তু এত ধকল কি ওঁর শরীরে সইবে?"

মোহন সিং এমনভাবে কথা বলছে যেন কাকাবাবুর সঙ্গে কোনওদিন তার ঝগড়া হয়নি। সে আবার বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা সঙ্গে একজন ভাল ডাক্তার রেখেছি। আর একদিনের শুটিং হলেই শর্মাজিকে আমরা বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। আপনি বসুন, আমি আসছি।"

এই তাঁবুর মধ্যে রয়েছে একটা সিংহাসন, আরও দুটি মখমলের চেয়ার। কাকাবাবু সেগুলোতে না বসে বসলেন একটা নেমন্তন্ন-বাড়ির চেয়ারের মতন কাঠের চেয়ারে। ক্রাচ দুটো পাশে দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

একটু পরেই খুব সাজগোজ করা একটি মেয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে বলল, "নমস্তে, আমার নাম কস্তুরী। আপনি ভালো আছেন রায়চৌধুরী সাহেব?"

কাকাবাবু মেয়েটিকে চিনতে পারলেন। এই মেয়েটিই রাস্তার চায়ের দোকানে অসুস্থ ভগবতীপ্রসাদ শর্মার মাথাটা কোলে নিয়ে সেবা করছিল। এখন তার পোশাক অন্যরকম, হাতে একটা চাবুক।

কাকাবাবু বললেন, "নমস্কার। শর্মাজির আবার শরীর খারাপ হয়েছে শুনলাম! আমি ওঁকে দেখতে এসেছি।"

কস্তুরী বলল, "এখন ঠিক হয়ে গেছেন। অত বুড়ো হলেও মনের জোর আছে খুব। সব কথা মনে থাকে।"

একটি লোক-একটা লম্বা-গেলাসে শরবত এনে বলল, "লিজিয়ে সাব!"

কাকাবাবু বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ, আমি এখন শরবত খাব না!"

"খেয়ে দেখুন, সাব। বহুত বঢ়িয়া শরবত! পেস্তা আর মালাই আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি একটু আগে চা খেয়েছি। এখন শরবত খেতে পারব না। এটা নিয়ে যাও।"

লোকটি বলল, "তা হলে চা নিয়ে আসব? চা আনছি এক্ষুনি!"

কাকাবাবু বললেন, "চা-ও লাগবে না। চা খেয়ে এসেছি বললুম যে!"

কস্তুরী বলল, "এই জগগু, উনি খাবেন না বলছেন, তাও কেন জোর করছিস। কিছু লাগবে না, যা!"

লোকটি চলে যাবার পরেই মোহন সিং ধরে-ধরে নিয়ে এল বৃদ্ধ শর্মাজিকে। তাঁর হাতে একটা রুপো বাঁধানো ছড়ি, পরে আছেন একটা জরির চুমকি বসানো লম্বা আলখাল্লা। সাদা ধপধপে চুল ও দাড়ি আর ওইরকম আলখাল্লার জন্য তাঁকে

অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতন দেখাচ্ছে এখন। তিনি বুকে হাত দিয়ে কয়েকবার খুক-খুক কাশলেন।

কাকাবাবু তাঁকে দেখে সম্মানের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "শর্মাজি, হেঁটে আসতে আপনার কষ্ট হয়েছে! আপনি যেখানে শুয়ে ছিলেন, সেখানে আমাকে ডেকে পাঠালেই তো পারতেন!"

শর্মাজি কাশি থামিয়ে বললেন, "না, না, ঠিক আছি! এখন ঠিক আছি। শুটিং করবার সময় হাঁটা-চলা করতে হবে না? ঘোড়ার পিঠেও চড়তে হবে। আমি সব পারব। আপনি, রায়চৌধুরী। আপনি এসেছেন, আমি খুব খুশি হয়েছি।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন। আপনার সঙ্গে দেখা করে আমার সঙ্গের ছেলেমেয়েদের বিজয়নগর রুইনস একটু ঘুরিয়ে দেখাব। এখানকার ইতিহাস তো অনেকেই জানে না।"

শর্মাজি বললেন, "হ্যাঁ, দেখান কিন্তু তারপর তাড়াতাড়ি চলে গেলে চলবে না। আপনি আমাদের শুটিং-এর সঙ্গে থাকুন, আমাদের অ্যাডভাইস দিন! হিস্ট্রির কোথাও যদি ভুল হয়, আপনি আমাকে ধরিয়ে দেবেন!"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আপনি থাকতে আমি আর কী ভুল ধরাব? আপনার চেয়ে বেশি কেউ জানে?"

শর্মাজি বললেন, "আমি তো শুটিং-এ ব্যস্ত থাকব, আমি কি সব দিক দেখতে পারব? আপনার মতামতে আমাদের অনেক উপকার হবে। মোহন সিং, তুমি রায়চৌধুরীর থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে দাও!"

বৃদ্ধ শর্মাজি বসলেন সিংহাসনটিতে, আর ভেলভেটের চেয়ার দু'খানায় বসল মোহন সিং আর কস্তুরী।

কাকাবাবু বললেন, "আপনি তা হলে রাম রায়-এর পার্ট করছেন? আপনাকে মানাবে ভাল।"

শর্মাজি বললেন, "হ্যাঁ, আমি সাজছি রাম রায়। মোহন সিং হবে আলি আদিল শাহ। আর কস্তুরী হচ্ছে রাজা সদাশিবের বউ, মহারানি পদ্মিনী। তার ছোট বোন ধরাদেবীর ভূমিকায় আছে সুজাতাকুমারী। আরে, তোমরা রায়চৌধুরীকে শরবত দিলে না? কাউকে আনতে বলো!"

কাকাবাবু বললেন, "এনেছিল আমার জন্য। আমি এখন খাব না।"

শর্মাজি বললেন, "রায়চৌধুরী, আপনাকে কাল রাত্তিরে কানে-কানে কী বলেছিলাম, মনে আছে তো? আপনি এবার সেই কথা এদের সামনে বলে দিতে পারেন।"

কাকাবাবু মোহন সিং আর কস্তুরীর মুখের দিকে তাকালেন একবার। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, এখন বলে দিলে ক্ষতি নেই। আপনি বলেছিলেন যে, আলি আদিল শাহ কথা বলার সময় একটু স্ট্যামার করবে। মানে একটু তোতলা। শুটিং-

এর আগে সেটা মনে করিয়ে দিতে। কোনও ইতিহাস বইতে এ-কথা লেখা হয়নি আগে।"

শর্মাজি একটু চমকে উঠে বললেন, "এই কথা বলেছিলাম? ও হ্যাঁ! তখন আমার খুব জ্বর ছিল তো। কী বলতে কী বলেছি মনে নেই। আর কী বলেছিলাম বলুন তো?"

কাকাবাবু সামান্য চিন্তা করে বললেন, "আপনাকে ঠিক সময় সরবিট্রেট ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে বলেছিলেন।"

শর্মাজি বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক! আর?"

কাকাবাবু বললেন, "রাম রাজার কাটা মুন্ডু দেখাতে হবে। সেজন্য মাটির মুন্ডু তৈরি করে সেখানে আলতা মাখিয়ে রক্ত বোঝাতে হবে।"

শর্মাজি এবার রেগে গিয়ে মোহন সিংকে বললেন, "এই লোকটা আমাদের সঙ্গে চালাকি করছে!"

কাকাবাবু এবার জোরে হেসে উঠলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে বললেন, "হ্যাঁ চালাকিই তো করছি। নয়তো কি বোকামি করব? এই লোকটা তো শর্মাজির ডামি। আসল শর্মাজি কোথায়?"

মোহন সিং সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কস্তুরী তার চাবুকটা উঁচিয়ে ধরল।

শর্মাজি তাদের দিকে হাত উঁচু করে থামতে ইঙ্গিত করে বললেন, "এ আপনি কী বলছেন, রায়চৌধুরী সাহেব? আমার কোনও ডামি নেই। আমি তো যুদ্ধ করব না! আপনি এদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন নিশ্চয়ই!"

কাকাবাবু বললেন, "কিসের ঠাট্টা? এই মোহন সিং-এর দল সবাইকে এত বোকা ভাবে কেন? একটা লোককে ভগবতীপ্রসাদ সাজিয়ে আনলেই আমি তা বিশ্বাস করব? কাল রাত্তিরে আমি যাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। আজ তাঁকে চিনতে পারব না? শর্মাজি আমাকে 'আপনি' বলে কথা বলেন না, 'তুমি' বলেন। আমাকে রায়চৌধুরী বলে ডাকেন না, রাজা বলেন। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, তাঁর স্মৃতিশক্তি খুব ভাল। আমি এতক্ষণ বানিয়ে-বানিয়ে যেসব কথা বলে গেলুম, তা শুনেই এই লোকটা হ্যাঁ-হ্যাঁ করল! আমি প্রথম এসে দেখেই বুঝতে পেরেছি। আসল শর্মাজি কোথায়। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো!"

মোহন সিং কস্তুরীকে বলল, "আমি আগেই বলেছিলাম না, এই লোকটা ঝঞ্ঝাট পাকাবে। একে এখানে আসতে দেওয়াই ঠিক হয়নি।"

কস্তুরী চাবুকটা তুলে শপাং-শপাং করে বললো, "এবার ওর উচিত শিক্ষা হবে!"

মোহন সিং বলল, "দেরি করে লাভ নেই, ওকে খতম করে দিই?"

কাকাবাবুর হাতে ততক্ষণে তার রিভলভার চলে এসেছে। সেটা মোহন সিং-এর দিকে তুলে কড়া গলায় বললেন, "মোহন সিং, কাল তোমায় একটুর জন্য প্রাণে মারিনি, মনে নেই? আমাকে শিক্ষা দেওয়া অত সহজ নয়। শর্মাজি আমাকে

বারবার বলেছেন, এখানে এসে দেখা করতে। সেইজন্যই আমি এসেছি। শর্মাজির সঙ্গো দেখা না করে আমি যাব না।"

নকল শর্মাজি হুকুম দিল, "এই লোকটার মুণ্ডু কেটে জলে ভাসিয়ে দাও!"

কাকাবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও পারলেন না।

তাঁবুর পেছন দিকে একটা ঢোকার জায়গা আছে। সেখান দিয়ে জগ্গু নামের লোকটা কখন ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে, কাকাবাবু তা টেরও পাননি। তিনি পেছন ফিরে তাকাবারও সময় পেলেন না।

জগ্গু একটা লাঠি দিয়ে খুব জোরে মারল কাকাবাবুর মাথায়।

কাকাবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। রিভলভারটা হাত থেকে ছিটকে গিয়ে একটু দূরে পড়তেই মোহন সিং সেটাকে পা দিয়ে চেপে ধরল। তারপর সে কস্তুরীর হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে এক ঘা কষাতে গেল কাকাবাবুর পিঠে।

কাকাবাবু নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সেই চাবুকটা ধরে ফেলেন ততক্ষণে জগ্গু আর-একবার লাঠি তুলেছে। প্রথম আঘাতেই কাকাবাবুর মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় আঘাত লাগলে তাঁর বাঁচবার আশা থাকবে না।

তিনি স্পষ্ট গলায় বললেন, "থামো! আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের কোনও লাভ হবে না। হিরেটা কোনওদিন খুঁজে পাবে না তোমরা। বিজয়নগরের হিরের সন্ধান আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানে না। শর্মাজি যে ম্যাপটা এঁকে দিয়েছেন তাতে মাত্র অর্ধেকটা আছে। যদি তোমরা ওঁকে ফাঁকি দাও, সেইজন্য উনি পুরোটা আঁকেননি। সেটা তোমরা কিছুই বুঝবে না। সেই ম্যাপের বাকি অংশটার কথাই তিনি আমাকে কানে-কানে বলে দিয়েছিলেন!"

কাকাবাবু এক হাতে মাথাটা চেপে ধরলেন। তবু রক্ত বন্ধ হল না। যন্ত্রণায় মুখটা কুঁচকে গেল, চোখ দুটো বুজে এল।

কস্তুরী লাফিয়ে উঠে বলল, "শিগগির ডাক্তার ডাকো। লোকটাকে বাঁচিয়ে তোলো! বিজয়নগরের হিরে আমার চাই-ই চাই! চাই-ই চাই!"

কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরে এল মিনিট-পনেরো পরেই। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে এনে একটি খাটে শোওয়ানো হয়েছে, একজন ডাক্তার তাঁর মাথায় ব্যান্ডেজ করছে। তিনি কোনও কথা বললেন না। মাথায় যন্ত্রণাটা অনেকটা কমে গেছে। তা হলে খুব বেশি কাটেনি।

ব্যান্ডেজ বাঁধার পর ডাক্তার তার ডান হাতের জামা গুটিয়ে একটা ইঞ্জেকশান দিতে এল। কাকাবাবু বাধা দিলেন। একটু পরেই তাঁর আবার ঘুম পেয়ে গেল।

পরের বার যখন ঘুম ভাঙল, তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। কাকাবাবু ওঠবার চেষ্টা করতেই বুঝলেন যে তাঁর সমস্ত শরীর শক্ত কোনও দড়ি দিয়ে বাঁধা। হাত দুটো পেছন দিকে মোড়া, একটু নড়াচড়া করাও সম্ভব নয়। ঘুমন্ত অবস্থাতেও তাঁকে ওরা বিশ্বাস করেনি, তাই এরকমভাবে বেঁধে রেখেছে।

কাকাবাবু চিৎকার করে ডাকলেন, "মোহন সিং! মোহন সিং!"

কয়েকবার ডাকাডাকি করার পর প্রথমে অন্য একজন লোক ঘরের মধ্যে উঁকি মারল। তারপর সে চলে গিয়ে ডেকে আনল মোহন সিংকে। সঙ্গে এল কস্তুরী, তার হাতে একটা মোমবাতি।

দু'জনে এসে কাকাবাবুর খাট ঘেঁষে দাঁড়াল।

কাকাবাবু বললেন, 'মোহন সিং, আমাকে বেঁধে রেখেছ কেন? তুমি আমাকে এখনও চেনোনি মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমার ভাই আমাকে চিনেছিল, সে এখনও জেল খাটছে, তাই না? আমাকে কিছুতেই তোমরা মেরে ফেলতে পারবে না। আমাকে বেঁধে রাখলে আমার পেট থেকে একটা কথাও বার করতে পারবে না!"

মোহন সিং দাঁতে-দাঁত ঘষে বলল, "রায়চৌধুরী, তুমি আমার ভাইকে জেল খাটিয়েছ। কাল সন্ধেবেলা আচানক আমার গলা টিপে ধরেছিলে। আমি আজ তার শোধ নেব। তোমার মাংস একটু-একটু করে কেটে কুকুরকে খাওয়াব।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ, তাই খাওয়াও, দেখি তোমার কেমন সাধ্য! তোমার মতন দুর্বৃত্ত আমি আগে অনেক দেখেছি। আজ পর্যন্ত তো কেউ আমার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। আমার একটা পা যে ভাঙা দেখছ, এটা হঠাৎ একটা অ্যাকসিডেন্টে হয়েছে, কেউ ভেঙে দেয়নি। এবারে তুমি কী করতে পারো দেখা যাক!"

মোহন সিং কাকাবাবুর গলা টিপে ধরতে যাচ্ছিল, কস্তুরী তাকে বাধা দিয়ে বলল, "আহা, থামো না। আগে আমি দু-একটা কথা বলি!"

তারপর সে খুব মিষ্টি গলায় বলল, "রায়চৌধুরীবাবু, আমি আপনার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেছি। মোহন সিং-এর ভাইকে আপনি পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছেন। আপনার ওপর মোহন সিং-এর এত রাগ, তবু আপনি এখানে এলেন কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো মোহন সিং-এর কাছে আসিনি। এসেছিলাম প্রোফেসার শর্মার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমাকে আসতে বলেছিলেন। তিনি আমার গুরুর মতন, তিনি আসতে বললেও মোহন সিং-এর ভয়ে আমি আসব না?"

কস্তুরী বলল, "সঙ্গে কয়েকটি অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে নিয়ে এলেন, তাদের বিপদের কথাও চিন্তা করবেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "জীবনে কতরকম বিপদ আসে। ভয় পেয়ে দূরে থাকলে কি সব বিপদ কাটানো যায়? ওরা নিজের ইচ্ছেতে আমার সঙ্গে এসেছে, ওদের যদি কোনওরকম বিপদ হয়, ওরা নিজেরাই বাঁচার চেষ্টা করবে। এইভাবে বাঁচতে শিখবে!"

মোহন সিং বলল, "ওদের আর তুমি দেখতে পাবে না কোনওদিন।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? তা হলে বিজয়নগরের হিরের সন্ধানও তোমরা কোনওদিন পাবে না!"

মোহন সিং বলল, "আলবাত পাব। আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি যে, কোনও জায়গা খুঁজতে বাকি থাকবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "অতই সহজ? চারশো বছর ধরে কত লোক সেই হিরে খুঁজছে, কেউ পায়নি। তোমরা সমস্ত বিজয়নগর খুঁড়ে ফেললেও পাবে না, এই আমি বলে দিচ্ছি!"

কস্তুরী বলল, "এই মোহন সিং, আস্তে কথা বলো। বাবুজি, আমরা এখানে কেন এসেছি জানেন? আমরা এসেছি এখানে ফিল্মের শুটিং করতে। তার সঙ্গে হিরের কী সম্পর্ক আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "ফিল্মের শুটিং-এর নাম করে এসে তোমরা পুরো জায়গাটা ঘিরে ফেলেছ। পুলিশ বসিয়েছ। বাইরের লোকদের ঢুকতে দিচ্ছ না। সেই সুযোগে তোমরা বিজয়নগরের বিখ্যাত হিরে খুঁজে বার করবে। প্রোফেসর শর্মা তোমাদের এই বুদ্ধি দিয়েছেন, আমি জানি। কিন্তু শর্মাজি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ধুরন্ধর। সেই হিরে পেলেও তিনি তোমাদের সেটা দিতেন না। সেই হিরে আবিষ্কার করলে সারা পৃথিবীতে তাঁর নাম ছড়িয়ে যাবে, সেটাই হবে তাঁর শেষ কীর্তি, তিনি এই কথা ভেবে এসেছেন।"

কস্তুরী বলল, "শর্মাজির কথা বাদ দিন। অত বুড়ো মানুষ দিয়ে কাজ চলে না। আমি সেই হিরে খোঁজার জন্য যা বন্দোবস্ত করেছি, তাতে আমার এর মধ্যেই পনেরো লাখ টাকা খরচা হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "বিজয়নগরের হিরে পাওয়া গেলে তার দাম হবে পনেরো কোটি টাকারও বেশি। কোহিনূরের চেয়েও দামি!"

কস্তুরী বলল, "আপনি সেই হিরে বার করে দিন। আপনি কত টাকা নেবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ বেশ! আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে সামনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলা হচ্ছে। আগে বাঁধন খুলে দাও, তারপর কথা হবে!"

মোহন সিং গর্জে উঠে বলল, "খবরদার, কস্তুরী ওর কথা শুনো না। এ লোকটা সাপের মতন, একবার ছাড়লে কী করবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। ওকে ছাড়া হবে না!"

কস্তুরী তার দিকে চোখ রাঙিয়ে বলল, "তুমি চুপ করো!"

তারপর কাকাবাবুকে বলল, "আগে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হোক, তারপর আপনার হাত-পায়ের দড়ি খুলে দেওয়া হবে তো নিশ্চয়ই! আপনি বলুন, আপনি আমাদের সাহায্য করার বদলে কী নেবেন? মনে রাখবেন কিন্তু, মোহন সিং আপনাকে যখন-তখন খতম করে ফেলতে রাজি। আমি আপনাকে বাঁচাব। আপনার প্রাণের দাম কি একটা হিরের চেয়েও বেশি নয়?"

কাকাবাবু বললেন, "শর্মাজি আমাকে বলেছিলেন, তিনি বেঁচে থাকতে আমি যেন হিরের ব্যাপারে নাক না গলাই। তাতে তাঁর ক্রেডিট নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি

কোনও কারণে মরে গেলে, তারপর যেন আমি ওই কাজে হাত দিই। তিনি আমাকে সব বাতলে দিয়েছেন, আমিও তাঁর কাছে শপথ করেছি। শর্মাজি কোথায়?"

মোহন সিংয়ের দিকে একবার দ্রুত দেখে নিয়ে কস্তুরী বলল, "ওঁর আজ সকাল থেকে হঠাৎ প্যারালিসিস হয়ে গেছে, কোমার মতন অবস্থা। কথা বলতে পারছেন না। বোধহয় আর জ্ঞান ফিরবে না। হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

কাকাবাবু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "এটা সত্যি কথা?"

কস্তুরী বলল, "জি হাঁ, এটা সত্যি কথা। আপনাকে শুধু-শুধু মিথ্যে কথা বলব কেন! শর্মাজি খুবই অসুস্থ। তিনি এখানে নেই। ডাক্তাররা বলেছেন, তাঁকে এবারের মতন বাঁচাবার চেষ্টা হলেও তিনি আর কথা বলতে পারবেন না। লিখতেও পারবেন না। তাতেই আমাদের খুব মুশকিল হয়ে গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের যে কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিছে, তা বোঝা মুশকিল। যাকগে, আমার সঙ্গে যে আর চারজন ছিল, তারা কোথায় গেল?"

মোহন সিং রুক্ষ গলায় বলল, "তাদের কথা বাদ দিন! কথা হবে শুধু আপনার সঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে। আমার যে ভাই জেল খাটছে, তাকে নিয়ে কি আমি দরাদরি করছি? আপনার সঙ্গে যারা এসেছিল, তারা বাড়ি চলে গেচে। আপনি কী শর্তে আমাদের সাহায্য করতে চান, সেটাই বলুন।"

কাকাবাবু বললেন, "কোনও শর্ত নেই। আমার সঙ্গে যে চারজন ছিল, তাদের আগে এনে হাজির করো, নইলে তোমাদের মতন স্বার্থপর লোকদের সঙ্গে আমি কোনও কথাই বলব না!"

মোহন সিং আর রাগ সামলাতে না পেরে কস্তুরীর থেকে চাবুকটা নিয়ে দু'ঘা কষিয়ে দিল কাকাবাবুর বুকে। গরগর করতে করতে বলল, "হারামজাদা, তোমাকে এক্ষুনি খুন করে ফেলতে পারি। তবু তুমি বড় বড় কথা বলছ? বাঁচতে চাও তো শিগগির বলো, হিরেটা কোথায়?"

কাকাবাবু বললেন, "কে জানে হিরেটা কোথায়? মোহন সিং, তুমি যে আমাকে দু'ঘা চাবুক কষালে, ঠিক সেই দু'ঘা তুমি আবার ফেরত পাবে!"

মোহন সিং চাবুক তুলে বলল, "তোমাকে আমি যদি এক্ষুনি খতম করে দিই তা হলে কে আমাকে আটকাবে?"

কস্তুরী বলল, "কী পাগলের মতন কথা বলছ, মোহন সিং! শর্মাজি আমাদের যে ম্যাপ দিয়েছেন, তা দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রায়চৌধুরীর সাহায্য আমাদের দরকার।"

কাকাবাবু বললেন, "মোহন সিং, আমাকে যত ইচ্ছে চাবুক মেরে হাতের সুখ করে নিতে চায় নিক, কিন্তু আমি আর একটাও কথা বলব না! আমার সঙ্গের চারজন ছেলেমেয়েকে আমি আগে দেখতে চাই এখানে!"

মোহন সিং বলল, "হবে না! আমার যে ভাই জেল খাটছে, আমি কি তাকে ছেড়ে দেবার কথা বলেছি? ওর লোকেরাও কোথায় আছে আমি জানি না!"

কাকাবাবু মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর চোখ কিংবা মুখ এরা বাঁধেনি। তবু তিনি যেন এদের আর মুখ দেখতে চান না।

কস্তুরী বলল, "আমি একটা শর্ত করছি। আপনি বিজয়নগরের হিরের একটা কিছু রাস্তা দেখিয়ে দিন, আজই আমি আপনার সামনে আপনার দলের কোনও ছেলেমেয়েকে হাজির করব। শুধু একজন। ঠিক আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "তারা কোথায় আছে আমি জানতে চাই!"

কস্তুরী বলল, "আপনি একজনকে দেখতে পাবেন। তার মুখেই জানতে পারবেন সব কথা।"

কাকাবাবু বললেন, "মোহন সিং-কে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু তুমি একটি মেয়ে, আশা করি তুমি কথার খেলাপ করবে না! হিরেটার কাছে পৌঁছবার চারটে স্টেপ আছে। আমি শুধু প্রথম স্টেপটার কথা বলব। একটা গোপন লোহার দরজা! সেটা যদি তোমরা বার করতে পারো, তা হলে আমার দলের একজনকে আমার সামনে হাজির করবে? কথা দিচ্ছ?"

কস্তুরী বলল, "বাবুসাহেব, এই হিরেটার জন্য আমি বহু টাকা খরচ করে ফেলেছি। যে কোনও উপায়ে সেটা আমার চাই। আপনি কথা রাখলে আমিও কথা রাখব।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। ভাল করে শুনে নাও। বিঠলস্বামী মন্দিরের মেইন গেটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারপর দক্ষিণ দিকে সোজা পা ফেলে-ফেলে এগোবে। ঠিক তিনশো পা গিয়ে থামবে। তুমি নিজে মাপবে, কোনও পুরুষকে দিয়ে মাপালে বেশি হয়ে যাবে। তোমার মতন কোনও মেয়ের তিনশো পা। দড়ি ফেলে দাগ টেনে দেখে নেবে ঠিক সোজা তিনশো পা হয়েছে কি না। তারপর সেই জায়গাটা খুঁড়তে শুরু করবে। তিনশো যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখানে পাঁচ ফুট ব্যাসের একটা বৃত্ত এঁকে নিয়ে খুঁড়বে। একটা কুয়োর মতন করে সেই পাঁচ ফুট খুঁড়ে ফেলবে। দশ ফুট গভীর হবে। তারপর সেখানে একজন লোককে নামিয়ে দেবে। সেই লোকটি বিঠলস্বামী মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। দাঁড়িয়ে সেই কুয়োর দেয়ালে হাত বুলোলে একটা লোহার দরজা পাবে। বড় দরজা নয়, একটা লোহার সিন্দুকের দরজার মতন, কোনওরকমে একজন মানুষ সেখানে ঢুকতে পারে। ব্যস, এই পর্যন্ত বলে দিলাম। এবার যাও, খুঁজে দ্যাখো। যা বললাম, ঠিক ঠিক মনে আছে তো, না লিখে নেবে?"

কস্তুরী বলল, "লিখে নিচ্ছি, লিখে নিচ্ছি!"

মোহন সিং বলল, "দাঁড়াও! যদি পুরোটাই এই বাঙালিবাবুর ধোঁকা হয়?

শর্মাজির ম্যাপে বিঠলস্বামীর মন্দিরের উত্তর দিক পর্যন্ত দেখানো আছে। আর এ বলছে সম্পূর্ণ উলটো, দক্ষিণ দিক!"

কস্তুরী একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বলল, "আমাদের শুধু-শুধু ধোঁকা দিয়ে ওর কী লাভ?"

মোহন সিং বলল, "সময় নষ্ট করিয়ে দেবে। কাল সকালের মধ্যে আমাদের শুটিং শেষ করার কথা, গভর্নমেন্ট তার বেশি পারমিশান দেবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "দশ ফুট গর্ত খুঁড়তে কত সময় লাগবে? একসঙ্গে বিশজন লোক লাগিয়ে দাও, দু'ঘন্টায় হয়ে যাবে! তারপরই দেখতে পাবে, সেখানে লোহার দরজা আছে কি না!"

মোহন সিং আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কস্তুরী তার হাত ধরে থামিয়ে দিল। চোখের ইঙ্গিতে কী যেন বোঝাল তাকে।

তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "ঠিক আছে, রায়চৌধুরীবাবু। আপনার কথামতন আমরা খুঁড়ে দেখব। যদি সত্যিই লোহার দরজা পেয়ে যাই, আপনিও আপনার দলের একজনকে ফেরত পেয়ে যাবেন। আর যদি আমাদের ধোঁকা দিয়ে থাকেন, আপনার মাংস আমরা কুকুর দিয়ে খাওয়াব। তারপর কঙ্কালটা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসব। সবাই জানবে, জংলি জানোয়াররা আপনাকে মেরে ফেলেছে।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "জংলি জানোয়ার কি শুধু জঙ্গলেই থাকে? মানুষের পোশাক পরেও ঘোরফেরা করে। নাঃ, আপাতত আমার মরার কোনও ইচ্ছে নেই! যাও, খুঁড়তে শুরু করো। ঠিক যেরকমভাবে বললাম, ভুল না হয়!"

মোহন সিং আর কস্তুরী দ্রুত বেরিয়ে গেল।

কাকাবাবুর ইচ্ছে হল পাশ ফিরে শুতে। হাত নাড়াবার চেষ্টা করে বুঝলেন, খুব শক্ত করে বেঁধেছে, সারা শরীরে দড়িটা একেবারে কেটে-কেটে বসে গেছে। এখন আর কিছু করবার নেই। সন্তু, রঞ্জনরা কোথায় আছে কিছু বুঝতে পারছেন না। প্রফেসার শর্মা অসুস্থ হয়ে না পড়লে মোহন সিং এতটা নিষ্ঠুরতা দেখাতে সাহস পেত না। কাল রাত্তিরে শর্মাজিকে দেখে মনে হয়েছিল, মনের জোরেই তিনি টিকে যাবেন।

সত্যিই কি তাঁর প্যারালিসিস হয়ে কথা বন্ধ হয়ে গেছে? এতবড় একজন পণ্ডিত বাড়ি থেকে এত দূরে এসে এইভাবে মারা যাবেন? বিজয়নগরের বিখ্যাত হিরেটা উদ্ধার করার জন্য তিনি অন্তত তিরিশ বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। হিরেটা পাওয়া গেলে সারা পৃথিবীতে হইচই পড়ে যাবে। কাহিনূরের চেয়েও অনেক দামি হিরে।

চোখ বুজে নানারকম চিন্তা করতে-করতে কাকাবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন একসময়!

খানিকবাদে তাঁর আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। গোটাচারেক লোক এসে তাঁর পা আর মাথা ধরে তুলে ফেলল খাট থেকে।

কাকাবাবু বললেন, "আরে, আরে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

লোকগুলো কোনও উত্তর দিল না। একটা বালির বস্তার মতন তাঁকে কাঁধে নিয়ে চলল। একজন কাকাবাবুর ক্রাচ দুটোও তুলে নিল।

বাইরে এসে কাকাবাবু দেখলেন, আকাশ মেঘলা-মেঘলা। চতুর্দিক অন্ধকার, দু-তিনটে জায়গায় আলো জ্বলছে। তিনি আন্দাজে বুঝলেন, একটা আলো জ্বলছে বিঠলস্বামী মন্দিরের কাছে। ওখানে এখনও খোঁড়াখুঁড়ি চলছে।

লোকগুলো কাকাবাবুকে বয়ে নিয়ে এসে মাঠের মাঝখানে নামিয়ে দিল। সেখানেও একটা আলো জ্বলছে। সিংহাসনের ওপর বসে আছে নকল ভগবতীপ্রসাদ শর্মা, এখন তার মাথায় একটা জরির পাগড়ি। কোলের ওপর রাখা একটা তলোয়ার। সে একটা সিগারেট টানছে। আসল শর্মাজি জীবনেও সিগারেট খাননি।

কাকাবাবুকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেবার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার? দিব্যি খাটে শুয়েছিলাম, হঠাৎ আমাকে মাঠের মধ্যে আনা হল কেন?"

নকল শর্মা বলল, "ক্যামেরা আসছে। শুটিং হবে। আসল কাজের সঙ্গে-সঙ্গে ফিল্মের শুটিংও চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। এখানে একটা সিন তুলব। রাজা রাম রায়ের সামনে আনা হয়েছে একজন বন্দীকে। তুমিই সেই বন্দী। তোমাকে অবশ্য দেখানো হবে পিছন দিক থেকে। তোমার মুখ দেখা যাবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "চারশো বছর আগেকার এক বন্দীর গায়ে নাইলনের দড়ি? তখনকার বন্দীদের শুধু হাত দুটো শেকল দিয়ে বাঁধা হত!"

নকল শর্মা বলল, "হিন্দি সিনেমায় এসব চলে যায়! অত কেউ খুঁটিয়ে দ্যাখে না।"

কাকাবাবু বললেন, "চারশো বছর আগেকার রাজা সিগারেটও খাবে নাকি?"

নকল শর্মা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "আরে, ক্যামেরাম্যান, লাইটসম্যানরা সব কোথায় গেল? সবাই মিলে মাটি খোঁড়া দেখতে গেলে কী করে চলবে? ওরে কে আছিস?"

কাকাবাবুকে নামিয়ে রেখে সেই চারজন লোক চলে গেছে। কাছাকাছি আর কেউ নেই। নকল শর্মা চেঁচিয়ে আরও কয়েকবার ডাকল। কেউ সাড়া দিল না। তলোয়ারটা হঠাৎ পড়ে গেল তার কোল থেকে। সেটা তুলে সে সিংহাসনের এক পাশে রাখল।

তারপর সে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে মজা করে বলল, "কুয়ো তো খোঁড়া হচ্ছে, সেখানে যদি লোহার সিন্দুকের দরজা না পাওয়া যায়, তা হলে তোমার কী হবে বলো তো? মোহন সিং বলছে, কুকুর দিয়ে তোমাকে খাওয়াবে। কস্তুরী বলছে, এইরকম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তোমাকে নদীতে ফেলে দেবে। আর আমি ভাবছি, সিনেমার শুটিং-এ তোমাকে কাজে লাগাব। প্রথমে আমি আমার পায়ের জুতো দিয়ে তোমার নাক ঘষে দেব! তারপর লাথি মেরে-মেরে তোমার দাঁতগুলো ভাঙব। তারপর তোমার চোখ..."

কাকাবাবু বললেন, "বুঝেছি, বুঝেছি! তুমি একটু-একটু করে কষ্ট দিয়ে আমায় মারবে। তাই তো? এবারে উলটো দিকটা বলো। আমি যদি হিরেটা তোমাদের উদ্ধার করে দিই, তা হলে কী হবে?"

নকল শর্মাজি বলল, "হিরে যদি তুমি খুঁজে দিতে পারো, সত্যি দিতে পারো, তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেব। বাঁধন খুলে দেব। ইউ উইল বি ফ্রি! মরদ কা বাত, হাতি কা দাঁত! কথা যখন দেওয়া হয়েছে, হিরে পাওয়া গেলেই তোমার ছুট্টি!"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু হিরেটা পাওয়া গেলে নেবে কে? তুমি, না মোহন সিং, না কস্তুরী?"

নকল শর্মা ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, "মোহন সিং? ছোঃ! ও তো একটা সামান্য লোক। ওকে আমরা যা বলি, ও তাই করে। অবশ্য ও একটু গোঁয়ার। কথায়-কথায় মারামারি করতে যায়। কিন্তু হিরের ওপর কোনও অধিকার নেই। আর কস্তুরী? হাঁ, সে কিছু টাকা খরচ করেছে বটে! সে টাকা ফিল্ম থেকেই উঠে যাবে। হিরেটা হবে আমার। বিজয়নগরের হিরেটা আমার চাই!"

কাকাবাবু কৌতুকের সঙ্গে বললেন, "এ যে নতুন কথা শুনছি। কস্তুরী এতক্ষণ বলছিল, হিরেটা সে-ই নেবে। অন্য কোনও ভাগীদার নেই। এখন দেখছি, আপনিও একজন ভাগীদার!"

নকল শর্মা বলল, "ভাগীদার মানে? না, না, অন্য কাউকে আমি ভাগ-টাগ দেব না। আমার সব বন্দোবস্ত করা আছে, হিরেটা পেলেই আমি বম্বে চলে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে তো খুব মুশকিল হল। আমি হিরেটা কস্তুরীকেই খুঁজে দেব কথা দিয়েছি। কস্তুরীর সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছে।"

নকল শর্মা বলল, "ঠিক আছে, তুমি হিরেটা কস্তুরীর জন্যই খোঁজো! এমনকী সবার সামনে তুমি হিরেটা কস্তুরীর হাতে তুলে দিতে পারো। তারপর ওর কাছ থেকে সেটা বাগিয়ে নিতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না। সেটা আমি বুঝব। তোমার সঙ্গে আমার যে কথা হল, তা খবর্দার বলবে না আর কাউকে। কস্তুরীকে যদি আগে থেকে কিছু বলার চেষ্টা করো, তা হলে তোমার আমি জিভ কেটে নেব!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার জিভ কেটে নিলে একটু মুশকিল আছে। আমি যদি কথা বলতে না পারি, তা হলে হিরেটা তোমরা পাবে কী করে?"

নকল শর্মা চোখ কটমট করে বলল, "রায়চৌধুরী, একটা কথা মনে রেখো। তুমি বাঁচবে কি মরবে, সেটা আমার ওপর নির্ভর করছে। কস্তুরী হাজার চেষ্টা করলেও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।"

সিংহাসনের পাশে হাত চাপড়ে সে তলোয়ারটা খুঁজল। সেটা সেখানে নেই। আবার নিচে পড়ে গেছে ভেবে সে মাথা ঝুঁকিয়ে দেখল, সেখানেও নেই।

সে অবাক হয়ে বলল, "আরে, আমার তলোয়ারটা কোথায় গেল?"

সিংহাসনের পিছন থেকে সামনে ঘুরে এসে সন্তু বলল, "এই যে!"

সন্তুর হাতে সেই খাপ খোলা তলোয়ার। তার ডগাটা সে নগল শর্মার গলায় ছুঁইয়ে বলল, "চুপ! কোনও শব্দ করবে না। তা হলেই গলা ফুটো করে দেব!"

আতঙ্কে নকল শর্মার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। সন্তুর বদলে সে যেন ভূত দেখছে!

সন্তু বলল, "জোজো, শিগগির কাকাবাবুর বাঁধন খুলে দে!"

অন্ধকার থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে জোজো কাকাবাবুর দড়ির বাঁধন খোলার চেষ্টা করতে লাগল।

কাকাবাবু বেশ সন্তুষ্টভাবে বললেন, "যাক, তোরা ভাল আছিস তা হলে? রিঙ্কু, আর রঞ্জন কোথায়?"

জোজো বলল, "এখনও দেখতে পাইনি। এই গিঁটগুলো খুলতে পারছি না। একটা ছুরি পেলে ভাল হত।"

কাকাবাবু বললেন, "নাইলনের দড়ি ছুরি দিয়েও কাটা খুব শক্ত। গিঁটগুলোই খোলার চেষ্টা কর। কোনওরকমে আমার হাতটা আগে খুলে দে!"

সন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে অধীরভাবে বলল, "তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি! লোকজন আসছে!"

জোজো তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আরও দেরি করে ফেলল। নখ দিয়ে চেপে ধরেও সে গিঁট খুলতে পারছে না। কোনওরকমে কাকাবাবুর হাতের বাঁধনটা খুলতে-না-খুলতেই হইহই করে ছুটে এল সেখানে চার-পাঁচজন লোক। তাদের মধ্যে একজন মোহন সিং। সে ফূর্তিতে চিৎকার করে বলতে-বলতে এল, "পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে! লোহার দরজা বেরিয়েছে!"

সন্তু আর জোজো পালাবার সুযোগ পেল না। কাকাবাবুকে ফেলে পালাবার কথা তাদের মনেও এল না।

মোহন সিং এসেই খপ্ করে জোজোর চুলের মুঠি চেপে ধরে বলল, "এ কী?"

সন্তু তলোয়ারটা নকল শর্মার গলায় আর-একটু চেপে বলল, "শিগগির কাকাবাবুকে ছেড়ে দাও, নইলে একে আমি মেরে ফেলব!"

মোহন সিং কয়েক মুহূর্ত দারুণ বিস্ময়ে চেয়ে রইল সন্তুর দিকে। যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছে না যে, সন্তুরা এরই মধ্যে বেঁচে এখানে ফিরে এসেছে।

তারপরেই সে ঘোর কাটিয়ে ফস করে একটা রিভলভার বার করে বলল, "তুই ওর গলা কাটবি? কাট! তার আগে এক গুলিতে আমি তোর মাথা উড়িয়ে দেব!"

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, "সন্তু, তলোয়ারটা ফেলে দে!"

সন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তলোয়ারটা নামিয়ে রাখল পায়ের কাছে। একজন লোক ছুটে গিয়ে সন্তুকে চেপে ধরল।

নকল শর্মা রাগের চোটে সপাটে এক চড় কষাল সন্তুর গালে। তারপর মোহন সিংকে বলল, "লোহার দরজা পাওয়া গেছে? তা হলে আর রায়চৌধুরীকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী? ওকে খতম করে দিলেই তো হয়?"

মোহন সিং চওড়া করে হেসে বলল, "আমিও তো তাই ভেবেছি। মাটির নিচে সত্যি একটা লোহার দরজা আছে। এবার দরজা ভেঙে আমরাই হিরেটা বার করতে পারব! এ লোকটাকে আর দরকার নেই। এই বিচ্ছুগুলোকেও ওর সঙ্গে..."

কাকাবাবু হাত দুটো ঘষতে-ঘষতে বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও! একেই বলে কলনেমির লঙ্কা ভাগ! মোহন সিং, তুমি একটা বেওকুফ! আমাকে কি তোমার মতনই বুদ্ধু ভেবেছ? আমি জানতুম, তোমরা কথার খেলাপ করবে! হিরেটার খোঁজ পেয়ে গেলেই আমাক মেরে ফেলতে চাইবে! হিরে পাওয়া এত সহজ? ওই লোহার দরজা খুলে দ্যাখো, ওর মধ্যে কিচ্ছু নেই!"

নকল শর্মা আর মোহন সিং একসঙ্গে বলে উঠল, "কেয়া? কুছ নেহি?"

কাকাবাবু বললেন, "দরজাটা ভাঙবার দরকার নেই। ধাক্কাধাক্কি করলেও খুলবে না। সামনের দিকে জোরসে টান দাও, তা হলেই খুলে যাবে। ওই সিন্দুকের মধ্যে হিরে-মুক্তো কিছুই নেই। এর আগে অন্তত পনেরোজন লোক ওই সিন্দুক খুলে দেখেছে! গত চারশো বছর ধরে কত লোক এই বিজয়নগরের বিখ্যাত হিরে খুঁজছে তা জানো?"

এবারে কস্তুরী এসে পৌঁছল সেখানে। সে সব কথা শুনে হতাশ হয়ে বলল, "অ্যাঁ? ওই সিন্দুকের মধ্যে কিছু নেই? রায়চৌধুরীবাবু, তুমি শুধু-শুধু আমাদের দিয়ে এতখানি মাটি খোঁড়ালে? তুমি আমাদের ধোঁকা দিয়েছ?"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, বেশ মজা তো! আমি ধোঁকা দিয়েছি? তোমরা যে লোহার দরজাটা দেখামাত্রই আমাকে মেরে ফেলতে চাইলে, সেটা কী? আমি তোমাদের এই অমূল্য হিরে খুঁজে দেব, আর তোমরা তারপর আমাকে মেরে ফেলবে। বাঃ, কী চমৎকার!"

মোহন সিং বলল, "ওই হিরে না পেলেও কি তোমাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব ভাবছ?"

কাকাবাবু বললেন, "তাতে তোমাদের ভারী লাভ হবে! শুধু-শুধু মানুষ খুন করাই হবে, হিরে পাবে না। যে জন্য এত কাণ্ড করে এখানে এসেছ, সব নষ্ট হবে! প্রোফেসর শর্মার কথা বন্ধ হয়ে গেছে, তিনি কিছু বলতে পারবেন না। আমিও যদি মরে যাই, তা হলে চিরকালের মতন হারিয়ে যাবে বিজয়নগরের হিরে!"

কস্তুরী বলল, "না, না, তা হতে পারে না। হিরেটা আমাদের চাই! রায়চৌধুরীবাবু, আপনাকে কেউ মারবে না! আপনার সঙ্গের লোকদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে। আমি কথা দিচ্ছি!"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার কথার যে কী দাম আছে, তা তো দেখলাম! আর আমি তোমাদের বিশ্বাস করছি না।"

মোহন সিং জোজোকে এক ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, "বিরজু, বিরজু! এই ছোকরাটার একটা-একটা করে কান কেটে দে। তারপর নাক কাটবি। তা দেখেও রায়চৌধুরী হিরের কথা লুকিয়ে রাখতে পারে কি না দেখতে চাই!"

বিরজু এগিয়ে এসে চুলের মুঠি ধরে জোজোকে আবার দাঁড় করাল। একটা ছুরি বার করে বলল, "কাটব?"

জোজো কাকাবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। কাকাবাবুর মুখের হাসি-হাসি ভাব দেখে সে ভয় পেল না।

কাকাবাবু বললেন, "আবার একটা বোকামি করছ, মোহন সিং! এরকমভাবে জোর করলে আমি তো তোমাদের আর-একটা ধোঁকা দেব! আর-এক জায়গার মাটি খুঁড়তে বলব। দু'-তিন ঘন্টা লেগে যাবে। তারপর দেখবে, সেখানেও কিছু নেই! এই করে-করে রাত ভোর হয়ে যাবে! আমার লোকদের গায়ে একবার হাত ছোঁয়ালে আমি কিছুতেই সত্যি কথা বলব না।"

কস্তুরী এগিয়ে এসে বলল, "বিরজু, ছেলেটিকে ছেড়ে দাও! এভাবে কিছু হবে না। সময় বেশি নেই। রায়চৌধুরীবাবু, আপনার কাছে আমি, মোহন সিং আর কর্নেলসাহেব একসঙ্গো শপথ করব যে, হিরেটা পেলেই আপনাকে আমরা ছেড়ে দেব।" আপনার সঙ্গোর লোকজনদেরও ছেড়ে দেব। তা হলে আপনি মানবেন তো?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কর্নেল কে?"

কস্তুরী নকল শর্মার দিকে হাত দেখাল।

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের ওই শপথ-টপথে আমি মোটেও বিশ্বাস করি না। এবার আমার শর্ত বলছি শোনো। আমার বাঁধন খুলে দাও। আমি নিজে হিরেটা খুঁজতে যাব। আমি নিজে না গেলে অন্য কেউ ঠিকমতন বার করতে পারবে না। অনেক কিছু শেখাতে হবে।"

কস্তুরী সঙ্গো-সঙ্গো বলল, "বাঁধন খুলে দাও! খুলে দাও!"

বিরজু গিঁটগুলো খুলে দিল খানিকটা চেষ্টা করে।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "উঃ, সারা গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে। এমন শক্ত করে কেউ বাঁধে! শুধু হাত দুটো বাঁধাই তো যথেষ্ট ছিল। আমি খোঁড়া মানুষ, আমি কি দৌড়ে পালাতে পারতুম?"

ক্রাচ দুটো তুলে নিয়ে তিনি বললেন, "যে-কুয়োটা খোঁড়া হয়েছে, সেটার কাছে চলো! আমি তোমাদের পুরোপুরি ধোঁকা দিইনি। মিছিমিছি মাটি খুঁড়তে বলিনি!"

পুরো দলটা চলে এল বিঠলস্বামীর মন্দিরের কাছে।

নতুন খোঁড়া গর্তটার মুখের কাছে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু বললেন, "লোহার দরজাটা খুলতে পেরেছ?"

একজন বলল, "জি হাঁ, খোলা হয়েছে। ভেতরে কিছু নেই। সিন্দুকটা খালি!"

কাকাবাবু বললেন, "একেবারে খালি নয়। একেবারে পিছনের দেওয়ালের গায়ে দ্যাখো একটা ত্রিশূল গাঁথা আছে। খুব সাবধানে শাবলের চাড় দিয়ে সেই ত্রিশূলটা খুলে নিয়ে এসো!"

বিরজু নিজে সেই কুয়োর মতন গর্তে নেমে গেল। একটু পরেই সে বলল, "হাঁ, হাঁ, একটা ত্রিশূল আছে।"

সে আবার ওপরে উঠে আসার পর দেখা গেল, তার হাতে একটা সাধারণ লোহার ত্রিশূল। বেশ মোটা। অনেক কালের পুরনো হলেও সেটার গায়ে মরচে পড়েনি!

কাকাবাবু সেই ত্রিশূলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে বললেন, "এই ত্রিশূল আমি আগে দেখেছি, ফার্গুসনসাহেব দেখেছেন, মানুচ্চিসাহেব দেখেছেন, আরও অনেকে দেখেছেন, আমরা কেউই বুঝতে পারিনি, মাটির অত নিচে একটা লোহার সিন্দুকে এরকম একটা সাধারণ ত্রিশূল রাখার মানে কী! আমরা ভেবেছি, আগে বোধহয় ওখানে দামি কোনও মূর্তি ছিল, কেউ চুরি করে নিয়েছে। ভগবতীপ্রসাদ শর্মা মাত্র কিছুদিন আগে একটা বহু পুরনো পুঁথি আবিষ্কার করেছেন। সেটা পড়ে তিনি জানতে পেরেছেন, এই ত্রিশূলটা আসলে চাবি! অন্য একটা সিন্দুকের চাবি। সেইজন্যই এটাকে এত যত্ন করে এমন গোপন জায়গায় রাখা হয়েছে।"

মোহন সিং সেই ত্রিশূলটা কাকাবাবুর হাত থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, অত সহজ নয়! যে সিন্দুকের চাবি এই ত্রিশূলটা, সেটা কোথায় আছে তুমি জানো? সাত জন্মেও খুঁজে পাবে না। যদি খুঁজে পাও, তা হলেও এই চাবি দিয়ে খুলতে পারবে না। কতবার ডান দিকে আর কতবার বাঁদিকে ঘোরাতে হবে, তা একটা শ্লোকের মধ্যে লেখা আছে। সেই শ্লোক না জানলে কোনও লাভ নেই।"

কস্তুরী বলল, "এই মোহন, রায়চৌধুরীবাবুর কাজে বাধা দিও না! আচ্ছা, রায়চৌধুরীবাবু, একটা কথা বলুন তো! প্রোফেসর শর্মাজি যখন এই চাবিটার কথা জানতে পারলেন তখন তিনি নিজে কেন আগে এসে হিরেটা নিলেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "উত্তরটা খুব সোজা। তিনি একা এসে খোঁড়াখুঁড়ি করতে পারতেন না। গভর্নমেন্টকে জানাতে হত। আর গভর্নমেন্টের সাহায্য নিয়ে এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিরেটা খুঁজে বার করলে, সেটা গভর্নমেন্টকেই দিয়ে দিতে হত। সেইজন্যই তিনি তোমাদের সাহায্য নিয়েছিলেন। ফিল্ম তোলার নাম করে এলে জায়গাটা ঘিরে রাখা যায়, রাত্তিরেও কাজ করা যায়। মাটি খুঁড়লেও কেউ সন্দেহ করে না।"

পেছন ফিরে কাকাবাবু আবার হাঁটতে লাগলেন কোণাকুণি আর-একটা ছোট্ট মন্দিরের দিকে। এটা একটা অতি সাধারণ শিবমন্দির, ছাদের অনেকটা ভেঙে পড়েছে, দরজার পাল্লাও নেই। ভেতরে মস্ত বড় একটা শিবলিঙ্গ, তার মাথার কাজটাও কিছুটা ভাঙা।

কাকাবাবু বললেন, "রাজধানী বিজয়নগর যেদিন ধ্বংস হয়, সেদিন আক্রমণকারীরা এখানকার অনেক মন্দিরও ভেঙে একেবারে গুঁড়িয়ে দেয়। শুধু বিঠলস্বামীর মন্দিরটা তারা ভাঙেনি বিশেষ কারণে। মন্দিরের সব ক'টা থাম থেকে একটা অদ্ভুত গানের সুর বেরোচ্ছিল, তা শুনে ওরা ভয় পেয়ে যায়। এই ছোট্ট মন্দিরটাও তারা ভাঙতে চেষ্টা করেছিল। এই দ্যাখো, এই শিবলিঙ্গটা এত শক্ত পাথরের তৈরি যে মাত্র একটুখানি ভাঙতে পেরেছে! ডিনামাইট দিয়ে না ওড়ালে এটা ভাঙা যাবে না।"

তারপর তিনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললেন, "দেখি তো, এর বেদীর মাঝখানে একটা গর্ত থাকার কথা।"

সত্যি তাই, সেই শিবলিঙ্গের তলার বেদীতে চৌকো করে খানিকটা কাটা।

কাকাবাবু সেই কাটা অংশের মধ্যে ত্রিশূলটা ঢোকাতে যেতেই তার ভেতর থেকে ধড়ফড় করে একটা গিরগিটি বেরিয়ে এল। সে বেচারা ভয় পেয়ে পালাতে গিয়ে লাফিয়ে উঠল কস্তুরীর গায়ে। কস্তুরী তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে আর্ত গলায় বলল, "ওরে বাপ রে, এটা কী রে!"

কাকাবাবু বললেন, "ওটা একটা নিরীহ, গিরগিটি। কামড়াবে না। কিন্তু এর মধ্যে সাপখোপ আরও কত-কী আছে কে জানে!"

চোখ বুজে কিছু চিন্তা করে ত্রিশূলটা কয়েকবার ডান দিকে, কয়েকবার বাঁ দিকে ঘোরালেন। অত বড় শিবলিঙ্গটা আস্তে-আস্তে সরে যেতে লাগল।

সেখানে বেরিয়ে পড়ল একটা অন্ধকার গর্ত।

সবাই মুখ দিয়ে বিস্ময়ের শব্দ করে উঠল।

কাকাবাবু মোহন সিং-এর দিকে ফিরে বললেন, "তুমি কি ভাবছ, এটা সিন্দুক? তা মোটেই না। আসল সিন্দুক আছে অনেক নিচে। এরকম আরও তিনবার চাবি ঘোরাতে হবে তিন জায়গায়। বিজয়নগরের রাজারা সাবধানী ছিলেন খুব!"

উঠে দাঁড়িয়ে, ত্রিশূলটা খুলে নিয়ে তিনি সেই অন্ধকার, গর্তের মধ্যে পা বাড়িয়ে বললেন, "আমি এর ভেতরে নামব। সন্তু, জোজো, তোরাও সঙ্গে আয়!"

মোহন সিং বলল, "না, ওরা যাবে না। ওরা বাইরে জামিন থাকবে। আপনি ফিরে এলে ওদের ছাড়ব।"

কাকাবাবু বললেন, "জামিন আবার কী! আমি খোঁড়া পায়ে একা সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারব না। ওদের সাহায্য লাগবে। তোমরা এই গর্তের বাইরে অপেক্ষা করো।"

মোহন সিং বলল, "তা আমাদেরও একজন আপনাদের সঙ্গে-সঙ্গে যাবে। আমি নিজেই যাচ্ছি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি এত মোটা, তুমি যেতে পারবে না। এক জায়গায় আটকে যাবে।"

বিরজু বলল, "আমি যাচ্ছি! আমি ওদের পাহারা দেব! আমাদের একটা টর্চ দাও।"

শুধু টর্চ নয়, মোহন সিং বিরজুর হাতে তুলে দিল নিজের রিভলভারটাও।

প্রথমে কাকাবাবু, তারপর সন্তু, জোজো আর বিরজু নেমে গেল সেই গর্ত দিয়ে। মোহন সিং, কস্তুরীরা উঁকি দিয়ে রইল গর্তের মুখে।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওরা নামছে তো নামছেই। ক্ষীণভাবে দেখা যাচ্ছে টর্চের আলো। একসময় সেটাও মিলিয়ে গেল। বোধহয় সুড়ঙ্গটা বেঁকে গেছে সেখানে।

হঠাৎ অনেক নীচ থেকে একটা বিকট ভয়ের চিৎকার শোনা গেল। সেটা কার গলার আওয়াজ তা বোঝবার আগেই কিসের যেন ধাক্কায় ছিটকে গেল মোহন সিং আর কস্তুরীরা। দড়াম করে একটা শব্দ হল।

শিবলিঙ্গটা আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে। সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে।

মোহন সিং হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "বন্ধ করে দিয়েছে! ও ইচ্ছে করে বন্ধ করে দিয়েছে!"

রিঙ্কুকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে সেই মাটির নীচের ঘরটায়। সেখানে অবশ্য এখন মোম জ্বলছে। সেই মোমের পাশে চুপটি করে বসে আছে জানকী। তার অবশ্য মুখ আর হাত-পায়ের বাঁধন এখন খোলা।

জানকীকে দেখে রিঙ্কুর একটু লজ্জা করল। সে মুখটা ফিরিয়ে রইল অন্যদিকে।

জানকী শান্ত গলায় বলল, "এসো বহিন! আমি তোমার ওপর রাগ করিনি। আমি তো আগে জানতাম না যে, তোমাদের এরা জোর করে ধরে রেখেছে। আমাকে বলেছিল, তুমি একটু পাগল। তাই তোমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করাই ছিল আমার কাজ। তোমাকে এরা কেন ধরে রেখেছে?"

রিঙ্কু মুখ না ফিরিয়ে বলল, "আমি তা কী করে জানব?"

জানকী বলল, "আর-একজন খোঁড়াবাবুকেও নাকি এরা হাত-পা বেঁধে রেখে দিয়েছে!"

এবারে রিঙ্কু মুখ ফিরিয়ে ব্যস্তভাবে বলল, "কোথায়? কোথায়?"

জানকী বলল, "সেটা ঠিক জানি না। ওপরের সেপাইটা বলল। তোমাকে দিয়ে জোর করে ফিল্মের পার্ট করাতে চাইছে কেন তাও তো বুঝি না! আমি কত ফিল্মের মেকআপের কাজ করেছি, এরকম কখনও দেখিনি!"

রিঙ্কু জিজ্ঞেস করল, "আমাদের সঙ্গে আরও যারা ছিল, একজন দাড়িওয়ালা, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, সে কোথায় আছে জানো? আরও দুটি অল্প বয়েসী ছেলে?"

জানকী বলল, "তাদের কথা তো কিছু শুনিনি। তুমি পালাতে পারলে না? ধরা পড়লে কী করে?"

রাগে-দুঃখে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে রিঙ্কু বলল, "গেটের কাছের পুলিশগুলোই তো আমাকে ধরিয়ে দিল। পুলিশের কাছে সাহায্য চাইলুম, কস্তুরী এসে পড়ল সেই সময়ে!"

জানকী বলল, "ওই কস্তুরী দেবী বড় হিংসুটি! অন্য কোনও সুন্দরী মেয়েকে ও সহ্য করতে পারে না। তোমাকে খুব কষ্ট দেবে। এখন তো শুনছি, সুজাতাকুমারীর পার্টের যে-জায়গাটা ডামি দিয়ে করাবার কথা, সেই জায়গাটা তোমাকে দিয়ে করাবে।"

রিঙ্কু বলল, "সিনেমায় ডামি কাকে বলে জানো না? মনে করো, ফাইটিং সিন। হিরো একজনের সঙ্গে ঘুঁসোঘুসি করছে। সেখানে কিন্তু সত্যিকারের হিরো লড়ে না। হিরোর মতন পোশাক পরে আর-একজন খুব ঘুসি চালায়, ক্যামেরার কায়দায় তাকেই হিরো মনে হয়। তাকেই বলে ডামি। সেইরকম হিরোইন যখন ঘোড়া ছুটিয়ে যায় কিংবা জলে ঝাঁপ দেয়, সত্যিকারের হিরোইনরা তো ওসব পারে না। অন্য একজন করে দেয়।"

"আমাকে দিয়ে কী করাতে চায় ওরা?"

"আমি তো স্টোরিটা সব জানি না। একটু পরেই তোমাকে এসে ওরা বলবে। তুমি শাড়িটা বদলে নাও।"

"আমার হাত যে বাঁধা! এই অবস্থায় শাড়ি বদলাব কী করে? আমার হাত খুলে দাও!"

"ওরে বাবা, আমি খুলে দিতে পারব না। আমাকে মেরে ফেলবে। তুমি তখন আমার মুখ বেঁধে পালিয়ে গেলে, সেইজন্য ওরা এসে আমায় কী করেছে জানো? এই দ্যাখো, আমার মাথার চুল কেটে দিয়েছে।"

"আমার এইরকম হাত বাঁধাই থাকবে?"

"তাই তো বলেছে। আচ্ছা, আমি তোমায় শাড়ি পরিয়ে দিচ্ছি!"

রিঙ্কু দেওয়ালের দিকে সরে গিয়ে বলল, "খবর্দার! আমি মোটেই আমার শাড়ির বদলে এই শাড়ি পরব না!"

জানকী বলল, "এই রে! তা হলে আমি কি করি! ঠিক আছে! শাড়ি এখন নাই-বা বদলালে। তোমাকে মেকআপটা করে দিই? চোখে কাজল দিতে হবে। গালে লাল রং মাখতে হবে।"

রিঙ্কু বলল, "আমি ওসব কিছু মাখবই না। কিছুতেই মাখব না!"

জানকী কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "তুমি কোনও কথাই শুনবে না? আমি তো তোমার ওপর জোর করতে পারব না!"

রিঙ্কু বলল, "তুমি যখন এদের দলে নও, তা হলে তুমি বরং একটা কাজ করো। তুমি বাইরে গেলে তো তোমাকে আটকাবে না। তুমি গিয়ে দেখে এসো, সেই যে খোঁড়া ভদ্রলোককে ওরা হাত-পা বেঁধে রেখেছিল, তিনি ছাড়া পেয়েছেন কি না। আর-একজন লোককে খুঁজবে, ওই বললুম, সারা মুখে দাড়ি, লম্বা-চওড়া, মাথার চুল বাবরি মতন, তাকে বলবে যে, আমাকে এখানে আটকে রেখেছে। আমার নাম রিঙ্কু!"

জানকী বলল, "এই অন্ধকারের মধ্যে আমি তাদের কোথায় খুঁজে পাব?"

"একটুখানি ঘুরে দ্যাখো। বুঝতে পারছ না, আমাদের কতখানি বিপদ। ওরা যদি কাকাবাবুকে মেরে ফ্যালে, উনি কতবড় একজন নাম-করা লোক, তুমি জানো?"

"আমি বাইরে বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করলে ওরা সন্দেহ করবে।"

"একটু সাবধানে ঘুরবে। রঞ্জনকে একটা খবর দিতেই হবে। ও হ্যাঁ, ওই দাড়িওয়ালা লোকটির নাম রঞ্জন। জানকী, প্লিজ যাও?"

"আমার ভয় করছে, বহিন।"

"মানুষ বিপদে পড়লে তুমি এইটুকু সাহায্য করবে না?"

"যদি আমি ধরা পড়ে যাই?"

"তুমি কেন ধরা পড়বে, তোমাকে তো ওরা আটকে রাখেনি। তুমি কাজ করতে এসেছ। যাও, লক্ষ্মীটি, আমাদের বিপদ কেটে গেলে তোমাকে আমি এক জোড়া সোনার দুল উপহার দেব।"

জানকী থুত্‌নিতে আঙুল দিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

রিঙ্কু তাকে তাড়া দিয়ে বলল, "যাও, আর দেরি করো না!"

জানকী বলল, "ঠিক আছে, যাচ্ছি! তুমি... তুমি ততক্ষণ অজ্ঞান হবার ভান করে শুয়ে থাকো। আমায় যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে, আমি বলব, তুমি অজ্ঞান হয়ে গেছ বলে আমি ওষুধ আনতে যাচ্ছি। ওরা দেখতে এলে তুমি অজ্ঞান সেজে থাকতে পারবে তো?"

রিঙ্কু মাথা নেড়ে বলল, "তা পারব না কেন? অজ্ঞান সাজা আবার শক্ত নাকি?"

জানকী বলল, "তা হলে তুমি চোখ বুজে শুয়ে পড়ো!"

রিঙ্কু মোমবাতিটার দিকে তাকাল, "সে মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছে, জানকী চলে গেলেই সে মোমবাতির শিখায় তার দড়ির বাঁধনটা পুড়িয়ে ফেলবে। তারপর যা হয় দেখা যাবে।"

জানকী সিঁড়ির দিকে এগোতেই শপাং করে একটা চাবুকের ঘা পড়ল তার মুখে। জানকী ভয়ে একেবারে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

সিঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মোহন সিং। জানকীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আমি সব শুনেছি। তুই আবার একে সাহায্য করছিস? এবার তোকে বাঁধব।"

জানকী হাত জোড় করে বলল, "সাহেব, আমার কোন দোষ নেই। আমার কোনও দোষ নেই। আমি ওকে মিথ্যে কথা বলে আপনাদেরই খবর দিতে যাচ্ছিলাম। ও শাড়িটা বদলাতে চাইছে না। ওই মিলের শাড়ি পরে ও কী করে হিস্টোরিক্যাল বইতে পার্ট করবে?"

মোহন সিং বলল, "ওতেই হবে! মেয়েটা যদি যেতে না চায়, জোর করে ওকে তুলে নিয়ে যাব। তুই মাথার দিকটা ধর, আমি পা দুটো চেপে ধরছি।"

রিঙ্কু সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমাকে নিয়ে যেতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি।"

মোহন সিং রিঙ্কুর হাতের দড়িটা ধরে টেনে বলল, "চল!"

মাঠের মধ্য দিয়ে রিঙ্কুকে টানতে-টানতে এনে দাঁড় করানো হল বিঠলস্বামী মন্দিরের পেছন দিকটায়। সেখানে এখন বড়-বড় আলো জ্বেলে একটা ক্যামেরা সাজানো হয়েছে। দশ-বারোজন লোক ঘোড়ায় চেপে বসে আছে আগেকার দিনের সৈন্যদের মতন সাজপোশাক করে। নকল শর্মাজির ছবি তোলা হচ্ছে সেইসব অশ্বারোহী সৈন্যদের সঙ্গে।

রিঙ্কুকে একজন লোকের সামনে বসিয়ে দিয়ে মোহন সিং বলল, "দেখিস একে! আমি আসছি!"

ছোট ভাঙা মন্দিরটার মধ্যে সেই শিবলিঙ্গটিকে অনেক ঠেলাঠেলি করেও আর এক চুলও নড়ানো যায়নি। সুড়ঙ্গের মধ্যে যে কী হচ্ছে তা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। চারজন বন্দুকধারী গার্ডকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে তার চারপাশে।

বিঠলস্বামী মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতকে ঘুম থেকে তুলে এনে কস্তুরী বারবার জিজ্ঞেস করে চলেছে, এই শিবলিঙ্গটাকে সে কখনও সরতে দেখেছে কি না। বৃদ্ধটি বারবার মাথা নেড়ে বলে যাচ্ছে, সে জীবনে কখনও দ্যাখেনি।

মোহন সিং এসে কস্তুরীকে বলল, "এখানে তো পাহারা রইলই। চলো, ততক্ষণ আমরা শুটিং সেরে আসি!"

কস্তুরী বলল, "তুমি আগে তোমারটুকু করে নাও। আমি পরে যাব। ওই মেয়েটার মুখখানা ভাল করে মাটির সঙ্গে ঘষে দিও!"

মোহন সিং বলল, "রায়চৌধুরী কোথা পালাবে? আমি তাকে কিছুতেই ছাড়ব না!"

তারপর সে শিবলিঙ্গের নীচের বেদীটার চৌকো গর্তে মুখ দিয়ে বলল, "রায়চৌধুরী, ভাল চাও তো বেরিয়ে এসো। তোমাদের দলের মেয়েটার গা থেকে আমি ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছি!"

মোহন সিং-এর কথা সুড়ঙ্গের মধ্যে পৌঁছল কি না কে জানে। ভেতর থেকে কোনও উত্তর এল না।

কস্তুরী বলল, "আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।"

মোহন সিং দপদপিয়ে বেরিয়ে গেল সেই মন্দির থেকে। শুটিং-এর জায়গায় গিয়ে বলল, "আরম্ভ করো।"

খুব রোগা লিকলিকে চেহারার একজন লোককে মনে হল পরিচালক। সে বলল, "আমি সিনটা আগে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঘোড়ায় চড়া সৈন্যরা প্রথমে দু'জন দু'জন করে ছুটে যাবে ক্যামেরার সামনে দিয়ে। বেশি দূরে যাবে না কিন্তু, একটুখানি গিয়েই পেছন দিক দিয়ে ঘুরে এসে ঠিক আবার আগের মতন ক্যামেরার সামনে দিয়ে যাবে। তাতে মনে হবে, পরপর অনেক ঘোড়া ছুটছে। এইরকম ঠিক চারবার ঘুরে যাবে। শেষবার আর থামবে না। অনেকদূরে মিলিয়ে যাবে। সেটা আমি লং শট নেব। ঠিক বুঝেছ?"

ঘোড়ায় চড়া সৈন্যদের মধ্যে একজন বলল, "হ্যাঁ, সার, ঠিক আছে!"

পরিচালক বলল, "ঠিক গুনে-গুনে চারবার ঘুরে যাবে। তারপর দূরে মিলিয়ে যাবে, মনে থাকে যেন। এরপর মোহন সিং-এর সিন। আপনি এই বন্দিনী মেয়েটিকে আপনার ঘোড়ার ওপর আড়াআড়িভাবে শুইয়ে নিয়ে যাবেন!"

মোহন সিং-বলল, "ঘোড়ার পিঠে নিয়ে যাব না। ওকে আমি মাটি দিয়ে হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে নিয়ে যাব।"

পরিচালক একটু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "সে কী, স্ক্রিপ্ট বদলে গেছে? আগে তো ঘোড়ার পিঠে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল!"

মোহন সিংহ বলল; "হ্যাঁ, বদলে গেছে!"

পরিচালক বলল, "সে কী, বদলে গেলে, আর আমি জানলাম না?"

মোহন সিং বলল, "যা বলছি, তাই শোনো!"

পরিচালক তবু বলল, "ঘোড়ার পিঠে শুইয়ে নিয়ে গেলে পরের সিনটার সঙ্গে... মানে, পরে এই মেয়েটির সঙ্গেই তো আপনার বিয়ে হবে, তাকে মাটি দিয়ে হেঁচড়ে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?"

মোহন সিং বলল, "হ্যাঁ, এটাই ঠিক হবে। আমি বলছি, এইটাই হবে!"

পরিচালক বলল, "তবে তো হবে নিশ্চয়ই। আমি টেক করছি। লাইট, লাইট ঠিক করো।"

রিঙ্কু চেঁচিয়ে বলল, "আমি এই পার্ট করব না!"

মোহন সিং বলল, "এই মেয়েটার মাথার গোলমাল আছে। এর কোনও কথায় কান দেবার দরকার নেই!"

অশ্বারোহীদের একজন ফিসফিসিয়ে আর একজনকে বলল, "এ মেয়েটা কে? এ তো সুজাতাকুমারী নয়?"

পাশের অশ্বারোহী বলল, "তাই তো মনে হচ্চে। এ সুজাতাকুমারী হতেই পারে না।"

প্রথম অশ্বারোহীটি হাসতে-হাসতে বলল, "সুজাতাকুমারীর পেট খারাপ হয়েছে শুনেছি। এরা কোথা থেকে একটা পাগলিকে ধরে এনছে!"

পাশের অশ্বারোহীটি হাসতে-হাসতে বলল, "ঠিক বলেছ। পাগল, একদম পাগল!"

পরিচালক হেঁকে বলল, "সব চুপ! টেকিং! স্টার্ট সাউন্ড! ক্যামেরা...."

অন্যদিক থেকে দু'জন বলল, "রানিং!"

অশ্বারোহী সৈন্যরা দৌড়ে গেল ক্যামেরার সামনে দিয়ে। মোট বারোটা ঘোড়া, কিন্তু তারা ঘুরে-ঘুরে আসতে লাগল বলে সত্যি মনে হল অনেক অশ্বারোহী যাচ্ছে। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে সব সৈন্যদের মুখ একইরকম দেখায়।

চারবারের পর তারা মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়ার খুরের কপাকপ-কপাকপ শব্দ শোনা গেল খানিকক্ষণ।

পরিচালক বলল, "গুড! ভেরি গুড! এবার মোহন সিং-এর সিন। আপনি তৈরি হয়ে নিন!"

মোহন সিং-এর জন্য এবার আর-একটা ঘোড়া আনা হল। হাতে একটা তলোয়ার নিয়ে মোহন সিং অন্য একজনের কাঁধে ভর দিয়ে সেই ঘোড়ায় চাপল। তারপর বলল, "মুকুট? আমার মাথার মুকুটটা কোথায়?"

একজন এসে একখানা প্রায় আসলের মতন দেখতে রাজমুকুট পরিয়ে দিল তার মাথায়।

এবার সে বলল, "ওই মেয়েটার হাতের দড়িটার একটা দিক আমাকে দে!"

রিঙ্কু জোর করে দড়িটা টেনে রেখে বলল, "আমি যাব না। আমি যাব না!"

মোহন সিং হাসতে-হাসতে বলল, "তোলো, এইখান থেকে তোলো!"

মোহন সিং ঘোড়াটার পেটে একটা লাথি মারতেই ঘোড়াটা এগিয়ে গেল কয়েক কদম। দড়ির হ্যাঁচকা টানে রিঙ্কু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। এবার তার কান্না এসে গেল।

সে বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও!"

হা-হা শব্দে আকাশ ফাটানো অট্টহাসি দিয়ে উঠল মোহন সিং।

একবার চেঁচিয়েই থেমে গেল রিঙ্কু। সে বুঝতে পারল, কাঁদলে কিংবা কাকুতি-মিনতি করলে এরা কেউ শুনবে না। সবাই ভাববে, এটাই অভিনয়।

পরিচালক বলল, "ফাইন। তবে, আর-একবার করতে হবে। দড়িটা আরও লম্বা হলে ভাল হয়।"

মোহন সিং বলল, "ঠিক আছে। যতক্ষণ না ভাল হয়, ততবার আমি ওকে মাটিতে ছ্যাঁচড়াব। ওর হাতে একটা লম্বা দড়ি বেঁধে দাও!"

রিঙ্কু মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। বাধা দিয়ে আর কোনও লাভ নেই বলে সে চুপ করে রইল। একজন একটা মোটা লম্বা দড়ি বেঁধে দিল তার দু"হাতে।

মোহন সিং বলল, "মেয়েটাকে আবার দাঁড় করিয়ে দাও। আমি আবার হ্যাঁচকা টান মারলে ও পড়ে যাবে, সেইখান থেকে ছবি তুলবে। তারপর ওকে অনেকখানি টেনে নিয়ে যাব।"

পরিচালক বলল, "হ্যাঁ, ঠিক আছে। তবে, প্রথমটায় আপনি আস্তে-আস্তে টানবেন। তারপর জোরে।"

রিঙ্কুকে একটা পুতুলের মতন দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। দড়ির টানে আবার সে পড়ে গেল। তলোয়ারটা উঁচিয়ে হাসতে-হাসতে ঘোড়া ছোটাতে লাগল মোহন সিং।

হঠাৎ উলটো দিকের অন্ধকার থেকে ছুটে এল আর-একটা ঘোড়া। একজন বিশাল চেহারার অশ্বারোহী তলোয়ার তুলে হা-রে-রে-রে বলে চিৎকার করতে-করতে এসে প্রথমে মোহন সিং-এর তলোয়ারে এক ঘা মারল। মোহন সিং-এর হাত থেকে তলোয়ার ছিটকে গেল, ঝোঁক সামলাতে না পেরে সেও পড়ে গেল ঘোড়া থেকে।

সেই অশ্বারোহী তারপর এক কোপে কেটে দিলে রিঙ্কুরর হাতের দড়ি।

তারপর রাশ টেনে ছুটন্ত ঘোড়াটাকে থামাতেই ঘোড়াটা চিঁ-হি-হি-হি করে ডেকে দাঁড়িয়ে পড়ল দু'পা তুলে। ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে এনে অশ্বারোহী ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়াল। দড়িটা কাটবার পর রিঙ্কু উঠে দাঁড়াতেই সেই অশ্বারোহী এক হাতে রিঙ্কুকে তুলে নিল নিজের ঘোড়ায়। তারপর ঘোড়াটা প্রায় ক্যামেরার ওপর দিয়েই লাফিয়ে চলে গেল। অশ্বারোহী আবার চিৎকার করে উঠল, "হা-রে-রে-রে!"

সব ব্যাপারটা ঘটে গেল প্রায় চোখের নিমেষে। অন্য সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। অনেকেই ভাবল, সেই ব্যাপারটাও বোধহয় সিনেমার গল্পের মধ্যে আছে।

মোহন সিং উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে বলতে লাগল, "পাকড়ো! পাকড়ো! উসকো পাকড়ো! ডাকু!"

অশ্বারোহীটি মন্দিরের এলাকা পেরিয়ে মাঠের মধ্যে এসে পড়েছে। এবার সে ফুর্তিতে বলে উঠল, "পৃথ্বীরাজ-সংযুক্ত! পৃথ্বীরাজ-সংযুক্ত! কেমন দিলুম, অ্যাঁ? ঠিক নিক অফ দা টাইমে এসে পড়েছি! কী গো, রিঙ্কু, খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলে, তাই না?"

রিঙ্কু বলল, "রঞ্জন! তুমি কোথায় ছিলে?"

রঞ্জন বলল, "তোমার কাছেই ছিলুম, চিনতে পারোনি তো? সৈন্য সেজে ছিলুম, ক্যামেরার সামনে শুটিং করলুম ঘোড়া ছুটিয়ে।"

রিঙ্কু বলল, "সৈন্য সাজলে কী করে?"

রঞ্জন বলল, "খুব সোজা! আমাকে শরবত খাইয়ে অজ্ঞান করে দিয়ে কোথায় যেন ফেলে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। এত বড় লাশ তো আর বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তাই ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এক ব্যাটা। কিন্তু আমাকে তো চেনে না। দেড় গেলাস শরবত খেয়ে টক্ করে অজ্ঞান হয়ে গেলেও জ্ঞান ফিরে এসেছে তাড়াতাড়ি। ভেজাল, ভেজাল, আজকাল বিষেও ভেজাল! জ্ঞান ফেরার পরেই আমি সেই ব্যাটাকে কাবু করে হাত-পা বেঁধে ফেললুম। তারপর তার সঙ্গে আমার পোশাক বদলা-বদলি করে ফিরে এলুম এখানে। সৈন্যদের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে ছিলুম।"

রিঙ্কু বলল, "উঃ, রঞ্জন, যদি আর একটু দেরি করতে, তা হলে আমি বোধহয় মরেই যেতুম!"

রঞ্জন বলল, "কেন, পাথরে নাক ঘষে গেছে বুঝি? মুখখানা নষ্ট হয়ে যায়নি তো? তোমার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমি একবার পাগল, একেবারে পাগল বলে হাসলুম, তখন আমার গলা শুনেও চিনতে পারোনি?"

রিঙ্কু বলল, "খেয়াল করিনি। তখন মনের অবস্থা এমন ছিল..."

রঞ্জন বলল, "ভয় পেয়ে কাঁদছিলে!"

রিঙ্কু বলল, "মোটেই আমি কাঁদিনি! রঞ্জন, রঞ্জন, পিছনে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ওরা তাড়া করে আসছে।"

রঞ্জন বলল, "শক্ত করে ধরে থাকো, পাগলি! এবার ঘোড়াটাকে পক্ষিরাজের মতন উড়িয়ে নিয়ে যাব!"

রিঙ্কু বলল, "সাবধান, সাবধান! সামনে একটা পাঁচিল, এদিকে যাওয়া যাবে না!"

রঞ্জন বলল, "অন্ধকারে যে কিছুই দেখা যাচ্চে না।"

রঞ্জন ঘোড়াটাকে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে নিতেই কোনাকুনি এসে কয়েকজন অশ্বারোহী তাকে প্রায় ধরে ফেলল।

রঞ্জন বলল, "কুছ পরোয়া নেই। ডরো মত্ রিঙ্কু!"

তার পাশে একজন অশ্বারোহী আসতেই রঞ্জন তার তলোয়ার তুলল। অন্য অশ্বারোহীটির হাত থেকে দু-তিনবার আঘাতেই খসে গেল তলোয়ার।

রঞ্জন বলল, "আরে ব্যাটা, তোরা তো সিনেমার জন্য সৈন্য সেজেছিলি। তোরা আমার সঙ্গে লড়তে পারবি? আমি পয়সা খরচ করে ফেনসিং শিখেছি!"

দ্বিতীয় সৈন্যটির তলোয়ারে আঘাত করতে-করতে রঞ্জন বলল, "ইশ, এই লড়াইটার কেউ ছবি তুলছে না? তা হলে একটা রিয়েল ফাইটিং-এর ছবি হত। আমার ভাগ্যটাই খারাপ!"

দ্বিতীয় অশ্বারোহীটিও হেরে গিয়ে পালিয়ে গেল।

তারপর এগিয়ে এল মোহন সিং।

রঞ্জন বলল, "এই তো, এবার রিয়েল ভিলেইন এসেছে! এবার তোমাকে পেয়েছি চাঁদু! দস্যু মোহন সিং, আজ তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন!"

মোহন সিং বলল, "কোথায় পালাবি তুই? এই দ্যাখ, তোকে খতম করছি!"

মোহন সিং ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে তলোয়ারটা ধরে প্রচণ্ড জোরে একটা কোপ মারতে গেল রঞ্জনের পিঠে। রঞ্জন সামান্য একটু সরে গিয়ে সেই কোপটা এড়িয়ে গেল। হাসতে-হাসতে বলল, "এ ব্যাটা কিস্যু জানে না। শুধু গণ্ডারের মতন গায়ের জোর দেখাতে এসেছে। দু' হাতে কেউ সোর্ড ধরে! এটা কি গদা পেয়েছিস্?"

মোহন সিং দ্বিতীয়বার তলোয়ার তোলার আগেই রঞ্জন তার কব্জিতে একটা আঘাত করল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে মোহন সিং পড়ে গেল তার ঘোড়া থেকে।

রঞ্জন বলল, "এবার এ-ব্যাটার গলাটা কেটে ফেলি, কী বলো রিঙ্কু?"

রিঙ্কু বলল, "ছিঃ! তুমি মানুষ খুন করবে নাকি! মানুষকে কখনও মারতে নেই!"

রঞ্জন বলল, "এই তো মুশকিল, আমাদের বড্ড দয়ার শরীর। এ ব্যাটা সত্যি-সত্যি মানুষ কি না, সে বিষয়ে তুমি কি শিওর?"

রিঙ্কু বলল, "তা হোক, তবু তুমি ওকে মেরো না!"

রঞ্জন বলল, "একেবারে মেরে ফেলব না। তবে কিছু শাস্তি দেবই। তোমাকে মাটিতে ঘষটেছে, ওকে আমি ঘোড়া নিয়ে মাড়িয়ে দেব!"

মোহন সিং ডান হাতের রক্তমাখা কব্জিটা বাঁ হাতে চেপে ধরে কোনওক্রমে উঠে দাঁড়িয়েছে। রঞ্জন হুড়মুড় করে ঘোড়াটা চালিয়ে দিল তার গায়ের ওপর দিয়ে।

ঘোড়াটাকে আবার ফিরিয়ে বলল, "একেবারে হয়নি, আরও দু-তিনবার দিতে হবে।"

রিঙ্কু বলল, "না, রঞ্জন, আর থাক।"

হঠাৎ দুটো বন্দুক গর্জে উঠল দূর থেকে।

রঞ্জন বলল, "রিঙ্কু, মাথা নিচু করো, মাথা নিচু করে প্রায় শুয়ে পড়ো! গুলি ছুঁড়ছে!"

মোহন সিং-কে ছেড়ে সে ঘোড়াটা ছোটাল অন্যদিকে। বিড়বিড় করে বলল, "কাওয়ার্ডস! আনফেয়ার মিন্স নিচ্ছে। আমার কাছে বন্দুক-পিস্তল কিচ্ছু নেই। তবু ওরা গুলি ছুঁড়ছে কেন? সামনা-সামনি লড়ে যাবার হিম্মত নেই!"

মাঝে-মাঝেই এক-একটা ভাঙা দেওয়াল এসে পড়ছে বলে ঘোড়ার মুখ ফেরাতে হচ্ছে বারবার। একটা দিক অনেকটা ফাঁকা পেয়ে রঞ্জন ঘোড়া ছুটিয়ে দিল প্রচণ্ড জোরে। গুলির আওয়াজ আর শোনা গেল না।

রিঙ্কু বলল, "আস্তে, এবার একটু আস্তে। আর আমি ধরে থাকতে পারছি না! পড়ে যাব!"

রঞ্জন বলল, "ঘোড়া এখন পক্ষিরাজ! আর কে ধরবে আমাদের!"

বলতে-বলতেই ঘোড়াটা একটা উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিলে সামনে। সবাই মিলে একসঙ্গে ঝপাং করে গিয়ে পড়ল জলে। সেখানে একটা নদী।

রঞ্জন বলল, "যাক, ভালই হল। আজ সারাদিন স্নান করা হয়নি, মনে আছে? তুমিও অনেক ধুলোবালি খেয়েছ। এবার নদীতে ভাল করে স্নান করা যাবে।"

◀ ৮ ▶

ত্রিশূলটা সন্তুর হাতে দিয়ে কাকাবাবু টর্চ নিয়ে এগোচ্ছেন সামনে-সামনে। তাঁর পেছনে সন্তু। তারপর জোজো। বিরজু সিং জোজোর চুলের মুঠি ধরে আছে এক হাতে, অন্য হাতে রিভলভারটা রেডি রেখেছে।

সিঁড়িটা শুধু যে সরু তাই নয়, মাঝে-মাঝে দু-একটা ধাপ একেবারে ভাঙা। কাকাবাবু একটা ক্রাচ বাড়িয়ে আগে দেখে নিচ্ছেন পরের ধাপটা আছে কি না, তারপর পা ফেলছেন। সন্তু পেছন থেকে ধরে আছে কাকাবাবুর কোমর, যাতে তিনি হঠাৎ পা পিছলে পড়ে না যান।

সন্তু নিজেই আগে-আগে যেতে চেয়েছিল, কাকাবাবু রাজি হননি। তিনি কয়েকবার জোরে নিশ্বাস টেনে বললেন, "একটা বিচ্ছিরি গন্ধ পাচ্ছি। কিসের গন্ধ বলতে পারিস?"

সন্তু বলল, "বুঝতে পারছি না। কিছু একটা পচা গন্ধ মনে হচ্ছে।"

প্রায় তিরিশটা সিঁড়ি নামবার পর টর্চের আলোয় চক চক করে উঠল কালো জল।

কাকাবাবু বললেন, "এই রে, এখানে জল দেখছি। কতটা গভীর কে জানে!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আমি নেমে দেখব?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আগেই তোর নামবার দরকার নেই। আমি দেখে নিচ্ছি।"

সিঁড়ির ওপর বসে তিনি একটা ক্রাচ বাড়িয়ে দিলেন সামনে। সেটা বেশি ডুবল না। মাটিতে ঠকঠক শব্দ হল।

কাকাবাবু বললেন, "না, এখানে জল বেশি নেই। সামনে আর সিঁড়িও নেই। শক্ত মাটি। এখন চিন্তার কিছু নেই।"

সেই জলের মধ্যে এগোতে-এগোতে এক জায়গায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল। তারপর আবার জল কমে গেল। খানিকটা জায়গা একেবারে শুকনো।

কাকাবাবু বললেন, "এই রাস্তাটা উঁচু-নিচু। যেখানটা ঢালু, সেখানে জল জমে আছে!"

জোজো বলল, "এত নীচে জল এল কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না এখনও।"

সন্তু বলল, "মাটির তলা থেকে জল উঠতে পারে। এরকম একটা গভীর কুয়ো খুঁড়লে কি জল বেরোত না?"

কাকাবাবু বললেন, "এসব পাথুরে দেশে অনেক গভীর করে কুয়ো খুঁড়তে হয়। তা ছাড়া যেখানে মাটির তলা থেকে জল ওঠে, সেখানে কি রাজারা গুপ্ত ঘর বানাত? কী জানি, দেখা যাক।"

জোজো বলল, "এই লোকটা আমার চুল খামচে ধরে আছে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যিই তো। ওর চুল চেপে ধরার কী দরকার?"

টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে তিনি বিরজু সিংকে বললেন, "এই, তুম ওকে ছেড়ে দাও না! আমরা তো আর পালাচ্ছি না এখান থেকে!"

বিরজু সিং গম্ভীরভাবে বলল, "নেহি! নেহি ছোড়ে গা!"

কাকাবাবু বললেন, "এ তো আচ্ছা গোঁয়ার দেখছি!"

জোজো সন্তুর কোমরে একটা খোঁচা মেরে কী যেন ইঙ্গিত করল। তারপর সে কাকুতিমিনতি করে বলল, "ও সিংজি! একবার একটু ছাড়ো। আমার খুব মাথা চুলকোচ্ছে। একবার চুলকে নিই?"

বিরজু সিং হাতের মুঠিটা আলগা করল।

জোজো পকেট থেকে হাত বার করে মাথা চুলকোবার জন্য ওপর দিকে হাত তুলেই শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ছুঁড়ে দিল বিরজু সিং-এর চোখে।

বিরজু সিং 'মর গয়া, মর গয়া' বলে আর্তনাদ করে উঠল। সেই অবস্থাতেই এক হাতে চোখ চাপা দিয়ে অন্য হাতে গুলি চালাতে গেল, সন্তু তার ত্রিশূলটা দিয়ে খুব জোর মারল সেই হাতে।

হাত থেকে রিভলভারটা খসে পড়ে গেলেও বিরজু সিং অন্ধের মতন লাফিয়ে জোজোকে জাপটে গলা টিপে ধরল। এবার সন্তু আর এক ঘা ত্রিশূল কষাল তার মাথায়।

বিরজু সিং 'আঃ' বলে ঢলে পড়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "কী করলি রে, মেরে ফেললি নাকি লোকটাকে?"

সন্তু বলল, "না। ত্রিশূলের পাশ দিয়ে মেরেছে। গেঁথে দিইনি। অজ্ঞান হয়ে গেছে। জোজো, তুই কী করলি রে, লোকটাকে?"

জোজো বলল, "সেই শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। সকালবেলা পকেটে নিয়েছিলুম মনে নেই? কাজে লেগে গেল!"

সন্তু বলল, "তুই যে এবার সত্যিই দারুণ কাণ্ড করে ফেললি রে, জোজো! আমি আগে বুঝতেই পারিনি।"

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, "এ আর এমনকী? এরকম কত গুণ্ডাকে আমি আগে ঘায়েল করেছি? একবার ইজিপ্টে.."

কাকাবাবু বললে, "এবার থেকে জোজোর সব কথাই বিশ্বাস করতে হবে। লোকটাকে যখন অজ্ঞান করেই ফেলেছিস, তা হলে ওর হাত-পা বেঁধে ফ্যাল। নইলে কখন আবার পেছন থেকে এসে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে!"

জোজো বলল, "দড়ি কোথায় পাওয়া যাবে?"

কাকাবাবু বললে, "দড়ি পাওয়া যাবে না। তোদের জামা দুটো খুলে তাই দিয়ে বেঁধে দে। হাত দুটো পেছনে নিয়ে গিয়ে বাঁধলে আর খুলতে পারবে না। এখানে দেখছি সামনে একটা দেওয়াল। আর পথ নেই।"

টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে তিনি সেই দেওয়ালের গায়ে একটা চৌকো গর্ত দেখতে পেলেন। তার মধ্যে ঢুকে গেল ত্রিশূলটা। কাকাবাবু ত্রিশূলটা ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাতেই দেওয়ালটাও ঘুরতে লাগল একটু একটু করে, সেই সঙ্গে সুড়ঙ্গের ওপর দিকে বিরাট জোরে শব্দ হতে লাগল। ওপর থেকে যে একটু-একটু আলো আসছিল, তা মুছে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "আশ্চর্য ব্যাপার। আগেকার দিনের লোকদেরও কতখানি ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান ছিল দ্যাখ। এই দেওয়ালটা সরে যেতেই ওপরের সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ হয়ে গেল।"

ওপরের আওয়াজটা এত জোর যে বুক কেঁপে উঠেছিল সন্তু আর জোজোর!

বিরজু সিং-এর রিভলভারটা হাতে তুলে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এটা তো মনে হচ্ছে আমারই। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি। মোহন সিং আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। সন্তু, তুই যেমন বিরজু সিং-এর মাথা ফাটালি, সেইরকম জগ্‌গু বলে একটা লোক আজ দুপুরে আমার মাথা ফাটিয়েছে। এখনও মাথাটা টনটন করছে।"

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "ওফ্ এতক্ষণে মুক্তি পাওয়া গেল। আজ সারাদিন বড্ড জ্বালিয়েছে ওরা। এবার আর ওপরের শিবলিঙ্গটা ওরা সরাতে পারবে না। ওটা ভাঙতেও পারবে না। কোনও কুলি-মজুরও শিবলিঙ্গ ভাঙতে রাজি হবে না। এখন হিরেটা খুঁজে পাই বা না পাই, তাতে কিছু আসে যায় না, কি বল!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, একখানা হিরের জন্য এরা এত কাণ্ড করছে কেন? এই হিরেটা কী-এমন দামি?"

কাকাবাবু বললেন, "ও, তোরা তো সব ব্যাপারটা জানিস না। আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। বিজয়নগর আর বাহমনি রাজ্যের কথা তো ইতিহাসে কিছুটা পড়েছিস। এই দুই রাজ্যে দারুণ শত্রুতা ছিল। প্রায় দুশো-আড়াইশো বছর ধরে ওদের মধ্যে লড়াই হয়েছে। কখনও বিজয়নগর জিতেছে, কখনও বাহমনি জিতেছে। তারপর হল কী এমন সময় বাহমনি রাজ্য ভেঙে পাঁচ টুকরো হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই টুকরো-টুকরো হয়ে ওরা দুর্বল হয়ে পড়ল, আর বিজয়নগর হয়ে উঠল খুব

শাক্তিশালী! বিজয়নগরের রাজা তখন সদাশিব, তিনি ছিলেন অপদার্থ, আসল ক্ষমতা ছিল রাজারই এক আত্মীয়, রাম রায়ের হাতে। এই রাম রায় ছিলেন দারুণ বীরপুরুষ, তিনি অনেকগুলো যুদ্ধ জয় করে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ওদিকে বাহমনির সুলতানরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে মরছে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "তা হলে বিজয়নগর ধ্বংস হল কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হল কী, কয়েকটা যুদ্ধ জয় করার পর ওই রাম রায়ের দারুণ অহঙ্কার হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন, বিজয়নগরের সৈন্যদের আর কেউ হারাতে পারবে না। তিনি সুলতানদের খুব অপমান করতে লাগলেন। তখন মরিয়া হয়ে সেই পাঁচজন সুলতান আবার জোট বাঁধল, তারা একসঙ্গে লড়াই করবে ঠিক করল। তাদের নেতা আলি আদিল শাহ। সেই পাঁচটি রাজ্যের ফৌজ একসঙ্গে আক্রমণ করতে এল বিজয়নগর রাজ্য। সেখানকার রাজা তো কোনও খবরই রাখতেন না। রাম রায় অহঙ্কার নিয়ে মত্ত ছিলেন। তিনি ভাবতেন, বাহমনির সুলতানরা এই রাজ্য আক্রমণ করতে সাহসই পাবে না. একদিন দুপুরে তিনি খেতে বসেছেন, এইসময় খবর পেলেন, শত্রুপক্ষ তাঁদের রাজ্যের অনেকখানি ভেতরে ঢুকে পড়েছে। খাওয়া ছেড়ে তক্ষুণি উঠে রাম রায় গেলেন যুদ্ধ করতে। তখন তাঁর বয়েস নব্বই-একানব্বই হবে! তবু সাহস ছিল খুব। বুড়ো প্রোফেসর ভগবতী প্রসাদ শর্মা এই জন্যই রাম রায়ের পার্ট করতে চেয়েছিলেন, তাঁর বয়েসের সঙ্গে মানিয়ে যেত। যাই হোক, রাম রায় তো যুদ্ধ করতে গেলে, সৈন্যদের বললেন, "আলি আদিল আর অন্যান্য সুলতানদের প্রাণে মারবে না। জ্যান্ত ধরে আনবে, আমি তাঁদের খাঁচায় পুরে পুষব।' কিন্তু ঘটনা ঘটল ঠিক উলটো। রাম রায় যুদ্ধে যেতে-না যেতেই শত্রুপক্ষের একটা হাতি পাগলা হয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল এদিকে। সেই পাগলা হাতির তাণ্ডবে কাছাকাছির সৈন্যরা ভয়ে দৌড়তে লাগল। রাম রায় একটা চতুর্দোলা চেপে ছিলেন, সেটা থেকে তিনি পড়ে গেলেন। অমনি শত্রুপক্ষের কিছু সৈন্য তাঁকে দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে গেল সুলতানের কাছে। সুলতান একটুও দেরি না করে রাম রায়ের মুণ্ডুটা কেটে ফেলে একটা লম্বা বর্শার ফলকে গেঁথে উঁচু করে দেখাতে লাগলেন বিজয়নগরের সৈন্যদের। রাম রায়ের কাটা মুণ্ডু দেখেই বিজয়নগরের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনী ছিল বিশাল, ঠিকঠাক লড়াই হলে তারা জিততেও পারত, কিন্তু একজন ভাল সেনাপতির অভাবে তারা গো-হারান হেরে গেল, যে যেদিকে পারল পালাল। যুদ্ধে জয়ী হবার পর আলি আদিল ঠিক করলেন, বিজয়নগরের রাজধানীটাকেই একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবেন। যাতে এ-রাজ্য আর কোনওদিন উঠে দাঁড়াতে না পারে। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই বিজয়নগর একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল।"

সন্তু বলল, "পুরো শহরটাকেই ধ্বংস করে দিল?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, মন্দির-টন্দির সব। হাজার হাজার লোককে মেরে ফ্যালে। দুটো-একটা মন্দির শুধু টিকে গেছে। আর রাজপ্রাসাদের খানিকটা অংশ। মোটকথা বিজয়নগর চিরকালের মতন ধ্বংস হয়ে গেল, তারপর আর এখানে মানুষ থাকেনি, চারশো বছর ধরে এইরকম ধ্বংসস্তূপ হয়েই পড়ে আছে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তা হলে সেই হিরেটা?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এবার হিরের কথাটা বলছি। তখন ইওরোপিয়ান বণিকরা এদেশে আসতে সুরু করেছে। বিজয়নগরের জাঁকজমক দেখে তারা অবাক হয়ে যেত। ধন-দৌলত, মণি-মাণিক্যের শেষ ছিল না। কেউ-কেউ বলেছে, বিজয়নগর রোমের চেয়েও বড় শহর ছিল। পর্তুগিজ, ইতালিয়ান পর্যটকরা বিজয়নগরের কথা লিখে গেছেন। এখানে তখন অনেক হিরে পাওয়া যেত। গোলকুণ্ডার হিরের খনিও ছিল বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যেই। তার মধ্যে কয়েকজন্ পর্যটক একটা হিরের কথা লিখেছে। যেটা প্রায় অবিশ্বাস্য। সেই হিরেটা নাকি একটা মুরগির ডিমের সমান। পৃথিবীতে এতবড় হিরে আজও কেউ দ্যাখেনি। সেই হিরেটা গেল কোথায়?"

সন্তু বলল, "সুলতানের সৈন্যরা যখন বিজয়নগর ধ্বংস করে তখন নিশ্চয়ই লুটপাটও করেছিল। তারা সেই হিরেটা পায়নি!"

কাকাবাবু বললেন, "লুটপাট তো করবেই। গোরুর গাড়ি ভর্তি করে সোনাদানা আর হিরে-জহরত নিয়ে গেছে। রাম রায় মারা যাবার পর রাজা সদাশিবও তাড়াতাড়িতে যা পেরেছেন সোনাদানা নিয়ে পালিয়েছিলেন। কিন্তু মুরগির ডিমের মতন হিরেটা তাঁর কাছে ছিল না। অনেকে বলে যে, বিজয়ী বীর হিসেবে আলি আদিল শাহ সেই হিরেটা পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটাও বোধহয় সত্যি না। তারপর সেটা গেল কার কাছে? অতবড় হিরেটা তো হারিয়ে যেতে পারে না? মোগল সম্রাট শাজাহানের কাছে যে কোহিনূর ছিল, সেটা নানান হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং-এর নাবালক ছেলের কাছ থেকে ইংরেজরা নিয়ে নেয়। সেটা এখনও ইংল্যান্ডের রানির সম্পত্তি। আর কোহিনূরের চেয়েও বড় একটা হিরে সম্পর্কে সারা পৃথিবীর মানুষের কৌতূহল তো থাকবেই?"

জোজো বলল, "হিরেটা তা হলে এখানেই আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "বহু লোক এখানে এসে বিজয়নগরের বিখ্যাত হিরেটা খোঁজাখুঁজি করেছে। আমিও একবার এসে খুঁজে গেছি। কেউ কোনও সন্ধান পায়নি। কিন্তু হিরে তো কখনও ভাঙে না, বা নষ্ট হয় না, তা হলে সেটা অদৃশ্য হয়ে যাবে কী করে! অনেকের ধারণা হয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই কোনও রাজা-বাদশার হাত থেকে নদীতে বা সমুদ্রে পড়ে গেছে। এ ছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু প্রোফেসর ভগবতীপ্রসাদ শর্মা ওই হিরেটার সন্ধানে বহু বছর ধরে লেগেছিলেন, তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, হিরেটা এখানেই আছে। হঠাৎ কিছুদিন আগে তিনি একটা

পুঁথির খোঁজ পান। সেই পুঁথিতে লেখা আছে যে, রাম রায় সেই হিরেটা বিঠলস্বামীর মন্দিরে দান করেছিলেন। অত দামি জিনিস বাইরে রাখা হত না। এই মন্দিরেরই কাছাকাছি কোনও গুপ্ত জায়গায় সাবধানে রাখা থাকত।"

সন্তু বলল, "পুঁথি মানে কী জানিস তো জোজো? পুরনো আমলের হাতে-লেখা বই। পুঁথির মালার পুঁথি নয়।"

জোজো বলল, "জানি, জানি। এ তো সবাই জানে!"

সন্তু বলল, সুলতানরা এই মন্দিরটা কেন ভাঙল না? এখানে কেন লুটপাট করেনি? আপনি কী যেন বাজনার কথা বললেন তখন!"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাও একটা গল্পের মতন। সুলতানদের বাহিনী যখন বিজয়নগর ধ্বংস করার জন্য কামান দাগতে এগোচ্ছে, তখন কামানের আওয়াজ এক-একবার থামতেই তারা সুন্দর টুংটাং, ঝুনঝুন শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। ঠিক যেন কোনও মিষ্টি বাজনার মতন। তারা তো দারুণ অবাক। এইরকম সাঙ্ঘাতিক যুদ্ধের মধ্যেও কে বাজনা বাজাবে? আরও একটু এগিয়ে এসে দেখল, এই মন্দিরের বারান্দায় পাকা চুল-দাড়ি আর ধপধপে সাদা কাপড় পরা একজন পুরোহিত একা দাঁড়িয়ে আছে, আর এই মন্দিরের থাম থেকে আপনা-আপনি বাজনার শব্দ হচ্ছে। তখন সৈন্যরা ভাবল, এটা কোনও অলৌকিক ব্যাপার। তারা ভয়ে আর এই মন্দিরের কাছ ঘেঁষল না। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, এই মন্দিরের থামগুলো বিশেষ কায়দায় তৈরি। কিছু দিয়ে আস্তে টোকা মারলেই সুন্দর গানের সুরের মতন শব্দ হয়। সেদিন কামানের প্রচণ্ড গর্জনে যে ভাইব্রেশান হচ্ছিল, তাতেই মন্দিরের থাম থেকে আপনা-আপনি সুর বেরোচ্ছিল। সেই সুর শুনে সৈন্যরা ভয় পেয়ে পালাল বলেই মন্দিরটা বেঁচে গেল। এখনও এই মন্দিরের থামে টোকা দিলে সেই সুর শোনা যায়। রঞ্জনকেও ওই বাজনা শোনাব বলেছিলাম। ও হ্যাঁ, রঞ্জনেরা কোথায় গেল? রঞ্জন-রিঙ্কুকে দেখিসনি?"

সন্তু বলল, "না। জোজো আর আমি আগেই অজ্ঞান হয়ে গেলুম ওই শরবত খেয়ে!"

জোজো বলল, "রঞ্জনদা দেড়-গেলাস খেয়েছিল। হয়তো রঞ্জনদার এখনও জ্ঞান ফেরেনি।"

সন্তু বলল, "আমাদের চেয়ে রঞ্জনদার চেহারা অনেক বড়। তাড়াতাড়ি হজম করে ফেলতে পারে। কিন্তু আমাদের দু'জনকে যেখানে ওরা ফেলে এসেছিল, সেখানে রঞ্জনদা-রিঙ্কুদি বোধহয় ছিল না।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোদের কোথায় ফেলে দিয়ে এসেছিল?"

জোজো বলল, "অনেক দূরে একটা পাহাড়ের ওপর জঙ্গলের মধ্যে। আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল। যেভাবে আমরা ফিরে এসেছি, তা আপনি শুনলে..."

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা, সে-ঘটনা পরে শুনব। রঞ্জন-রিঙ্কুর জন্য চিন্তা হচ্ছে খুব। কিন্তু এখন কিছু উপায়ও তো নেই। এখান থেকে বেরিয়ে ওদের খোঁজ করতে হবে।"

জোজো বলল, "এখান থেকে আমরা কী করে বেরোব? ওপরে উঠলেই তো ওরা ধরবে!"

কাকাবাবু বললেন, "না, ওপরে আর ওঠা যাবে না! সাধারণত এই ধরনের সুড়ঙ্গের দুটো মুখ থাকার কথা। শেষ পর্যন্ত গিয়ে তো দেখা যাক। চল, অনেকক্ষণ বিশ্রাম আর গল্প হয়েছে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "এই বিরজু সিং এখানে পড়ে থাকবে?"

সন্তু বলল, "তা না তো কি ওকে টেনে-টেনে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব নাকি!"

জোজো বলল, "আমি ওর চুল ধরে নিয়ে যেতে পারি। ও আমার চুলের মুঠি ধরে অনেক ঝাঁকিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ও এখানেই থাক। পরে ওকে ছেড়ে দেবার একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।"

খানিকটা এগোতেই সামনে আবার খানিকটা জল দেখা গেল। তার মানে এইখানটা ঢালু। ওরা জলে পা দিতেই একটু দূরে, কী যেন খলবল করে উঠল জলের মধ্যে। তিনজনেই চমকে পিছিয়ে গেল খানিকটা।

জোজো ভয় পেয়ে বলল, "সাপ! মাটির তলায় সাপ থাকে?"

কাকাবাবু টর্চের আলো ফেলে ভাল করে দেখতে লাগলেন। আর একবার খলবল করে শব্দ হতেই তিনি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "সাপ নয়, মাছ!"

সন্তু বললেন, "মাটির তলায় সাপ যদিও বা থাকতে পারে, মাছ আসবে কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "যাত্রাপথে মাছ দেখা শুভলক্ষণ।"

সন্তু বলল, "এতক্ষণে আর-একটা জিনিস বুঝতে পারলুম। আমরা যে পচা গন্ধটা পাচ্ছিলুম, সেটা আসলে মাছ পচা গন্ধ। এই জলে মাছ থাকলে তা তো খাবার কেউ নেই। একসময় কিছু-কিছু মাছ মরে পচেও যায় নিশ্চয়ই!"

কাকাবাবু বললেন, "এটা ঠিকই বলেছিস। মাছ পচা গন্ধই বটে!"

জোজো হঠাৎ ভয় পেয়ে কাকাবাবুকে চেপে ধরল, কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "কাকাবাবু ওটা কী? ওখানে কে বসে আছে?"

দৃশ্যটা দেখে ভয় পাবারই কথা। জলটা যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক তার পাশেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসানো আছে একটি মানুষের কঙ্কাল। শুধু হাড়গুলোই দেখা যাচ্ছে টর্চের আলোয়, কিন্তু তার বসে থাকার ভঙ্গিটার জন্যই মনে হচ্ছে যেন

জীবন্ত। যেন কঙ্কালটা মাথা নিচু করে কিছু একটা চিন্তা করছে, এক্ষুনি মুখ তুলে চাইবে!

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো চারশো বছর আগে লোকটা ওই গুপ্ত সুড়ঙ্গের প্রহরী ছিল। কোনও একদিন সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে, আর খোলেনি, ওর চিৎকারও কেউ শুনতে পায়নি।"

সন্তু বলল, "কিন্তু বসে-বসে কি কেউ মরে? মরার সময় তো শুয়েই পড়ে সবাই।"

কাকাবাবু বললেন, "শুয়ে-শুয়ে মরার পরও অনেক সময় মৃতদেহটা আস্তে-আস্তে উঠে বসে। এরকম আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

জোজো বলল, "ওইটার পাশ দিয়ে আমাদের যেতে হবে?"

সন্তু বলল, "ভয়ের কী আছে? কঙ্কাল মানে তো ভূত নয়। এই দ্যাখ, আমি যাচ্ছি!"

সন্তু আগে চলে গেল, জোজো কাকাবাবুকে ধরে রইল। কঙ্কালটার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে চোখ বুজে ফেলল।

বেশ জোরে-জোরেই সে বলল, "হে ভগবান, এখান থেকে কী করে বেরোব?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এ-লোকটা প্রহরীই ছিল, ওর পাশে একটা মরচে-ধরা তলোয়ার পড়ে আছে। এখানে প্রহরী বসিয়ে রাখত, তার মানে কাছাকাছি রত্ন ভাণ্ডার থাকার কথা!"

জোজো বলল, "আমাদের অবস্থাও বোধহয় ওই লোকটার মতনই হবে। সুড়ঙ্গের ওপরটা যদি আর না খোলে!"

কাকাবাবু বললেন, "অত ঘাবড়াসনি রে জোজো, তাতে কোনও লাভ হবে না। আগে শেষ পর্যন্ত দেখে নি।"

একটু পরেই আবার একটা ঢালু জায়গা, সেখানেও জল জমে আছে। সন্তু ছপছপ করে আগে এগিয়ে গেল। জোজো এখনও কাকাবাবুর হাত ছাড়েনি। একটু অসাবধান হতেই কাকাবাবুর হাত থেকে টর্চটা জলে পড়ে গেল। কাকাবাবু হাত ডুবিয়ে টর্চটা খুঁজতে লাগলেন, তাঁর হাতের ওপর দিয়ে দু-একটা মাছ চলে গেল।

সুড়ঙ্গটা অন্ধকার হয়ে গেছে, তারই মধ্যে সামনে একটা হুড়মুড় শব্দ হল। তারপরই সন্তু চেঁচিয়ে উঠলেন, "কাকাবাবু! আমায় ধরেছে!"

কোনওরকমে টর্চটা তুলে সেদিকে আলো ফেলতেই কাকাবাবু দেখতে পেলেন দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। নীল আগুনের টুকরোর মতন।

চোখ দুটো দেখেই কাকাবাবু চিনতে পেরেছেন। কিন্তু এই প্রথম ঘাবড়ে গেলেন তিনি। টর্চের আলো তাঁর হাতে কেঁপে যাচ্ছে। দরদর করে ঘাম বেরোতে লাগল শরীর দিয়ে।

জোজো বলল, "ওরে বাবা, ফোঁসফোঁস শব্দ হচ্ছে!"

কাকাবাবু বললেন, "জোজো, ভয় পাসনি, তুই টর্চটা ধর। ওই চোখ দুটোর ওপর থেকে আলো সরাবি না। সন্তু, নড়াচড়া করিস না। এতবড় সাপের বিষ থাকে না। তুই শুধু নিজের চোখ দুটো ঢেকে থাক। চোখে যেন না কামড়ায়। গুলি করতে পারছি না। তোর গায়ে লাগবে।"

কাকাবাবু পিছিয়ে গিয়ে সেই কঙ্কালটার পাশ থেকে মরচে-পড়া তলোয়ারটা তুলে নিয়ে এলেন। ফিরে এসে সন্তুর খুব কাছে এগিয়ে গেলেন। সন্তু আঃ-আঃ করে কাতরাচ্ছে। জোজোর হাতেও টর্চটা কাঁপছে।

কাকাবাবু তলোয়ারের ডগাটা দিয়ে সাপটাকে চেপে একটা খোঁচা মারবার চেষ্টা করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে রেগে খুব জোরে ফোঁস করে সাপটা অনেকটা মুখ বাড়িয়ে কামড়াতে এল কাকাবাবুকে। কাকাবাবু বিদ্যুৎবেগে সাপটার গলায় একটা কোপ বসালেন। মরচে পড়া তলোয়ারে সাপটার গলা মোটেই কাটল না, কিন্তু কাকাবাবু তলোয়ার দিয়ে সাপটার মাথা ঠেসে ধরলেন জলের মধ্যে।

সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "কাকাবাবু, ও আমার পা'টা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে!"

কাকাবাবু বললেন, লেজের দিকটা চেপে ধরে খোলবার চেষ্টা কর।"

প্রাণপণ শক্তিতে ডান হাতের তলোয়ার দিয়ে জলের মধ্যে সাপটার গলা চেপে রেখে কাকাবাবু বাঁ হাত দিয়ে রিভলবারটা বার করলেন। তারপর খুব সাবধানে টিপ করে জলের মধ্যেই গুলি চালালেন দু'বার।

তারপর দারুণ পরিশ্রান্তভাবে কাকাবাবু বললেন, "সন্তু-জোজো, সাবধান। এরকম সাপ সাধারণত একজোড়া থাকে। আর-একটা আছে বোধহয়। তোরা খুঁজে দ্যাখ। আমি বসে একটু রেস্ট নিই।"

সাপটা ময়াল জাতের। সন্তুর পা পড়ে গিয়েছিল ওর গায়ে, সঙ্গে-সঙ্গে ও সন্তুর ডান পায়ে সাতটা পাক দিয়েছিল। আর একটুক্ষণ বেঁচে থাকলেই সাপটা সন্তুর পায়ের হাড় মুড়মুড়িয়ে ভেঙে দিত।

একটু সুস্থ হবার পর জোজোর কাছ থেকে টর্চটা নিয়ে সন্তু সুড়ঙ্গের সামনের দিকটা দু'দিকের দেওয়ালের গা ভাল করে দেখতে লাগল। দ্বিতীয় সাপটার কোনও চিহ্ন নেই।

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে বললেন, "এখানে মাছগুলো ওই সাপের খাদ্য।"

সন্তু সে-কথা শুনতে পেল না। সুড়ঙ্গের একদিকের দেওয়ালে কুলুঙ্গির মতন একটা জায়গায় কাটা। সেখানে আলো ফেলতেই কী-যেন ঝকঝক করে উঠছে। সে বারবার সেখানে আলো ফেলছে। ওখানেই কি দ্বিতীয় সাপটা আছে, তার চোখ ঝকঝক করছে?

কাকাবাবুও সেই আলোর ঝিলিক দেখতে পেলেন একবার। সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে এসে তিনি চিৎকার করে বললেন, "বিজয়নগরের হিরে!"

কুলুঙ্গিতে ভেতরের দৃশ্যটা অদ্ভুত!

সামনেটা মাকড়সার জাল দিয়ে প্রায় ঢাকা। সেই জাল ছিঁড়তেই দেখা গেল, সেখানেও বসানো রয়েছে একটা বাচ্চা ছেলের কঙ্কাল। মাত্র তিন-চার বছরের শিশুর কঙ্কাল বলে মনে হয়। সেই কঙ্কালটার সামনে অনেকরকম লাল-সবুজ-নীল পাথরের টুকরো ছড়ানো। কঙ্কালটার ঠিক কোলের কাছে রয়েছে, অবিকল মুরগির ডিমের মতনই একটা পাথর, আলো পড়লেই তা থেকে চোখ ধাঁধানো দীপ্তি বেরিয়ে আসছে।

কাকাবাবু খুব সাবধানে সেই পাথরটা বার করে এনে বললেন, "তা হলে সত্যি আছে। বিজয়নগরের হিরে। প্রোফেসর শর্মা এখানে থাকলে কত খুশি হতেন। এটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমরা প্রোফেসর শর্মাকেই দেব, কী বলিস, সন্তু?"

সন্তু বলল, "আমি একবার হাতে নিয়ে দেখব?"

জোজো আর সন্তু দু'জনেই হিরেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। হাতে নিলে খুব একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু বলে মনে হয় না। এর যে এত দাম বোঝাও শক্ত।

কাকাবাবু বললেন, "অনেক কালের ধুলো জমেছে। পালিশ করাতে হবে। নতুন করে কাটাতেও হবে। ঠিক মতন কাটার ওপরেই হিরের সৌন্দর্য ঠিকমতন খোলে। অন্য পাথরগুলোও খুব দামি হবে নিশ্চয়ই, ওগুলোও পকেটে ভরে নে। এবার শিগগির বেরিয়ে পড়তে হবে।"

জোজো রঙিন পাথরগুলো পকেটে ভরতে ভরতে বলল, "কোনদিক দিয়ে বেরোব?"

কাকাবাবু বললেন, সাপটাকে দেখে একটা জিনিস বোঝা গেল। মাছ দেখেও আমার সেই কথাই মনে হয়েছিল আগে। এখানে বাইরে থেকে জল ঢুকে পড়ে। খুব সম্ভবত কাছাকাছি একটা নদী আছে। জলের সঙ্গে মাছও আসে, তারপর ঢালু জায়গাতে আটকে যায়। সেই মাছ খেতে সাপ আসে। সুতরাং নদীর দিকে একটা বেরোবার রাস্তা আছেই।"

এরপর আরও দু'জায়গায় ঢালু জলাশয় পড়ল। প্রত্যেকটাতেই দ্বিতীয় সাপটা আছে কি না ভাল করে দেখে নিয়ে তারপর ওরা নামল। এদিকের মাছগুলো ছোট-ছোট মৌরলা মাছের মতন, জলও অনেক পরিষ্কার। পাথরের দেওয়াল পড়ল আর একটা। সেটা খুলতে হল ত্রিশূল দিয়ে।

সুড়ঙ্গটা একটা বাঁক নিতেই দেখা গেল একটা লোহার দরজা। কিন্তু তার একটা দিক কিছুটা ভাঙা। সেখান দিয়ে এখনও জল ঢুকছে একটু-একটু।

কাকাবাবু বলেছিলেন না, এইসব সুড়ঙ্গে রাজারা সবসময় একটা বেরোবার রাস্তা রাখত। বহুকালের পুরনো দরজা, জল লেগে মরচে পড়ে খানিকটা ভেঙে গেছে।

দরজাটার ভেতরের দিকে হুড়কো লাগানো। সেটা ধরে খানিকক্ষণ টানাটানি করতে খুলে গেল। দরজাটা ফাঁক করতেই দেখা গেল একটু নিচে একটা নদী।

বাইরে এসে বড়-বড় নিশ্বাস নিয়ে কাকাবাবু বললেন, "আঃ কী আরাম। ভেতরে যেন দম আটকে আসছিল শেষ দিকে।"

সন্তু বলল, "সত্যি বেঁচে গেলুম! অ্যাঁ? এই সন্তু!"

বাইরের জায়গাটা উঁচু টিবির মতো। চতুর্দিকে ঝোপঝাড় হয়ে আছে। সেইজন্যই লোহার দরজাটা দেখা যায় না। অবশ্য ভেতরেও সুড়ঙ্গের মাঝখানে নিরেট পাথরের দেওয়াল আছে। ত্রিশূলের চাবি ছাড়া যা খোলা যায় না। সেই পাথরের দেওয়ালের তলা দিয়ে জলের সঙ্গে সাপ বা মাছ যেতে পারে। মানুষের গলে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের চেষ্টা করতে হবে নদীটা পার হয়ে যেতে। তারপর হসপেটে গিয়ে বাঙ্গালোরে ফোন করে সব জানাব। হসপেট থানা থেকে পুলিশ এনে ধরতে হবে মোহন সিং-এর দলটাকে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, ওই দেখুন, খানিকটা দূরে একটা গোল নৌকো দেখা যাচ্ছে। ওটা বোধহয় খেয়াঘাট। ওখান দিয়ে নদী পার হওয়া যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "চল তা হলে, ওইদিকেই যাই। এখন বিশ্রাম নিলে চলবে না। নদীটা পার হওয়া আগে দরকার।"

পুব আকাশে লাল রঙের সূর্য উঠছে। আশ্চর্য ব্যাপার, ভোরের সূর্যের রং টুকটুকে লাল হলেও ভোরের আলোর রং নীলচে। শোনা যাচ্ছে পাখির কিচিরমিচির।

কাকাবাবু এক জায়গায় থমকে গিয়ে বললেন, "দিনের আলোয় একবার হিরেটা দেখি। এটা তো গভর্নমেন্টকে দিয়ে দিতেই হবে, তার আগে একবার ভাল করে দেখে নি।"

কাকাবাবু সূর্যের দিকে মুখ করে দু'হাত ঘুরিয়ে হিরেটা দেখছেন আচমকা টিবির ওপর থেকে একটা লোক লাফিয়ে পড়ল তাঁর সামনে। লোকটার হাতে একটা রাইফেল! তারপরই নেমে এল একটি মেয়ে। কস্তুরী আর জগ্‌গু!

কস্তুরী বলল, "রায়চৌধুরীবাবু, আপনি খুব ধোঁকাবাজ তাই না? আমাকে ফাঁকি দেবেন! আপনি কস্তুরীকে চেনেননি ভাল করে। দু'ঘন্টা ধরে বসে আছি এখানে। আপনাদের জন্য। দিন, আমায় হিরেটা দিন!"

কাকাবাবু জগ্‌গুর দিকে তাকালেন। জগ্‌গুর মুখখানা বুলডগের মতন, চোখদুটো স্থির। রাইফেলের ট্রিগারে তার হাত। কস্তুরীর হুকুম পেলেই সে যে গুলি চালাবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কস্তুরী বলল, "দিন, দিন, হিরেটা দিন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী করে এখানে এলে? কী করে বুঝলে যে..."

কস্তুরী বলল, "অত কথা বলার সময় নেই। আমি তিন গুনব, তার মধ্যে হিরেটা দিন আমার হাতে, নইলে এই জগ্‌গু...এক, দুই..."

কাকাবাবু হিরেটা কস্তুরীর হাতে তুলে দিলেন।

কস্তুরী হিরেটাতে চুমু খেতে-খেতে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "পেয়েছি-পেয়েছি, শেষ পর্যন্ত পেয়েছি, সব কষ্ট সার্থক। বুঝলেন, বাঙালিবাবু, আমি বিঠলস্বামীর মন্দিরের পুরুতকে জেরা করে জেনেছি, এদিকে নদী আছে কি না। পুরুত এই সুড়ঙ্গের কথাও তার বাবার মুখে শুনেছে, কিন্তু কোনওদিন খুলতে দ্যাখেনি। আমি ঠিক বুঝতে পেরে চলে এসেছি নদীর ধারে। সুড়ঙ্গের একটা মুখ এদিকে থাকবেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বুদ্ধি আছে, তা স্বীকার করতেই হবে।"

কস্তুরী বলল, "হিরে পেয়ে গেছি, এবার আমিও আমার কথা রাখব। আপনাদের প্রাণে মারব না। আপনারা আর আমাকে ফলো করবার চেষ্টা করবেন না। আমি নদী পেরিয়ে হসপেট স্টেশনে চলে যাব। তারপর সোজা বোম্বাই। চল, জগ্‌গু!"

জগ্‌গু কর্কশ গলায় বলল, "ঠারো! ত্রিশূল লেও, পিস্তল লেও!"

কস্তুরী বলল, "ঠিক, ঠিক তো। জগ্‌গুর সব মনে থাকে। ত্রিশূল আর রিভলবার দিয়ে দিলেই আর কোনও ঝঞ্ঝাট থাকবে না! দিন!"

জগ্‌গু রাইফেলের নলটা নিচু করতেই সন্তু ত্রিশূলটা দিয়ে দিল কস্তুরীর হাতে। কাকাবাবুও পকেট থেকে বার করে রিভলবারটা দিতে বাধ্য হলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে পিছন ফিরে কস্তুরী দৌড় মারল। জগ্‌গু যেতে লাগল আস্তে-আস্তে, চারদিক দেখেশুনে।

ওরা একটু দূরে চলে যাবার পর কাকাবাবু বললেন, "এবার ওই জগ্‌গু যদি কস্তুরীকে মেরে হিরেটা নিয়ে নেয়, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। হিরে অতি সাঙ্ঘাতিক জিনিস। একটা হিরের জন্য কত মানুষ খুন হয়। তার ঠিক নেই।"

সন্তু বলল, "তা বলে ওই লোকটা হিরেটা নিয়ে নেবে!"

জোজো বলল, "ইশ, যদি আর খানিকটা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো থাকত, তা হলে ওই জগ্‌গু ব্যাটাকে..."

কাকাবাবু বললেন, "হসপেট থেকে বম্বে যেতে গেলে ট্রেনে কিংবা গাড়িতে ছাড়া যেতে পারবে না। তারমধ্যেই থানায় পৌঁছে ওদের ধরার ব্যবস্থা করতে হবে।"

গোল নৌকোটার কাছে গিয়ে আগে কস্তুরী তাতে উঠে বসে বৈঠা হাতে নিল। এরপর জগ্‌গু উঠে রাইফেলটা উঁচিয়ে এদিকে চেয়ে রইল।

নৌকোটা ছাড়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কোথা থেকে যেন একটা বিরাট পাথরের চাঁই এসে পড়ল নৌকোটার ঠিক পাশ ঘেঁষে জলের মধ্যে। অমনি জগ্‌গু এদিকে গুলি চালাল একবার।

কাকাবাবু বললেন, শুয়ে পড়, শুয়ে পড়! আমরা কিছু করিনি, তবুও আমাদের মারতে চাইছে। আমরা এতদূর থেকে অতবড় পাথর ছুঁড়ব কী করে?"

জোজো শুয়ে পড়ে ফিসফিস করে বলল, "কে পাথর ছুঁড়ল? মোহন সিং?"

ঢিবির ওপর থেকে আবার একটা পেল্লায় পাথর এসে পড়ল গোল নৌকোর ওপরে। আর-একটা জগ্‌গুর মাথায়। এর মধ্যে নৌকোটাও উলটে গেছে, কস্তুরী আর জগ্‌গু পড়ে গেছে জলে।

কাকাবাবু বললেন, "কী ব্যাপার হল কিছু বুঝতে পারছি না। কেউ কোনও শব্দ করিস না। চুপচাপ শুয়ে থাক। দেখা যাক, এরপর কে আসে।"

এবার শোনা গেল একটা উঁচু গলায় গান! একজন কেউ গাইছে, "হোয়েং গেল! হোয়েং গেল!"

খানিকদূরে ঢিবির ওপর থেকে গড়িয়ে নেমে এল রঞ্জন আর রিঙ্কু! কস্তুরী সাঁতার জানে না। সে জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। রিঙ্কু জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে তুলল তাকে।

রঞ্জন বলল, "ও ব্যাটাকে তুলো না, ও একটু নাকানিচোবানি খাক।"

সন্তু "রঞ্জনদা" বলে চিৎকার করে ছুটে গেল ওদের দিকে!

কাকাবাবু হেসে বললেন, "রঞ্জনটা একটা খেলা দেখাল বটে। আমি তো শেষ মুহূর্তে আশাই ছেড়ে দিয়েছিলুম। চল জোজো।"

কস্তুরী মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে আর বলছে, "আমার হিরে! জলে ডুবে গেল! আমার হিরে! কী সর্বনাশ হল। কেন আমাকে জল থেকে তুললে! সব গেল। সব গেল!"

জোজো হতাশভাবে বলল, "কাকাবাবু, হিরেটা জলে ডুবে গেল! এত কাণ্ডের পরও হিরেটা রাখা গেল না!"

কাকাবাবু হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "এই নদীতে বেশি জল নেই। জেলে এনে জাল ফেলে দেখতে হবে। পাওয়া যাবে মনে হয়! পেতেই হবে!"

রঞ্জন রিঙ্কুকে জিজ্ঞেস করল, "এ-মেয়েটা এত কাঁদছে কেন? মোটে একখানা হিরে গেছে, তাতে কী হয়েছে?"

সন্তু বলল, "ও রঞ্জনদা! তুমি তো হিরেটার কথা কিছুই জানো না। এটা বিজয়নগরের হিরে, ওয়ার্লড ফেমাস, এটার জন্য আমরা কত কষ্ট করেছি..."

রঞ্জন সন্তুর কাঁধ চাপড়ে বলল, "আরে, রাখ তো হিরের কথা। হিরে মানে তো কয়লা! একটুকরো কয়লাও যা, একটা হিরেও তা।"

তারপর সে কাকাবাবুকে দেখে আনন্দে দু'হাত তুলে বিশাল শরীর নিয়ে নেচে-নেচে গাইতে লাগল। "হোয়েং গেল! সবং কিছুং ঠিকঠাকং হয়েং গেল! কাকাংবাবু, কেমং আছেন?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "আর একটু কাজ বাকি আছে। চলো, আগে

ওপারে যাওয়া যাক। আমি আর কস্তুরী আগে খেয়া নৌকোয় যাব। তোমরা জগ্গুর ওপরে নজর রাখো, ওকে ওপারে নিয়ে যাবার দরকার নেই।"

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে কস্তুরীর হাত ধরলেন। কস্তুরী জোর করে হাত ছড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, "আমি এখন যাব না!"

কাকাবাবু তার চোখের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, "এখন আমি যা বলব, তাই-ই তোমাকে শুনতে হবে। চলো, দেরি করো না!"

গোল নৌকোটায় উঠে কাকাবাবু বসে পড়লেন। তাঁর চোখের ইঙ্গিত পেয়ে রঞ্জন আর সন্তু কস্তুরীকে প্রায় চ্যাংদোলা করে তুলে দিল।

মাঝ নদীতে এসে কাকাবাবু বললেন, "কস্তুরী, এত কষ্ট করে উদ্ধার করার পরও হিরেটা হারিয়ে গেল। ছি ছি ছি, কী দুঃখের কথা!"

কস্তুরী বলল, "নৌকোটা উল্টে গেল যে হঠাৎ! হিরেটা জলে পড়ে গেল। এর চেয়ে আমার ডুবে মরা ভাল ছিল! কত টাকা খরচ করেছি! কত কষ্ট করেছি, সব গেল!"

কাকাবাবু বললেন, "নদীতে পড়লেও আবার তোলা যেতে পারে। অত নিরাশ হচ্ছো কেন? এই জায়গাতেই তো পড়েছিল, তাই না?"

কস্তুরী খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বলল, "প্রায় এই জায়গায়। নদীতে স্রোত আছে। বোধহয় দূরে সরে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "একবার ডুব দিয়ে দ্যাখো তো, পাওয়া যায় কি না!"

কস্তুরী আঁৎকে উঠে বলল, "আমি ডুব দেব? আমি সাঁতার জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "তাতে কী হয়েছে? একবার ডুব দাও, তারপর তোমাকে আমি ঠিক তুলব।"

কস্তুরী দু'হাত ছড়িয়ে বলল, "না, না, না, আমি পারব না। আমি পারব না!"

কাকাবাবু বজ্র কঠিন হাতে কস্তুরীর কাঁধ চেপে ধরে বললেন, "তোমাকে ডুব দিতেই হবে। কিংবা, হিরেটা যদি তুমি লুকিয়ে রেখে থাকো, তা হলে ভালয় ভালয় আমাকে দিয়ে দাও! ওটা সরকারের সম্পত্তি।"

কস্তুরী বলল, "আমি লুকিয়ে রাখিনি! মিঃ রায়চৌধুরী, বিলিভ মী! জলে পড়ে গেছে!"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে তোমাকে ডুব দিতেই হবে।"

ঠিক একটা পুতুলের মতন কাকাবাবু তাকে উঁচুতে তুলে জলে ফেলে দিলেন।

পাড়ে রঞ্জন, রিঙ্কু, জোজো আর সন্তু অবাক হয়ে এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রঞ্জন রিভলবারটা ঠেকিয়ে রেখেছে জগ্গুর পিঠে।

কস্তুরী জলে ডুবতে ডুবতে কোনওরকমে একবার মাথা তুলতেই কাকাবাবু তার একটা হাত ধরে বললেন, "পেলে না? আবার ডুব দেবে? না, তোমার কাছেই আছে, এখনও বলো!"

দারুণ আতঙ্কে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কস্তুরী কোনওরকমে বলল, "আমার কাছে নেই, আমার কাছে নেই! আমি শপথ করছি!"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আবার ডুব দাও!"

কাকাবাবু কস্তুরীর মাথাটা জলের মধ্যে ঠেসে ধরে রইলেন। প্রায় মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল কস্তুরী।

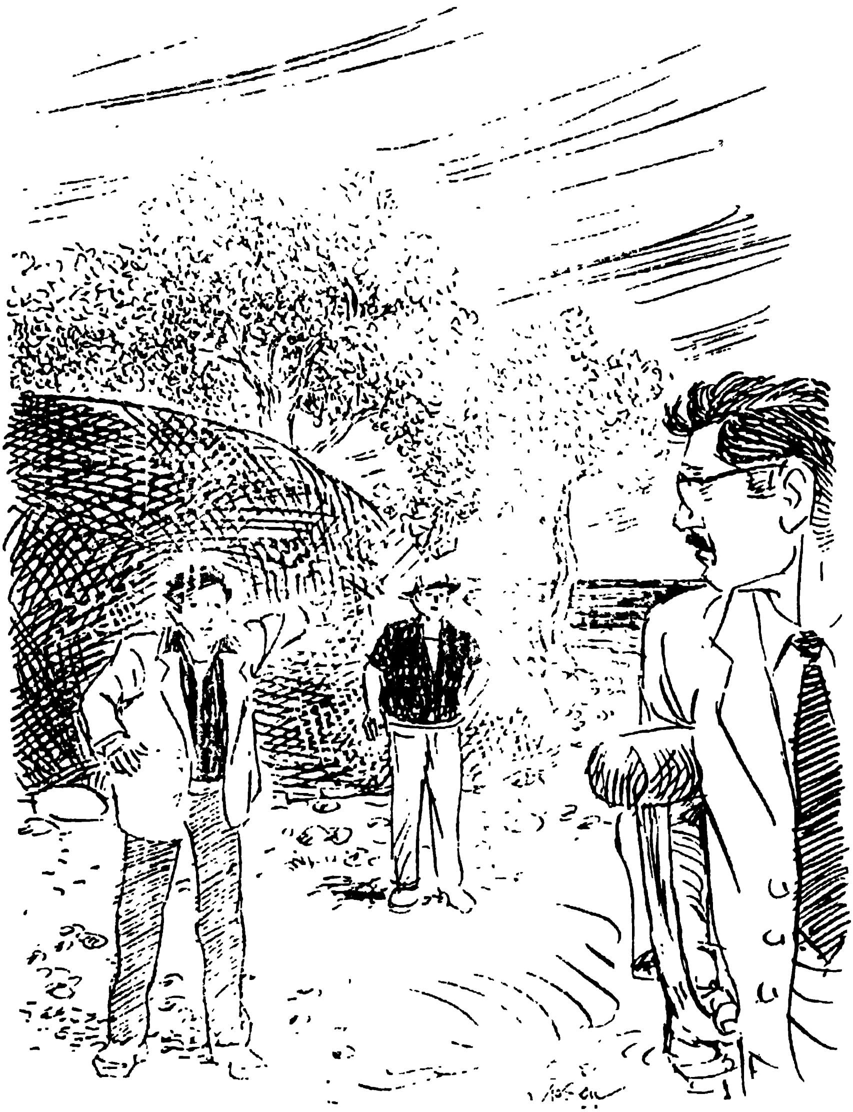
তারপর কাকাবাবু আর একবার তাকে তুলতেই সে কোনওক্রমে দম আটকানো গলায় বলল, "বাঁচান! আছে!"

কাকাবাবু এবার এক ঝটকায় কস্তুরীকে তুলে আনলেন নৌকোর ওপরে। হাসতে হাসতে বললেন, "কোনও মেয়ে অত দামি একটা হিরে চট করে জলে ফেলে দেবে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি? কোথায় লুকিয়েছ, বার করো!"

কস্তুরী হাঁপাতে হাঁপাতে দম নিতে লাগল। জ্বলন্ত চোখে চেয়ে রইল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু হাসলেন। কস্তুরী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর জামার ভেতর থেকে বার করে আনল সেই মুরগির ডিমের সমান হিরেটা।

কাকাবাবু সেটা উঁচু করে তুলে সন্তুদের দেখিয়ে বললেন, "এই দ্যাখ পাওয়া গেছে!"

রঞ্জন আবার দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে গেয়ে উঠল, "হোয়েং গেল! পাওয়াং গেল! সত্যি সত্যি বিজয়নগরের হিরে পাওয়াং গেল। হোয়েং গেল! খেল খতম!..."



সবুজ দ্বীপের রাজা

জাহাজে যেতে চাও, না এরোপ্লেনে?

কাকাবাবুর কথা শুনেই সন্তুর বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। খুব বেশি আনন্দ হলে বুকের মধ্যে এ-রকম টিপটিপ করে। ঠিক ভয়ের মতন। মনে হয়, হবে তো? শেষ পর্যন্ত হবে তো?

সবেমাত্র পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ক্লাস নাইন থেকে সন্তু এবার টেনে উঠবে। শেষ পরীক্ষার দিনই কাকাবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, সন্তু, এখন তো তোমার ছুটি থাকবে, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে এক জায়গায়?

সন্তু তো সঙ্গে সঙ্গে রাজি। কাকাবাবুর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া মানেই, তো দারুণ ব্যাপার। নতুন কোনও অ্যাডভেঞ্চার হবে নিশ্চয়ই। অন্যরা বেড়াতে গিয়ে শুধু সুন্দর-সুন্দর জিনিস দেখে। আর কাকাবাবু যান বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে।

সন্তু সঙ্গে গেলে কাকাবাবুরও অনেক সুবিধে হয়। কাকাবাবুর বয়েস তিপ্পান্ন-চুয়ান্নর মতো, যদিও দেখলে একটুও বুড়ো মনে হয় না। গায়ে বেশ জোর আছে, মুখে প্রকাণ্ড গোঁফ, কিন্তু কাকাবাবুর একটা পা চিরকালের মতন নষ্ট হয়ে গেছে। দিল্লিতে পুরাতত্ত্ব বিভাগে তিনি খুব বড় চাকরি করতেন। একবার আফগানিস্তানে পাহাড়ি রাস্তায় তাঁর জিপ গাড়িটা উল্টে খাদে পড়ে যায়। সেবার মরতে-মরতেও বেঁচে উঠলেন, তবে একটা পা আর কিছুতেই ঠিক হল না। ডান পায়ের পাতার হাড়গুলো ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। এখন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে পারেন।

সেই দুর্ঘটনার পর চাকরি ছেড়ে দিলেন কাকাবাবু, কিন্তু বাড়িতে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না একদম। আবিষ্কারের নেশা ওঁর এখনও রয়ে গেছে। ওঁর ঘরে কত যে পুরনো বই, তার ঠিক নেই। সেইসব বই পড়ে, যে-সব রহস্যের আজও সমাধান হয়নি, তিনি সেগুলোর সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে চান। কিন্তু এবারে কোথায় যাওয়া হবে, কিসের সন্ধানে, তা এখনও সন্তু জানে না। কাকাবাবুর এই এক দোষ, আগের থেকে কিছুই বলেন না। বড্ড গম্ভীর লোক।

কাকাবাবু যখন জিজ্ঞেস করলেন জাহাজে না এরোপ্লেনে যাওয়া হবে, তখন সন্তু দারুণ একটা চিন্তার মধ্যে পড়ল। সে কোনওদিন জাহাজেও চাপেনি, প্লেনেও চাপেনি। কোনটা বেশি ভাল? কিছুতেই ঠিক করতে পারে না।

জাহাজে কিংবা প্লেনে যেতে হবে যখন, তখন নিশ্চয়ই খুব দূরের কোনও দেশে যাওয়া হচ্ছে এবার। আফ্রিকা? দক্ষিণ আমেরিকা? আনন্দে সন্তুর একবার নাচতে ইচ্ছে করল। তার ইস্কুলের বন্ধুদের মধ্যে কেউ এত দূর বিদেশে যায়নি।

"কাকাবাবু, আমরা কোথায় যাব?"

"সেটা তো গেলেই দেখতে পাবে!"

সন্তু জানত, কাকাবাবু এই উত্তরই দেবেন। তবু জিজ্ঞেস না-করে থাকতে পারছিল না। এবার সে বলল, "আমরা তাহলে প্লেনেই যাব!"

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা, ঠিক আছে।"

সন্তুর জাহাজে চড়ারও খুব ইচ্ছে ছিল। তবু প্লেনের কথাই বলল। প্লেনে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। ফেরার সময় জাহাজে ফিরলেই হবে।

এর পর দু'দিন কাকাবাবু আর কিছু বললেন না। তাঁকে খুব ব্যস্ত মনে হল। সকালবেলা বেরিয়ে যান, ফেরেন অনেক রাত্রে। সন্তু বুঝতে পারল, কাকাবাবু সব ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা সেরে ফেলছেন। গভর্নমেন্টের লোকেরা কাকাবাবুকে খুব খাতির করেন।

এর মধ্যে একদিন রাস্তায় রিনির সঙ্গে সন্তুর দেখা হল। রিনি, সিদ্ধার্থদা আর স্নিগ্ধাদির সঙ্গে শিগগিরই গোয়া বেড়াতে যাচ্ছে। ওরা বোম্বে পর্যন্ত ট্রেনে যাবে, গোয়াতেও জাহাজে যাওয়া যায়? তাহলে কাকাবাবুও কি গোয়াতেই যেতে চাইছেন? গোয়াতে গেলে রিনিদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সেবার যেমন কাশ্মীরে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল।

রিনি সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "তোরা এবার কোথাও যাচ্ছিস না?"

সন্তু তো এখনও জায়গাটার নাম ঠিক মতন বলতে পারছে না, তাই বলল, "কি জানি, দেখি, ঠিক নেই এখনও!"

সেদিন রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে কাকাবাবু আবার সন্তুকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, তোমার কাছে তোমার নিজের ফটো আছে?"

মাসখানেক আগেই সিদ্ধার্থদা তাঁর নতুন ক্যামেরায় সন্তুর অনেকগুলো ছবি তুলে দিয়েছেন। সন্তু দৌড়ে গিয়ে সেই খামটা নিয়ে এল। কাকাবাবু সবকটা ছবি নেড়েচেড়ে দেখলেন। তারপর সেগুলো সরিয়ে দিয়ে বললেন, "নাঃ এগুলোতে চলবে না।"

সন্তু অবাক হয়ে গেল। ছবিগুলো খুবই সুন্দর, সবাই প্রশংসা করছেন। বাবা-মা'রও খুব ভাল লেগেছে। কাকাবাবুর পছন্দ হল না?

কাকাবাবু বললেন, "দুটো কান দেখা যায়, এমন ছবি চাই।"

সন্তু আরও অবাক। কান? লোকে মুখের ছবিই তো দেখে, কান দুটো আলাদা করে দেখে নাকি? অজান্তেই সন্তু নিজের কানে হাত দিল।

কাকাবাবু বললেন, "আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, কাল সকালেই রাসবিহারী এভিনিউতে যে জুবিলি ফটোগ্রাফার্স আছে, সেখানে গিয়ে ছবি তুলিয়ে আসবে। আর বিকেলেই সেখান থেকে তোমার ছ'খানা ছবি নিয়ে আসবে। খুব জরুরি!"

কাকাবাবু তার ছ'খানা ছবি নিয়ে কী করবে, সেকথা সন্তু আকাশ পাতাল চিন্তা করেও বুঝতে পারল না। যাই হোক, পরদিন সকালেই সে জুবিলি ফটোগ্রাফার্সে ছবি তুলিয়ে এল। বিকেলেই নিয়ে এল ছ'খানা ছবি। সবকটা ছবি একই রকম। শুধু মুখের ছবি, দুটো কানই ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে বটে!

সন্তু আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছে না। রাত্তিরবেলা মাকে সে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল, "মা, এবার কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে?"

মা বললেন, "এবার তো দার্জিলিং যাওয়া হচ্ছে!"

দার্জিলিং? দার্জিলিং তো পাহাড়ের ওপরে, সেখানে আবার জাহাজে করে যাওয়া যায় নাকি? প্লেনে করে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু কাকাবাবু তো জাহাজের কথাও জিজ্ঞেস করেছিলেন? সন্তু একটু হতাশ হয়ে গেল।

মা আবার বললেন, "দার্জিলিংয়ে তোর ছোট মামা থাকেন, ছোট মামাকে মনে আছে তো? সেই যে একবার তোকে একটা বাঁশি কিনে দিয়েছিলেন? সে আজ দার্জিলিংয়ে মস্ত বড় বাড়ি পেয়েছে অফিস থেকে, সেই বাড়িতে আমরা সবাই উঠব।"

সন্তু বলল, "তোমরাও যাচ্ছ নাকি?"

মা বললেন, "তার মানে? আমরা যাব না তো কে যাবে?"

"কাকাবাবুও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন?"

"ও সেই কথা বল্। ঠাকুরপো আমাদের সঙ্গে যাবেন কেন? উনি তো প্লেনে করে কোথায় যেন যাবেন বলছিলেন। সিঙ্গাপুর না অসম, কী যেন জায়গা। তোর বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে!"

সন্তু হাসল। মা একদম ভূগোল ভুলে গেছেন। সিঙ্গাপুর আর অসম কি কাছাকাছি জায়গা হল নাকি?

"আমিও তো কাকাবাবুর সঙ্গে যাচ্ছি!"

মা একটু রাগের সঙ্গে বললেন, "সে জানি! তুই তো আর আমাদের সঙ্গে যেতে চাস না!"

সে-কথা সত্যি। সন্তু খুব ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেত, তখন খুব ভাল লাগত। এখন আর ভাল লাগে না। এখন কাকাবাবুর সঙ্গে যাবার জন্যই তার বেশি উৎসাহ।

সোমবার দিন সকালবেলা কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, খাওয়া হয়ে গেলে তুমি জামা প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে নেবে। তুমি আজ আমার সঙ্গে বেরুবে।"

সন্তু ভাবল, সেইদিনই বুঝি বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে বলল, "বাক্স-টাক্স গুছিয়ে নেব?"

দুপুরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে কাকাবাবু সন্তুকে নিয়ে এলেন ডালহৌসিতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন একটা অফিস-বাড়ির দোতলায়। ক্রাচ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে খুব অসুবিধে হয় না কাকাবাবুর। বেশ সাধারণ লোকের মতোই টক্‌টক্ করে উঠে যান। কিন্তু পাহাড়ে উঠতে খুব কষ্ট হয়। কাশ্মীরে যেবার কনিষ্কের মুন্ডুর সন্ধানে যাওয়া হয়েছিল, সেবারে তো কাকাবাবু একবার পাহাড় দিয়ে গড়িয়েই পড়ে

গিয়েছিলেন। তবে, কখনও কোনও উঁচু পাঁচিল টপকাতে গেলে কাকাবাবু দু'হাতের ওপর ভর দিয়ে অনায়াসেই লাফিয়ে পার হয়ে যেতে পারেন। একটা পা নেই বলেই কাকাবাবুর হাত দুটোতে জোর সাঙ্ঘাতিক।

কাকাবাবু একজন অফিসারের ঘরে ঢুকতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে খুব খাতির করে বললেন, "আসুন, আসুন, মিঃ রায়চৌধুরী। এইটি কি আপনার ভাইপো নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। এর নাম সুনন্দ রায়চৌধুরী। এ আমার সঙ্গে যাবে।"

সন্তু কাকাবাবুর পাশের চেয়ারে বসল। তারপর অফিসারটি তাকে কিছু কাগজপত্র সই করতে দিলেন। খানিকটা বাদে তিনি সুন্দর করে বাঁধানো দুটি নীল রঙের ছোট্ট, শক্ত বই কাকাবাবুকে দিয়ে বললেন, "এই নিন, মিঃ রায়চৌধুরী! আচ্ছা, আমার শুভেচ্ছা রইল।"

অফিসারটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাকাবাবু সন্তুকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। সন্তু এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, এটা পাসপোর্ট অফিস। পাসপোর্ট কথাটা আগে শুনেছে সন্তু, কিন্তু জিনিসটা কখনও চোখে দেখেনি।

কাকাবাবু সেই ছোট নীল বইয়ের একটা সন্তুকে দিয়ে বললেন, "এই নাও, এটা তোমার পাসপোর্ট, খুব সাবধানে রাখবে নিজের কাছে।"

সন্তু বইটা খুলে দেখল। প্রত্যেক পাতায় বেশ বড় অশোকচক্রের ছাপ মারা। প্রথম দিকেই বাঁ দিকের পাতায় সন্তুর ছবি আটকানো। সেই দু'কান সমেত মুখের ছবি।

বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে। এই সময় খালি ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত। কোনও ট্যাক্সিই থামছে না। ক্রাচ নিয়ে কাকাবাবু বাসেও উঠতে পারবেন না। মহা মুশকিল। অনেকক্ষণ বাদে একটা ট্যাক্সি পাসপোর্ট অফিসের সামনেই থামল, তা থেকে কয়েকজন লোক নামছে। সন্তু সেই ট্যাক্সিটা ধরবার জন্য যেই দৌড়ে গেল, অমনি একজন লোকের সঙ্গে তার খুব জোরে ধাক্কা লাগল। সন্তু ঘুরে পড়েই যাচ্ছিল, সামলে নিল কোনওক্রমে, কিন্তু পাসপোর্ট বইখানা ছিটকে গেল তার হাত থেকে।

সন্তু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখল। লোকটা বিদেশি। সন্তু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে, লোকটা তাকে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছে। সাহেবরা তো সাধারণত এরকম অভদ্র হয় না। সন্তু লোকটিকে কিছু বলার সুযোগ পেল না, তার আগেই সে খালি ট্যাক্সিটাতে উঠে বসল। লোকটা তাহলে ট্যাক্সিটা নেবার জন্যই এরকম ধাক্কা মেরে দৌড়ে গেল।

পাসপোর্ট বইখানা ছিটকে গিয়ে পড়েছে ফুটপাতের ধারে। আর একটু হলেই

পাশের জলকাদার মধ্যে পড়ত। সন্তু দৌড়ে গিয়ে সেটা নেবার আগেই আর-একটা ময়লা-পোশাক-পরা ভিখিরির মতন ছেলে ছোঁ মেরে তুলে নিল সেটা। তারপর পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। এর মধ্যেই কাকাবাবু এগিয়ে এসে একটা ক্রাচ তুলে খুব জোরে মারলেন ছেলেটার হাতে। ছেলেটা 'উঃ' করে চেঁচিয়ে উঠে পাসপোর্টটা ফেলে দিল। কিন্তু আর দাঁড়াল না, দৌড়ে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে। এদিকে সেই বিদেশি সাহেবটিকে নিয়ে ট্যাক্সিটাও ছেড়ে গেছে।

ব্যাপারটা এমনই হঠাৎ হল যে, সবটা বুঝতেই খানিকটা সময় লাগল সন্তুর। সাহেবটা তাকে ধাক্কা মারল আর ঠিক সেই সময়েই ভিখিরি ছেলেটা তার পাসপোর্টটা চুরি করবার চেষ্টা করল—এর মধ্যে কি কোনও যোগ আছে? না দুটো আলাদা-আলাদা ব্যাপার? ভিখিরি ছেলেটার পাসপোর্ট চুরি করে কী লাভ?

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমাকে বললাম না, পাসপোর্টটা খুব সাবধানে রাখতে?"

মা যেমন ভাবে ছেলেকে আদর করে, কিংবা ফোঁড়া হলে আমরা যে-রকম ভাবে তার ওপর হাত বুলোই, সন্তু ঠিক সেইরকমভাবে পাসপোর্টটা তুলে নিয়ে সেটার ওপর হাত বুলোতে লাগল। ভাগ্যিস জলকাদায় পড়েনি, এমন সুন্দর জিনিসটা তা হলে নষ্ট হয়ে যেত।

আর একটা ট্যাক্সি পেতে বেশি দেরি হল না। তাতে উঠে বসে সন্তু একটু আগের ঘটনাটা ভাবতে লাগল। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত মনে হল এমনিই একটা হঠাৎ-ঘটে-যাওয়া ঘটনা। যদিও এর আসল মানে সন্তু বুঝতে পেরেছিল বেশ কয়েকদিন পরে।

যাই হোক, পাসপোর্টটা পাবার পর সন্তুর আর সন্দেহ রইল না যে, সে এবার বিদেশেই যাচ্ছে। গোয়া কিংবা দার্জিলিং যেতে তো পাসপোর্ট লাগে না! কবে যাওয়া হবে তার ঠিক হয়নি এখনও, কিন্তু সন্তু এর মধ্যেই বাক্স-টাক্স গুছিয়ে একেবারে তৈরি। কিন্তু সব গুছোনো ওলোট-পালোট করতে হল আবার। শুক্রবার দিন রাত্তিরে কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, কাল ভোরে আমরা যাচ্ছি! ছ'টার সময় প্লেন। সাড়ে চারটের সময়ই ঘুম থেকে উঠে পড়তে হবে। জিনিসপত্র এখনই গুছিয়ে রাখো।"

সন্তু আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠল। বলল, "আমার সব গুছোনো ঠিকঠাক করাই আছে!

কাকাবাবু বললেন, "দেখি, বাক্স নিয়ে এসো!"

বাক্স খুলে দেখে কাকাবাবু বললেন, "একী, এত কোট-সোয়েটার নিয়েছ কেন? গরম জামা-টামা লাগবে না! বেশি করে গেঞ্জি নাও!"

বিদেশে যাবে, অথচ গরম জামা লাগবে না, এ আবার কী? তাহলে কি আরব-পারস্যের মতন কোনও মরুভূমির দেশে যাওয়া হচ্ছে? সেগুলোও বিদেশ অবশ্য!

◀ ২ ▶

পাছে ঠিক সময় ঘুম না ভাঙে, তাই সন্তু সারারাত ঘুমোলই না প্রায়। জেগে জেগে সে ঘড়ির আওয়াজ শুনল, একটা...দুটো...তিনটে। কিন্তু শেষ সময়েই সে ঘুমিয়ে পড়ল ঠিক। মা যখন তাকে ডেকে তুললেন, তখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে। ঘড়ি দেখেই তার ভয় হল। কাকাবাবু রাগ করে একাই চলে যাননি তো?

না, কাকাবাবু যাননি। মা কাকাবাবুকেও একটু আগে ডেকে দিয়েছেন। কোথাও বাইরে যাবার সময় মা-ই সবাইকে ঠিক সময় তুলে দেন। মার কোনওদিন ভুল হয় না।

খুব তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে নিল সন্তু। কাকাবাবুর অনেক আগে। মা কত কী খাবার তৈরি করেছেন এরই মধ্যে, কিন্তু উত্তেজনার চোটে সন্তুর খেতে ইচ্ছেই করছে না।

মাকে জিজ্ঞেস করল, "এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি, তুমি এখনও জানো না, মা?"

মা বললেন, "ঐ তো শুনলাম, সিঙ্গাপুর না কোথায় যেন যাওয়া হচ্ছে। দেখিস বাপু, খুব সাবধানে থাকিস। তোর কাকাটি যা গোঁয়ার!"

কাকাবাবু খাবার ঘরে এসে বললেন, "সন্তু, রেডি? বাঃ! পাঁচটা বাজল, আর দেরি করা যায় না। যাও, একটা ট্যাক্সি ডাকো এবার!"

সন্তু রাস্তায় বেরিয়ে এল। ভোরবেলা ট্যাক্সি পাওয়ার কোনও অসুবিধে নেই। ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে সন্তু আবার তরতর করে উঠে এল ওপরে। কাকাবাবু এর মধ্যে খাবার ঘর ছেড়ে চলে গেছেন নিজের ঘরে। দরজাটা ভেজানো। দরজাটা ফাঁক করে কাকাবাবুকে ডাকতে গিয়ে সন্তু থমকে গেল।

বড় লোহার আলমারিটা খোলা। সেটার সামনে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু একটা রিভলবারে গুলি ভরছেন একটা-একটা করে।

সন্তু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এর আগে সে কাকাবাবুর সঙ্গে অনেক বার বাইরে গেছে, কোনওবার তো কাকাবাবুকে রিভলবার সঙ্গে নিয়ে যেতে দেখেনি। এবার কি আরও বিপজ্জনক কোনও জায়গায় যাওয়া হচ্ছে।

গুলি ভরা হয়ে গেলে কাকাবাবু রিভলভারটা সুটকেসের মধ্যে জামা-কাপড়ের নীচে সাবধানে রেখে দিলেন।

প্লেনে চাপবার কথা ভেবেই সন্তুর এত আনন্দ হচ্ছে যে, তার মুখ দিয়ে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে। জীবনে প্রথম সে প্লেনে চাপবে। প্লেনটা যখন বাঁকা হয়ে মাটি থেকে আকাশে ওড়ে, তখন ভেতরের মানুষগুলো গড়িয়ে পড়ে যায় না?

দমদমে প্লেনে ওঠার আগে সবাইকে একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হল।

সেই ঘরের দরজায় লেখা আছে সিকিউরিটি চেকিং। একজন একজন করে সেই ঘরে ঢুকছে। কাকাবাবুর আগে সন্তুই ঢুকল। একজন পুলিশের পোশাক পরা লোক সন্তুর কাঁধের ঝোলানো ব্যাগটার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, দেখি, ওর মধ্যে কী আছে?

ব্যাগটার মধ্যে রয়েছে কয়েকটা গল্পের বই, তোয়ালে আর মায়ের দেওয়া খাবারের কৌটো। লোকটা সেগুলো এক নজর শুধু দেখল। তারপর সন্তুর গায়ে দু'হাত দিয়ে চাপড়াতে লাগল। প্রথমে সন্তু এর মানে বুঝতে পারেনি। তার পরেই মনে পড়ল। লোকটি দেখছে, সন্তু জামা প্যাণ্টের মধ্যে কোনও রিভলভার কিংবা বোমা লুকিয়ে রেখেছে কিনা! খবরের কাগজে সে পড়েছে, আজকাল প্রায়ই প্লেন-ডাকাতি হয়। চলন্ত প্লেনে ডাকাতরা পাইলটের সামনে রিভলভার কিংবা বোমা দেখিয়ে প্লেনটা অন্য জায়গায় নিয়ে যায়।

কাকাবাবুর কাছে তো রিভলভার আছে, ওরা সেটা কেড়ে নেবে? ও, সেইজন্যই কাকাবাবু রিভলবার পকেটে না-রেখে সুটকেসে রেখেছেন। সুটকেসগুলো তো আগেই জমা দেওয়া হয়ে গেছে, সেগুলো তো আর ওরা খুলে দেখবে না।

যাই হোক, সকলের সঙ্গে লাইন দিয়ে ওরাও সিঁড়ি দিয়ে প্লেনে উঠল। সিঁড়ির ঠিক ওপরে, একটি খুব সুন্দরী মেয়ে হাতজোড় করে প্রত্যেককে বলছে, নমস্কার। সন্তু জানে, এই মেয়েদের বলে এয়ার হস্টেস।

প্লেনের ভেতরটায় হাল্কা নীল রঙের আলো। মেঝেতে পুরু কার্পেট। সবাই এখানে খুব ফিসফিস করে কথা বলে। সন্তুর আর কাকাবাবুর পাশাপাশি দুটি সীট। কাকাবাবু তাকে জানলার ধারের সীটটায় বসতে দিলেন। তারপর বললেন, দেখো, পাশে বেল্ট লাগানো আছে, তোমার কোমরে বেঁধে নাও।

সন্তু বেল্টটা খুঁজে পেল, কিন্তু ঠিক মতন লাগাতে পারল না। বেশ চওড়া নাইলনের বেল্ট, মোটেই সাধারণ বেল্টের মতন নয়। কাকাবাবু সেটা লাগাতে শিখিয়ে দিলেন। খোলা দিকটা খাপের মধ্যে ঢোকাতেই মট করে একটা শব্দ হয়। ও, এ-রকম বেল্ট বাঁধা থাকে বলেই বুঝি লোকেরা গড়িয়ে পড়ে যায় না?

তারপর কিন্তু আরও অনেকক্ষণের মধ্যে প্লেনটা ছাড়ল না। সবাই তো উঠে গেছে, দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে, তবু এত দেরি করছে কেন? সন্তু আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। জানলা দিয়ে এখন বাইরে দেখবার মতন কিছু নেই। এখানে মাটি নেই, সব জায়গাটাই শান বাঁধানো, সেখানে ঝকঝক করছে রোদ।

সন্তু গলা উঁচু করে প্লেনের ভেতরের লোকজনদের দেখবার চেষ্টা করল। কতরকমের লোক, বাঙালি, মারোয়াড়ী, নেপালী, সাহেব-মেম, এমন-কী, একজন নিগ্রো পর্যন্ত আছে। সেই এয়ার হস্টেসটি একবার লোকজনদের গুনে গুনে গেল।

"কাকাবাবু, এখনও ছাড়ছে না কেন?"

কাকাবাবু উঠেই খবরের কাগজ পড়ায় মন দিয়েছিলেন। চোখ না তুলেই বললেন, "সময় হলেই ছাড়বে!"

এই সময় প্লেনের দরজা আবার খুলে গেল। একজন পুলিশ অফিসার ঢুকে ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ নরিন্দর পাল সিং কে আছেন?"

সামনের দিক থেকে একজন লম্বা মতন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললল, "আমি। কেয়া হুয়া?"

"আপনার পাসপোর্টটা একবার দেখান তো!"

"আবার দেখাতে হবে? একবার তো দেখালাম?"

"আর একবার দেখান!"

লোকটি পরে আছে ধুতির ওপরে লম্বা ধরনের প্রিন্স কোট। প্রথমে কোটের সবকটা পকেট খুঁজল। তারপর হাতব্যাগটা খুলে নিয়ে দেখল। তারপর আবার পকেট চাপড়াল। কোথাও পেল না।

লোকটি চেঁচিয়ে বলল, 'মেরা পাসপোর্ট কোউন লিয়া? পকেটমেই তো থা!"

প্লেনের সব লোক ঐ লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকটি তার পাসপোর্ট কিছুতেই খুঁজে পেল না। পুলিশ অফিসারটি গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনি আমার সঙ্গে নেমে আসুন!"

লোকটি প্রথমে আপত্তি করল খুব। তার খুব জরুরি দরকার আছে। তাকে যেতেই হবে। পাসপোর্ট তো তার সঙ্গেই ছিল, কী করে হারিয়ে গেল বুঝতে পারছে না।

পুলিশ অফিসারটি কিছুই শুনলেন না। লোকটিকে সঙ্গে করে নেমে গেলেন।

সন্তু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, পুলিশ কি লোকটাকে ধরে নিয়ে গেল?"

"পাসপোর্ট খুঁজে পেলে ছেড়ে দেবে।"

"যদি খুঁজে না পায়?"

"তা হলে যেতে দেবে না। এই দ্যাখ!"

কাকাবাবু আঙুল দিয়ে খবরের কাগজের একটা জায়গা দেখালেন। সেখানে লেখা রয়েছে, "পাসপোর্ট চুরি। কলকাতার বিভিন্ন জায়গা থেকে পাসপোর্ট খোয়া যাচ্ছে আজকাল। পুলিশের ধারণা, কোনও একটা জালিয়াতের দল কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই পাসপোর্ট 'চুরি করেছে"—ইত্যাদি। সন্তু ভাবল, ওরে বাবা, পাসপোর্ট জিনিসটা তাহলে এত দামি? হারিয়ে গেলে তাকেও এখন এই প্লেন থেকে নামিয়ে দিত? তাড়াতাড়ি কোটের বুক-পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল তার নিজেরটা ঠিক আছে কিনা।

সেদিন তাহলে সেই যে ছেলেটা তার পাসপোর্টটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটেছিল, সে কি চুরি করার চেষ্টা করছিল? সাহেবটা তাকে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছিল কেন?

সবাই বলে, সাহেবরা কখনও অভদ্র হয় না। হঠাৎ ধাক্কা লেগে গেলেও তারা "সরি" বলে ক্ষমা চায়। সেই সাহেবটা তো ক্ষমা চায়নি।

সন্তু কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকাল। উনি আবার খবরের কাগজ পড়ায় মন দিয়েছেন। সব সীটের পেছনের খাপে অনেকগুলো করে খবরের কাগজ রাখা থাকে।

একটু পরেই আবার প্লেনের দরজা বন্ধ হল। গোঁ গোঁ শব্দ হল ইঞ্জিনের। নরিন্দর পাল সিং আর ফিরে এল না। লোকটার জন্য একটু একটু দুঃখ হল সন্তুর। ইস, প্লেনে উঠেও লোকটার যাওয়া হল না!

এবার প্লেনটা মাটির ওপর দিয়ে দৌড়তে শুরু করল। প্রথমে আস্তে, তারপর খুব জোরে। দৌড়চ্ছে তো দৌড়চ্ছেই! কখন একসময় যে প্লেনটা মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ল, সন্তু টেরও পেল না। কোমরের বেল্টে একটু হ্যাঁচকা টান লাগল না পর্যন্ত।

হঠাৎ সে দেখল, নীচের মানুষগুলো ছোট হয়ে আসছে। এয়ারপোর্ট আর নেই, তার বদলে গাছপালা, মাঠে গোরু চরছে, ফিতের মতন সরু রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে। গাড়িগুলো সব খেলনার মতন, গোরুগুলো ঠিক যেন ছোট-ছোট মাটির পুতুল। রুপোলি ফিতের মতন একটা নদী। তারপর আর কিছু দেখা যায় না। সামনে তাকাতেই মনে হল কালো রঙের একটা বিশাল পাহাড়। প্লেনটা সোজা সেই দিকেই যাচ্ছে। কলকাতার এত কাছে পাহাড় কী করে এল? ভাল করে তাকিয়ে বুঝতে পারল পাহাড় নয় মেঘ। কী ভয়ংকর ঐ মেঘের চেহারা!

কাকাবাবু এর মধ্যেই ঝিমোচ্ছেন। খুব ভোর রাতে উঠতে হয়েছে তো। কিন্তু বাইরে এত চমৎকার সব দৃশ্য, তা না দেখে কেউ ঘুমোতে পারে? হাল্কা-হাল্কা মেঘ উড়ে যাচ্ছে প্লেনের খুব কাছ দিয়ে। এক-এক জায়গায় মেঘ জমে আছে এমন অদ্ভুতভাবে যে, দেখলে মনে হয়, সাদা রঙের দুর্গ কিংবা একটা জঙ্গল।

প্লেনের ভেতরে ইঞ্জিনের দিকটায় এতক্ষণ লাল আলোয় দুটো লেখা জ্বলছিল। ধূমপান করবেন না আর সিটবেল্ট বেঁধে রাখুন। এবার সেই আলো দুটো নিভে গেল। মাইক্রোফোনে একটা মেয়ের গলা শোনা গেল, "নমস্কার! এই বিমানের ক্যাপ্টেন দিলীপকুমার দত্ত আর অন্যান্য কর্মীদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা তিন ঘণ্টা দশ মিনিটের মধ্যে রেঙ্গুন পৌঁছব। এখন আপনারা সীটবেল্ট খুলে ফেলতে পারেন..."

রেঙ্গুনে! সন্তুর বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। তারা তাহলে রেঙ্গুন যাচ্ছে? রেঙ্গুন মানে বর্মা দেশ। প্যাগোডা। আর কী আছে রেঙ্গুনে?

ঘোষণা শুনেই কাকাবাবু চোখ মেলে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন। সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আমরা তাহলে রেঙ্গুন যাচ্ছি?"

"না।"

কী আশ্চর্য ব্যাপার, সন্তু নিজের কানে শুনল যে, প্লেনটা রেঙ্গুনে যাবে, আর কাকাবাবু তবুও 'না' বলছেন। এর মানে কী?

এবার সেই এয়ার হস্টেসটি একটা ট্রেতে করে কিছু লজেন্স এনে সবাইকে দিয়ে গেল। তারপর নিয়ে এল চা আর কফি।

কাকাবাবু বললেন, "এদের চা ভাল হয় না। কফিটাই খাও।"

তারপর সন্তুর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "যদি বাথরুম পায়, বলতে লজ্জা পেও না। পেছন দিকে বাথরুম আছে।"

সন্তুর বাথরুম পায়নি। কিন্তু প্লেনের বাথরুম কেমন হয়, তার খুব দেখতে ইচ্ছে করল।

এখন আর বাইরে দেখার কিছু নেই। শুধু মেঘ। তাই সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি একটু যাব।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "নিজে নিজে যেতে পারবে?"

"হ্যাঁ।"

"ঐ যে দেখছ, টয়লেট লেখা আছে, ঐখানে।"

এত উঁচু দিয়ে দারুণ জোরে প্লেন যাচ্ছে, অথচ ভেতর থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ভেতরটা একদম স্থির। হেঁটে যেতে পা টলে যায় না।

সন্তু প্লেনের পিছন দিকে চলে গেল। তারপর বাথরুমের দরজা খুলবে, এমন সময় পাশের দিকে চোখ পড়ল। তার গা-টা একবার কেঁপে উঠল। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

একেবারে শেষের সীটটায় দু'জন সাহেব বসে আছে। সন্তুর চিনতে কোনও অসুবিধে হল না, এর মধ্যে একজন হচ্ছে সেই সাহেবটা, যে পাসপোর্ট অফিসের সামনে সন্তুকে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছিল! কাকাবাবুর কাছ থেকে সন্তু একটা জিনিস শিখেছে। একবার কারুকে দেখলে তার মুখটা সব সময় মনে রাখার চেষ্টা করতে হয়। সন্তু ঠিক মনে রাখতে পারে।

সাহেবটি অবশ্য আজ পোশাক বদলেছে। একটা খাকি প্যান্ট আর সাদা হাফ শার্ট পরে আছে। চার পাঁচ দিন দাড়ি কামায়নি। দেখলে খুব সাধারণ লোক মনে হয়। কিন্তু আগের দিন খুব সাজগোজ করা খাঁটি সাহেবের মতন দেখাচ্ছিল। নিশ্চয়ই ছদ্মবেশ ধরেছে। পাশের লোকটার পোশাকও সেইরকম। দু'জনে খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে। সন্তুকে দেখতে পায়নি।

সন্তু বাথরুমের মধ্যে একটুখানি থেকেই বেরিয়ে এল। বাথরুমটা ছোট্ট, বিশেষ কিছু নতুনত্ব নেই।

ধীরে সুস্থে নিজের জায়গায় ফিরে এল। তারপর মুখ নিচু করে ফিসফিস করে বলল, "কাকাবাবু, সেই সাহেবটা!"

"কোন্ সাহেবটা?"

"সেদিন পাসপোর্ট অফিসের সামনে যে আমায়..."

সন্তু মাথা পেছন দিকে ঘুরিয়ে ওকে আবার দেখতে গেলে কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "ওদিকে তাকাবি না। তোকে চিনতে পেরেছে?"

"না, আমায় দেখতে পায়নি।"

কাকাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কিন্তু আমায় ঠিক চিনবে।"

কথাটা ঠিক। কাকাবাবুর একটা পা কাটা। ক্রাচ নিয়ে চলতে হয়। এরকম লোককে একবার দেখলেই সবার মনে থাকে। সন্তুর মতন ছেলেমানুষকে হয়ত ঐ সাহেব দুটো লক্ষ করত না।

প্লেনের গতি কমে এল। আবার সীটবেল্ট বাঁধতে হবে। রেঙ্গুন এসে গেছে। সন্তু আবার নীচের দিকে তাকাল। ছবির মতন শহরটা দেখা যায়। এমন-কী, প্যাগোডার চূড়াও চোখে পড়ে।

রেঙ্গুনে কিন্তু যাওয়া হল না। প্লেন এখান থেকে তেল নেবে। তাই এয়ারপোর্টে আধঘণ্টা বিশ্রাম। একটু বাইরে বেরিয়ে শহরটাও দেখে আসা যাবে না!

সব যাত্রীরা নেমে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে ঘোরাফেরা করছে। কাকাবাবু সন্তুকে একটা সোফা দেখিয়ে বললেন, "এখানে চুপ করে বসে থাক। অন্য কোথাও যাবি না।"

সেই সাহেব দুটো একটু দূরে দাঁড়িয়ে গুজগুজ করছিল। কাকাবাবু ক্রাচ ঠকঠক করে তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তারপর হাতঘড়িটা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ঘড়িটা বোধহয় ঠিক চলছে না। আপনাদের ঘড়িতে কটা বাজে?"

সাহেব দুটো একটু বিরক্ত হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। তারপর ঘড়ি দেখে অবহেলার সঙ্গে সময় বলে দিল।

সন্তু কাকাবাবুর সাহস দেখে অবাক। উনি নিজে থেকে ওদের দেখা দিতে গেলেন? ওরা যে খারাপ লোক তাতে তো আর কোনও সন্দেহই নেই। নইলে দাড়ি না-কামিয়ে কেউ প্লেনে চাপে?

খানিকটা বাদে কাকাবাবু ফিরে এসে বললেন, "আবার প্লেনে উঠতে হবে।"

আবার সীটবেল্ট বাঁধা, আবার বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা। এবার প্লেন বেশ তাড়াতাড়ি উড়ল। এবারে মাইক্রোফোনে মেয়েটি ঘোষণা করল, "নমস্কার, আর দু'ঘণ্টা দশ মিনিটের মধ্যে আমরা পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছে যাব, যদি ঝড়বৃষ্টি না হয়..."

পোর্ট ব্লেয়ার? পোর্ট ব্লেয়ার জায়গাটা কোথায়? সিঙ্গাপুরে? জাপানে? নামটা একটু চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

"কাকাবাবু, পোর্ট ব্লেয়ার কোথায়?"

"আন্দামানে।"

তারপর একটু থেমে উনি বললেন, "আমরা ঐখানেই নামব।"

সন্তুর বুকটা দমে গেল। এত জল্পনা-কল্পনার পর শেষ পর্যন্ত আন্দামান? সেটা তো একটা বিচ্ছিরি জায়গা। সেখানে শুধু কয়েদীরা থাকে। সেখানে যাবার মানে কী?

সন্তু নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল গাঢ় নীল রঙের সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় শুধু সমুদ্র। মাঝে মাঝে জলের ওপর রোদ এমন ঠিকরে পড়ছে যেন চোখ ঝলসে যায়!

আন্দামান তো ভারতবর্ষের মধ্যেই। তবু সেখানে যাবার জন্য পাসপোর্ট জোগাড় করা কিংবা এত তোড়জোড় লাগে কেন? সাহেব দুটোই বা কেন সেখানে যাচ্ছে? কী আছে সেখানে?

আন্দামানের নাম শুনে সন্তু ভেবেছিল একটা নোংরামতন বিচ্ছিরি দ্বীপ দেখবে। যে-জায়গায় এক সময় শুধু চোর-ডাকাত আর কয়েদীদের পাঠানো হত, সে জায়গা তো আর সুন্দর হতে পারে না। আগেকার দিনে অনেকেই নাকি আন্দামানে একবার গেলে আর জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারত না। সেই জায়গায় কেউ শখ করে যায়?

◀ ৩ ▶

কিন্তু প্লেনটা যখন ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল, তখন জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সন্তু একেবারে অবাক হয়ে গেল। ছবির বই ছাড়া এমন সুন্দর দৃশ্য সন্তু আগে কখনও দেখেনি। পুরী কিংবা দীঘার সমুদ্রে সে দেখেছে ঘোলাটে ধরনের জল। এখানে সমুদ্রের জল একেবারে গাঢ় নীল রঙের। এত গাঢ় যে, মনে হয় কলম ডুবিয়ে অনায়সে লেখা যাবে। তার মাঝখানে ছোট-ছোট দ্বীপ। আন্দামান তো একটা দ্বীপ নয়—সন্তুই গুনে ফেলল এগারোটা। পরে শুনেছিল, ওখানে দুশোর বেশি দ্বীপ আছে।

প্রত্যেকটা দ্বীপেই ছোট-ছোট পাহাড় আছে, আর সেই পাহাড়ে গিজগিজ করছে গাছপালা। এত গভীর বন যে পৃথিবীতে এখনও আছে, ভাবাই যায় না। মনে হয় যেন ওর মধ্য দিয়ে হাঁটাই যাবে না। বিরাট বিরাট গাছ। সেই নীল রঙের সমুদ্রের মধ্যে সবুজ সবুজ দ্বীপ, দ্বীপগুলোর ধারে ধারে ঢেউ এসে ভেঙে পড়ে ধপধপে সাদা ফেনা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বেশির ভাগ দ্বীপেই একটাও বাড়িঘর নেই। তারপর একটা বড় দ্বীপে কিছু-কিছু বাড়ি চোখে পড়ল। প্লেনটা সেখানেই নামছে। এই জায়গাটার নামই পোর্ট ব্লেয়ার। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেনটা মাটি ছুঁতেই সন্তু তার কাকাবাবুর দেখাদেখি কোমর থেকে সীটবেল্ট খুলে ফেলল। কান দুটো কী রকম যেন ভোঁভোঁ করছে। মাঝে মাঝেই পুচ্‌পুচ্‌ করে একটু হাওয়া বেরিয়ে আসছে কানের ভেতর থেকে। বাইরের শব্দ কিংবা ভেতরের অন্যদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে খুব আস্তে। বেশ মজাই লাগছে সন্তুর।

অন্যরা নামতে শুরু করতেই সন্তু তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। কাকাবাবু নামলেন সবার শেষে। কাকাবাবুকে ক্রাচে ভর দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয় খুব সাবধানে। সন্তু একটু লজ্জা পেল। আগে আগে না এসে তার উচিত ছিল কাকাবাবুকে একটু সাহায্য করা। কিন্তু সে আবার সিঁড়ির কাছে যাবার আগেই কাকাবাবু নেমে পড়েছেন।

একজন গোলগাল বেঁটেমতন লোক এগিয়ে এসে কাকাবাবুর হাত ছুঁয়ে বলল, "আপনি নিশ্চয় মিস্টার রায়চৌধুরী? আমি দাশগুপ্ত। আপনার জন্য গাড়ি নিয়ে এসেছি।"

কাকাবাবু সন্তুকে দেখিয়ে বললেন, "এটি আমার ভাইপো। এর নাম সুনন্দ রায়চৌধুরী, ডাকনাম সন্তু।"

দাশগুপ্ত নামের লোকটি সন্তুর পিঠে হাত দিয়ে বলল, "বেড়াতে এসেছ তো? ভাল লাগবে, দেখো খুব ভাল লাগবে!"

কাকাবাবু দাশগুপ্তকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "ঐ যে দু'জন বিদেশি সাহেব, ওদের দিকে একটু নজর রাখতে হবে। ওরা কোথায় যায়, কোথায় ওঠে—"

দাশগুপ্ত একটু অবাক হয়ে বলল, "এই প্লেনে তো বিদেশি কেউ আসছে না! আমরা আগে থেকেই খবর পাই।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে ঐ দু'জন?'

'ওরা নিশ্চয়ই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এখানে একটা দেশলাইয়ের কারখানা আছে। সেখানে কিছু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কাজ করে। মাঝে-মাঝে ওদের যাতায়াত করতে হয় কলকাতায়—"

"তবু ওরা কোথায় থাকবে, সেটা আমি জেনে রাখতে চাই।"

দাশগুপ্ত এবার হেসে বলল, "সে ঠিক জানা যাবে। এটা খুব ছোট জায়গা, এখানে সকলের সঙ্গেই সকলের দেখা হয়ে যায়। ওরা নিশ্চয়ই দেশলাই কারখানার কোয়ার্টারেই থাকবে।"

কাকাবাবু আড়চোখে সাহেব দুটির দিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। লোক দুটি

এমনভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, যেন কারুকে খুঁজছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কোনও লোক আসেনি। একটু বাদে ওরা নিজেরাই গট্ গট্ করে হেঁটে বেরিয়ে গেল।

মালপত্তর নিয়ে ওরা এয়ারপোর্টের বাইরে এসে একটা জিপ গাড়িতে চড়ল। কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের থাকার জায়গা ঠিক আছে তো?"

দাশগুপ্ত বলল, "হ্যাঁ, টুরিস্ট হোমে আপনাদের ঘর বুক করা আছে। সেটাই এখানকার সবচেয়ে ভাল জায়গা! খাওয়া-দাওয়ারও কিছু অসুবিধে হবে না। বেশ কিছুদিন থাকবেন তো?"

কাকাবাবু বললেন, "দেখি!"

প্লেন থেকে বোঝাই যায়নি যে দ্বীপের মধ্যে এ-রকম একটা শহর আছে। বেশ চমৎকার পীচ বাঁধানো রাস্তা, দু'পাশে নতুন-নতুন বাড়ি ও দোকানপাট। তবে রাস্তাটা পাহাড়ি শহরের মতন উঁচু-নীচু, আর মাঝে-মাঝেই হঠাৎ-হঠাৎ দূরে সমুদ্র দেখা যায়।

টুরিস্ট হোমটা একটা ছোট টিলার ওপর। আসবার পথে খানিকটা জঙ্গল পার হতে হয়। বাড়িটার সামনে অনেকখানি ফুলের বাগান। আর পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালেই সমুদ্র। খুব কাছে। এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট জাহাজ আর স্টিমার রয়েছে। চমৎকার জায়গা। যে-কোনও দিকে তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

একটা ডবল-বেড ঘর ঠিক করা ছিল সন্তুদের জন্য। একজন বেয়ারা ওদের মালপত্র পৌঁছে দিল ঘরে। কাকাবাবু তাকে এক টাকা বখশিস দিতে যেতেই সে লজ্জায় জিভ কেটে বলল, "নেহি! নেহি!"

কাকাবাবু আবার বললেন, "আরে নাও নাও, তোমার চা খাবার জন্য!"

লোকটি আরও লজ্জা পেয়ে মাথা নুইয়ে ফেলে বলল, "নেহি! নেহি! আপ রাখ দিজিয়ে।"

এ আবার কী রকম—হোটেলের বেয়ারা যে বখশিস নিতে চায় না? কাকাবাবু দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন, "এক টাকা বখশিস দিলে কম হয় নাকি? আরও বেশি চাইছে?"

দাশগুপ্ত বলল, "না, না, এরা বখশিস নিতে চায় না। দেখবেন, এখানকার লোক খুব ভাল—পয়সা-কড়ির দিকে কারুর লোভ নেই!"

লোকটির কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। চেহারা দেখলেই মনে হয় দক্ষিণ ভারতীয়! অথচ হিন্দীতে কথা বলছে।

কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী? তুমি বাংলা বোঝো?"

লোকটি বলল, "হাঁ সাব্, বাংলা বুঝি। আমার নাম কড়কড়ি!"

সন্তু অমনি ফিক করে হেসে ফেলল। কড়কড়ি আবার লোকের নাম হয় নাকি?

দাশগুপ্ত বলল, "সত্যিই ওর নাম কড়কড়ি। এই যে, শোনো কড়কড়ি, সাহেবদের যত্ন-টত্ন করবে কিন্তু! ভাল খাবার-দাবার দেবে। আজ কী কী খাবার আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "মাছের ঝোল ভাত পাওয়া যাবে?"

দাশগুপ্ত বলল, "মাছ যত ইচ্ছে চাইবেন! এটা তো মাছেরই দেশ। এখানকার রাঁধুনী, বেয়ারা সবাই কেরালার লোক, ওরা আমাদেরই মতন মাছের ঝোল খায়। চিংড়ি মাছ পাবেন খুব ভাল। তাছাড়া মুরগী বা হরিণের মাংস—যেদিন যেটা ইচ্ছা হয় অর্ডার করবেন!"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, তাহলে তো চমৎকার ব্যবস্থা!"

দাশগুপ্ত তখনকার মতন বিদায় নিল। আবার সন্ধের সময় আসবে। সন্তু সুটকেসগুলো খুলে জামা-টামা সব বার করে গুছিয়ে রাখল। দুটো পাশাপাশি বিছানা, বেশ চওড়া খাট।

কাকাবাবু একটা খাটের ওপর বসে একটা ম্যাপ বিছিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন। সন্তু পেছনের দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। পেছনেও খানিকটা বাগান, তারপর পাহাড়টা খাড়া হয়ে নেমে গেছে, তার ঠিক নিচেই সমুদ্র। একটু দূরেই, বাঁ পাশে আর-একটা দ্বীপ। সেটা একেবারে জঙ্গলে ভরা। ঐ দ্বীপটায় একবার যেতেই হবে।

সন্তু দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ শুনতে পেল হাতির ডাক। পরপর দু'বার। সে একেবারে শিউরে উঠল। এত কাছের ঐ দ্বীপটায় বুনো হাতি আছে? বাঘ-সিংহও আছে নিশ্চয়ই। এরকম একটা ভয়ংকর জঙ্গল এত কাছে? একটা দূরবীন থাকলে সে নিশ্চয়ই হাতিগুলোকে দেখতে পেত।

কিন্তু সন্তুর আর সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো হল না। কথা নেই বার্তা নেই, অমনি বৃষ্টি এসে গেল! প্রথমে মিহি বরফের গুঁড়োর মতন, তারপরই ঝমঝম। সন্তু দৌড়ে ফিরে এল নিজেদের ঘরে।

কাকাবাবু তখনও ম্যাপটা দেখছেন। সন্তু উত্তেজিতভাবে বলল, "কাকাবাবু, কাকাবাবু, সামনের দ্বীপটায় না, হাতি আছে!"

কাকাবাবু মুখ না তুলেই বললেন, "তা তো থাকতেই পারে!"

"আমি হাতির ডাক শুনলাম। নিজের কানে, এক্ষুনি!"

"হুঁ।"

"ওখানে বাঘ বা সিংহ আছে?"

কাকাবাবু এবার মুখ তুলে বললেন, "না! আন্দামানে কোনও হিংস্র জন্তু নেই। ঐ হাতিগুলোও পোষা হাতি। বড়বড় গাছ কাটা হয় তো, সেগুলো বয়ে নিয়ে যাবার জন্য হাতি লাগে। আমার চেনা এক ভদ্রলোক একবার কলকাতা থেকে পঞ্চাশটা হাতি নিয়ে এসেছিলেন এখানে।"

পোষা হাতির কথা শুনে সন্তু একটু দমে গেল। পোষা হাতি আর বুনো হাতি দেখা তো এক নয়! যাই হোক, রিনিকে যখন সে চিঠি লিখবে, তখন লিখবে যে, সে বুনো হাতিরই ডাক শুনেছে। এত গভীর জঙ্গলের মধ্যে পোষা হাতিই বা দেখেছে কজন?

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, ঐ লোকটিকে ডেকে এক কাপ চা দিতে বলো তো আমাকে। ভাত খাবার তো খানিকটা দেরি আছে!"

এইরে, লোকটার নাম কী যেন? একটু আগেই তো বলল, একদম মনে পড়ছে না! গড়াগড়ি? খড়খড়ি? সুড়সুড়ি? কাতুকুতু? না তো! ধরাধরি? মারামারি?

বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে সন্তু চেঁচিয়ে বলল, "এই যে, ইয়ে! একটু শুনে যাও তো!"

ভাগ্যিস তাতেই সাড়া দিল লোকটা। ডাইনিং রুমের পাশ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "কী বলছেন, সাব?"

সন্তু তাকে চায়ের কথাটা জানিয়ে নিশ্চিন্ত হল। ওর নামটা কিন্তু এখনও মনে পড়ছে না!

আশ্চর্য, এর মধ্যেই বৃষ্টি থেমে গেছে। এ কী রকম ভাল্লুকের জ্বরের মতন বৃষ্টি! আকাশে আর এক টুকরোও মেঘ নেই।

ভোরবেলা সন্তু ছিল কলকাতায় তার নিজের বাড়িতে। আর এখন এই দুপুরের মধ্যেই সে কোথায় চলে এসেছে! হঠাৎ যেন বিশ্বাসই করা যায় না। সত্যি কি সে আন্দামানের টুরিস্ট হোমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে? নাকি এটা স্বপ্ন? সন্তু নিজের হাতে একটু চিমটি কেটে দেখল, না, এটা স্বপ্ন নয়।

কাকাবাবুর আগে সন্তু স্নান করে নেবার জন্য বাথরুমে ঢুকল। সেখানে আবার এক অবাক কাণ্ড! শাওয়ার খুলে সে সবেমাত্র ওপর দিকে তাকিয়েছে, পাশের দেয়ালে দেখল একটা সবুজ রঙের টিকটিকি! প্রথমে সে ভেবেছিল সাপ বা অন্য কিছু। কিন্তু তা নয়। এমনিই একটি সাধারণ টিকটিকি। কিন্তু রঙটা একদম সবুজ! টিকটিকিটা তাড়া করে আসছেও না, কিছুই না। শুধু তার দিকে চেয়ে আছে। সবুজ রঙের টিকটিকির কথা সে কারুর কাছে কোনওদিন শোনেনি। সে এতই অবাক হয়ে গেল যে, আর চেপে রাখতে পারল না। ভিজে গায়ে তোয়ালে পরেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "কাকাবাবু, কাকাবাবু, একটা অদ্ভুত জিনিস!"

সে এতই উত্তেজিত হয়ে বলল যে কাকাবাবু উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। টিকটিকিটা দেখে বললেন, "হুঁ, অদ্ভুতই বটে। এখানে এরকম আরও কিছু কিছু আছে, শুনেছি এখানে সাদা রঙের কুমির দেখতে পাওয়া যায়!"

সন্তু ভাবল, রিনিকে চিঠি লিখে চমকে দেবার আর একটা জিনিস পাওয়া গেল। গোয়াতে বেড়াতে গিয়ে ও কি এত সব নতুন জিনিস দেখতে পাবে!

সেদিন দুপুরে আর কোথাও বেরুনো হল না। খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম। এখানে সন্ধে হয় বেশ তাড়াতাড়ি। বিকেল হতে না হতেই সন্ধে।

সন্ধের সময় দাশগুপ্ত এল, তার সঙ্গে যাওয়া হল বাজারের দিকে। পোর্ট ব্লেয়ার বেশ আধুনিক শহর। এখানে টেলিফোন করে ডাকলেই ট্যাক্সি এসে যায়। বাজারে সবরকম জিনিসই কিনতে পাওয়া যায়। অবশ্য সে-সব জিনিস কলকাতা কিংবা মাদ্রাজ থেকে আনা।

শহরে নানারকম লোক। বাঙালি, মাদ্রাজী, কেরালার লোক, পাঞ্জাবী, বিহারী, বর্মী। তবে বাঙালিই যেন বেশি মনে হয়। কিছু লোক আছে, যারা আগেকার কয়েদীদের বংশধর। তবে, দাশগুপ্ত বলল, এখানে এখন চুরি ডাকাতি একদম হয় না।

রাস্তার পাশে-পাশে বড়-বড় ব্যারাক বাড়িতে দেখা যায় কিছু চীনে মেয়ে-পুরুষ। তাদের নোংরা নোংরা জামা, কী রকম রাগ-রাগ চোখে তারা তাকায়।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "দাশগুপ্ত, এরাই বুঝি সেই তাইওয়ানিজ?"

দাশগুপ্ত বলল, "হ্যাঁ সার!"

সন্তু ঠিক বুঝতে পারল না। সে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, তাইওয়ানিজ মানে কী?"

কাকাবাবুর বদলে দাশগুপ্তই বলল, "তাইওয়ান বলে চীনেদের একটা ছোট্ট দেশ আছে। তাদের সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্ক নেই। সেই দেশ থেকে মাঝে মাঝে সাত-আটজন লোকসুদ্ধু এক-একটা মাছ ধরা নৌকো এখানে ভেসে চলে আসে। তাই তাদের ধরে আটকে রাখতে হয়!"

"কেন, তারা মাছ ধরতে আসে বলে তাদের ধরে রাখতে হয় কেন?"

"এক দেশের নৌকো তো আর-এক দেশে বিনা অনুমতিতে যাবার নিয়ম নেই। তাছাড়া ওরা শুধু মাছ ধরতে আসে, না গুপ্তচরের কাজ করতে আসে, সেটাও জানা দরকার।"

"কিন্তু ওদের বাড়ির দরজা-টরজা তো সব খোলা। ওরা পালিয়ে যেতে পারে না আবার?"

"কী করে যাবে? ওদের নৌকো যে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সমুদ্র দিয়ে আর তো পালাবার কোনও উপায় নেই! ওদের মধ্যে যারা একটু বদমেজাজী, তাদের আটকে রাখা হয় জেলে!"

দাশগুপ্ত এবার কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "স্যার, আপনি এখানকার জেল দেখতে যাবেন না? এখানকার বিখ্যাত জেল সবাই আগে দেখে। কবে যাবেন? কাল?"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "না। কাল সকালে আমার প্রথম কাজ হবে

এখানকার দেশলাইয়ের কারখানাটা দেখতে যাওয়া। সেখানকার কারুর সঙ্গে আপনার চেনা আছে?"

দাশগুপ্ত বলল, "হ্যাঁ। অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার মিঃ ভার্গবকে আমি ভালই চিনি।"

"কাল সকালেই সেখানে যাব।"

পরদিন খুব সকালে উঠেই সন্তু তৈরি হয়ে নিল। তারপর কাকাবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল হেঁটেই। সকালবেলা একটু হাঁটলে ভালই লাগে। কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়েও হাঁটতে ভালবাসেন। কিন্তু সুস্থির হয়ে হাঁটবার কি উপায় আছে? মাঝে-মাঝেই হঠাৎ-হঠাৎ বৃষ্টি। তখন কোনও গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। অবশ্য দু-এক মিনিটের বেশি বৃষ্টি থাকে না।

দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বড় রাস্তায়। সে তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছিল। লোকটি বেশ বেঁটে ও মোটা, এত জোরে হাঁটবার জন্য হাঁপাচ্ছিল। সে বলল, "দেশলাইয়ের কারখানা অনেকটা দূর, সেখানে তো হেঁটে যাওয়া যাবে না। দাঁড়ান, এই রাস্তা দিয়ে বাস আসবে!"

মিনিট পনেরো পরেই বাস এল। একদম ভিড় নেই। বাসের মাথায় লেখা আছে চ্যাথাম আয়ল্যাণ্ড। তার মানে বাসটা অন্য কোনও দ্বীপে যাবে! কী করে সমুদ্রের ওপর দিয়ে বাস যায়?

দেশলাইয়ের কারখানাটা পোর্ট ব্লেয়ার শহরের একেবারে এক প্রান্তে, বন্দরের কাছে। সেখানেই বাস থেকে নেমে পড়া হল, সামনেই কারখানার বড় গেট, আর ডান পাশে সমুদ্র।

কারখানার গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে কাকাবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর আপনমনে বললেন, "সন্তুকে এখানে নিয়ে আসা ভুল হয়েছে। ওকে বাংলোতে রেখে এলেই হত!"

সন্তু একটু দুঃখ পেয়েও চুপ করে রইল।

দাশগুপ্ত বলল, "কেন, চলুক না!"

"না, আমরা কারখানায় গিয়ে ম্যানেজার-ট্যানেজারের সঙ্গে কথা বলব, সেখানে ও কী করবে? ছেলেমানুষ, ওর সেখানে থাকা উচিত নয়।"

"তা অবশ্য।"

"সন্তু, তুই আবার এখান থেকে বাস ধরে বাংলোয় ফিরে যেতে পারবি না?"

দাশগুপ্ত বাধা দিয়ে বলল, "না, তার দরকার নেই। ও এখানেই একটু ঘুরে বেড়াক না। আন্দামানে ভয় তো কিছু নেই।"

"ভয়ের কথা বলছি না।"

দাশগুপ্ত সন্তুকে বলল, "তুমি সামনের দিকে একটু এগোলেই একটা ব্রীজ দেখতে পাবে, তার ওপারে চ্যাথাম আয়ল্যান্ড। সেখানটা ঘুরে এসো না!"

কাকাবাবু বললেন, "সেই ভাল, সন্তু, তুই একটু বেড়িয়ে আয় এদিকটা, আবার ঠিক এখানে ফিরে আসবি।"

ওরা কারখানার ভেতরে ঢুকে যাবার পর সন্তু সামনের দিকে এগুলো। একটুখানি যেতেই দেখল বাঁ দিকে সমুদ্রের ওপর একটা কাঠের ব্রীজ। তার ওপারে একটা পুঁচকি দ্বীপ। বড় জোর একটা ফুটবল মাঠের সমান।

ব্রীজটার ওপর পা দিয়ে সন্তুর কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। সমুদ্রের ওপর সেতু! রামায়ণে সেই রাম তাঁর বানর-সৈন্যদের নিয়ে সমুদ্রের ওপর সেতুবন্ধন করেছিলেন। সেই কথা মনে পড়ে যায়। হোক না এটা ছোট সেতু, তবু দুটো দ্বীপের মাঝখানে তো, এবং তলায় আসল সমুদ্র।

জলের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। এখানে জলের রঙ আর ঘন নীল নয়, কাচের বোতলের মতন হালকা সবুজ। তার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে মাছ, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ; অনেক মাছই রঙিন, লাল, সবুজ, হলুদ, ময়ূরকণ্ঠী—মনে হয় গোটা সমুদ্রটাই যেন একটা অ্যাকোয়ারিয়াম! ব্রীজের কাঠের খুঁটির গায়ে-গায়ে লেগে আছে কাঁকড়া—সেগুলোর একটাও সাধারণ কাঁকড়ার মতন খয়েরি নয়, মাছগুলোর মতনই নানা রঙে রঙিন।

সন্তু কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে মাছেদের খেলা দেখছিল, আবার বৃষ্টি এসে গেল। সে দৌড়ে চলে গেল ব্রীজের ওপারে। চ্যাথাম দ্বীপটাতে বড়-বড় গুদাম ভর্তি কাঠ, এক জায়গায় কাঠ চেরাই হচ্ছে। দ্বীপটার অন্যদিকে রয়েছে কয়েকটা বড়-বড় জাহাজ। কোনওটার নাম এস. এস, হরিয়ানা, কোনওটার নাম চলুঙ্গা, কোনওটার নাম গঙ্গা। সেখানে কোনও লোকজন নেই। একটু দূরে দেখা যায় সমুদ্রের ওপর কয়েকটা মাছ-ধরা নৌকো।

সন্তু সবচেয়ে বড় জাহাজটার খুব কাছে গিয়ে সেটার গায়ে হাত বুলোতে লাগল। সে কোনওদিন জাহাজে চাপেনি। ফেরার সময় নিশ্চয়ই জাহাজে করে ফেরা হবে! কিন্তু কবে ফেরা হবে?

হঠাৎ সন্তুর মনে হল, সে অনেক দেরি করে ফেলেছে। কাকাবাবুদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, তার জন্যই দাঁড়িয়ে আছেন। সে তাড়াতাড়ি ব্রীজ পেরিয়ে আবার ফিরে এল ওপারে।

কাকাবাবু আর দাশগুপ্ত ঠিক তখুনি বেরিয়ে এলেন কারখানার গেট দিয়ে। কাকাবাবুর মুখ গম্ভীর থমথমে। ক্রাচের খটখট শব্দ তুলে তিনি এগিয়ে গেলেন সমুদ্রের দিকে। একদম কিনারার কাছে থেমে দূরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা হাত বোলাতে লাগলেন গোঁফের ওপরে।

সন্তু ফিসফিস করে দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করল, "সেই সাহেব দু'জনকে পাওয়া গেছে?"

দাশগুপ্ত মাথা নাড়িয়ে জানাল, "না।"

"তারা এখানে আসেনি তাহলে?"

"উঁহু! গত দু'মাসের মধ্যে এখানকার কেউ বাইরে যায়নি। নতুন কেউ আসেওনি। এখানে মাত্র তিনজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কাজ করে। তাদের দেখলাম, তারা অন্য লোক!"

"তবে সেই সাহেব দু'জন নিশ্চয়ই অন্য কোনও হোটেলে আছে।"

"এখানে সাহেবদের থাকার মতন কোনও হোটেল নেই। ওরা যদি বিদেশি হয়, তাহলে তো আরও মুশকিল! কোনও বিদেশিই আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে এখানে আসতে পারে না!"

দাশগুপ্ত কাকাবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "স্যার, আপনি চিন্তা করবেন না, ওদের ঠিক খুঁজে বার করা যাবে। এইটুকু ছোট জায়গা, এখানে ওরা পালাবে কোথায়?"

কাকাবাবু মুখটা ফিরিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, "এখানে অনেক দ্বীপ আছে, তার যে-কোনও একটাতে গিয়ে লুকিয়ে থাকা তো খুব সোজা!"

"কিন্তু এখানে এসে তাদের লুকিয়ে থেকে কী লাভ? কী আর এমন আছে এখানে?"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর অনেকটা আপনমনেই বললেন, "আছে। কারণ আছে। সেইজন্যই তো আমিও এসেছি এখানে।"

এই সময় চ্যাথাম দ্বীপের পেছন দিক থেকে ভট্‌ভট্‌ শব্দে একটা মোটরবোট বেরিয়ে এল। মোটরবোটটা ছোট, ঠিক একটা হাঙরের মতন দেখতে। সেটা সমুদ্রের জল কেটে খুব জোরে ছুটে যেতে লাগল দূরের দিকে। এতদূর থেকেও সন্তুরা স্পষ্ট দেখতে পেল, সেই বোটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দু'জন সাহেব। কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "দাশগুপ্ত, দাশগুপ্ত, একটা মোটরবোট জোগাড় করতে পারো? এক্ষুনি?"

দাশগুপ্ত অবাক হয়ে বলল, "মোটরবোট? কেন, আপনি কি ওদের তাড়া করবেন নাকি?"

কাকাবাবু অধৈর্য হয়ে প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, "আঃ, জোগাড় করতে পারবে কিনা বলো না! ওরা একবার লুকিয়ে পড়লে আর ওদের খুঁজে পাওয়া যাবে না! এই তো ব্রিজের পাশে একটা খালি মোটরবোট রয়েছে, এটা ব্যবহার করা যায় না?"

দাশগুপ্ত বলল, "না, স্যার! এখানে পুলিশের অনুমতি ছাড়া কেউ বোট চালাতে পারে না। আমি পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে আপনার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারি—"

"সে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে!"

কাকাবাবু হতাশভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সহেবদের মোটরবোট ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। তারপর একটা দ্বীপের আড়ালে বাঁক নিতেই সেটাকে আর দেখা গেল না।

কাকাবাবু নিজের বাঁ হাতের ওপর ডান হাত দিয়ে একটা ঘুঁষি মারলেন। তারপর বললেন, "এটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল যে, ওরা ঠিক লুকোবার চেষ্টা করবে। এখানে লুকিয়ে থাকা খুব সহজ! ওরা যে বোটটা নিয়ে গেল, সেটা কার বোট, কোনও অনুমতি নিয়েছে কিনা—এ খবর জোগাড় করতে পারবে?"

দাশগুপ্ত বলল, "তা পারব। হারবার মাস্টারের কাছেই খোঁজ পাওয়া যাবে।"

"তবে এক্ষুনি সেই খবর নিয়ে এসো।"

দাশগুপ্ত একটুক্ষণ তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু চিন্তা করার সময় লোকটির একটা চোখ ট্যারা হয়ে যায়। ট্যারা চোখে জলের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলল, "এক কাজ করুন, স্যার। আপনি টুরিস্ট হোমে ফিরে যান। ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিন। ততক্ষণে আমি সমস্ত খবর নিয়ে আপনার কাছে আবার যাচ্ছি। দিল্লি থকে আমার কাছে অর্ডার এসেছে আপনাকে সব রকমে সাহায্য করার জন্য। তবে আপনি কোন্ রহস্যের খোঁজে এসেছেন, তা কিন্তু আমি এখনও জানি না।"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "একটু বাদে তুমি যখন টুরিস্ট হোমে আসবে, তখন তোমাকে সব বলব। চলো, সন্তু!"

◀ ৪ ▶

কাছেই একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। বাসের জন্য অপেক্ষা না করে ওরা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।

টুরিস্ট হোমে একটা মস্ত বড় ডাইনিং হল আছে। সকলে সেখানে গিয়েই খাবার-টাবার খায়। দূরের সমুদ্র আর পাহাড় দেখতে দেখতে খাওয়া যায়।

ডাইনিং হলে তখন কয়েকজন লোক বসে ছিল। কাকাবাবু বেশি লোকজন পছন্দ করেন না। তিনি সন্তুকে বললেন, "আমাদের বেয়ারাকে বলে দাও, আমার খাবারটা আমার ঘরে দিয়ে যেতে।"

এই রে, সন্তু আবার বেয়ারাটার নাম ভুলে গেছে। এমন অদ্ভুত নাম, মনে রাখাই যায় না। কী যেন ওর নাম, হুটোপাটি? খিটিমিটি? ঝুমঝুমি? গুংগাগুলা? টুংগাটুলা? ধুৎ! এরকম আবার নাম হয় নাকি কারুর। অথচ এই রকম সব কথাই মনে আসছে। কিড়িমিড়ি? ধাই ধপাস?

সন্তু আবার ডাকতে লাগল, "ইয়ে! এই যে ইয়ে, শুনে যাও তো!"

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল বেয়ারাটি। সন্তু তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নামটা যেন কী বলেছিলে?"

লোকটি এক গাল হাসল। হাসলে তাকে অদ্ভুত দেখায়। কারণ তার একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, অন্য সব দাঁত ধপধপে সাদা, একটা দাঁত সোনালী।

সে বলল, "সাব, আমার নাম কড়কড়ি!"

"কড়কড়ি, ও কড়কড়ি! হ্যাঁ, তাই তো! আচ্ছা কড়কড়ি, তুমি আমাদের খাবারটা আমাদের ঘরে দিয়ে যাও!"

"এখনি দিচ্ছি। সাব, একটা বরিয়া চিজ দেখবেন?"

"কী?"

"আসুন আমার সঙ্গে!"

ডাইনিং হলের ডানপাশে একটা ছোট বাগান। তারপর পাহাড়টা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রে। বাগানের এক কোণে একটা গাছের সঙ্গে একটা অদ্ভুত জন্তু বেঁধে রাখা হয়েছে। সেটা মস্ত বড় একটা কচ্ছপের মতন, কিন্তু গাটা কাঁকড়ার মতন। কড়কড়ি ধরে টানতেই সেটা ক্রোক করে একটা রাগী আওয়াজ বার করল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এটা কী?"

"এটা একটা ক্র্যাব, সাব! ক্র্যাব!"

"ক্র্যাব? তার মানে কাঁকড়া? এত বড়? কাঁকড়া আবার ডাকে নাকি?"

"হাঁ, সাব! আজ এটা রান্না করে আপনাদের খাওয়াব! ক্র্যাব খান তো?"

এ রকম একটা অদ্ভুত জিনিস নিশ্চয়ই কাকাবাবুকে দেখানো উচিত। সন্তু দৌড়ে গিয়ে কাকাবাবুকে ডেকে নিয়ে এল।

কাকাবাবুও চমকে গেলেন। কাছে গিয়ে ঝুঁকে ভাল করে দেখে বললেন, "হুঁ, নাম শুনেছি! এগুলোকে বলে কোকোনাট রবার! এরা নারকোল গাছে উঠে নারকোল ভেঙে খায়, এদের গায়ে এত জোর!"

কড়কড়ি বলল, "হাঁ সাব! এরা কোকোনাট খায়।"

"এটাকে ধরলে কী করে? এদের দাঁড়ায় তো খুব জোর?"

"একটা পাথর দিয়ে মেরে উল্টো করে দিয়েছিলাম?"

"ইস, ছিছি, এরকম একটা প্রাণীকে মারতে আছে? এগুলো খুব রেয়ার, মানে খুব কম পাওয়া যায়। এরকমভাবে মারলে পৃথিবী থেকে একদিন এরা শেষ হয়ে যাবে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু কড়কড়ি বলছে, এটা আজ ও আমাদের রান্না করে খাওয়াবে!"

কাকাবাবু দারুণ আপত্তি করে বললেন, "না, না, না। এটাকে মারা উচিত নয়। এটাকে এক্ষুনি ছেড়ে দাও। তোমাকে আমি পয়সা দিয়ে দেব!"

কড়কড়ি খুব অনিচ্ছার সঙ্গে একটা ছুরি এনে দড়িটা কেটে দিল। কাঁকড়াটা তার গুলিগুলি চোখ দিয়ে ওদের দিকে তাকাল। তারপর পেটের নিচ থেকে বার করল তার দুটো দাঁড়া। প্রায় মানুষের হাতের মতন মোটা।

কাকাবাবু বললেন, "সাবধান, সরে দাঁড়াও, সন্তু! ঐ দাঁড়া দিয়ে একবার চিমটে ধরলে আর কিছুতেই ছাড়ানো যাবে না!"

কাঁকড়াটা দু'বার ক্রোক ক্রোক শব্দ করল। তারপর হঠাৎ একটা মাকড়শার মতন তরতর করে নেমে গেল ঢালু জায়গাটা দিয়ে।

ওরা ফিরে এল নিজেদের ঘরে। খাবার খেয়ে নেবার পর কাকাবাবু তিন-চারখানা বই একসঙ্গে খুলে তার মাঝখানে একটা ম্যাপ বিছিয়ে নিয়ে বসলেন। সন্তুকে বললেন, "তুমি ইচ্ছে করলে এখন একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আসতে পারো।"

সন্তুর একটুও যাবার ইচ্ছে নেই। একটু পরেই দাশগুপ্তবাবু আসবেন, কাকাবাবু তাঁকে বলবেন যে, কোন্ রহস্যের সন্ধানে তিনি এখানে এসেছেন। সেটা সন্তুকে শুনতে হবে না? কাকাবাবু তো নিজের থেকে তাকে কিছুই বলবেন না। সন্তুও টেবিলে একটা বই খুলে বসে রইল।

একটু বাদে হাওয়ার ঝাপটায় কাকাবাবুর ম্যাপটা উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে। সন্তু তাড়াতাড়ি সেটা তুলে কাকাবাবুকে দিতে গেল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ম্যাপ কী করে দেখতে হয় জানো?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, জানি। ম্যাপের ওপর দিকটা সব সময় উত্তর দিক হয়।"

কাকাবাবু হাসলেন। বললেন, "তা তো হয়! এই যে দেখো, ভারতবর্ষের ম্যাপে, নীচের দিকে সমুদ্রের মধ্যে যে দু'-একটা কালির ছিটের মতন থাকে, সেইগুলোই হচ্ছে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। এখানে সেই দ্বীপগুলোরই আলাদা করে বড় ম্যাপ আঁকা হয়েছে। এই যে লম্বা মতন বড় দ্বীপটা দেখছ, সেটা আসলে তিনটে দ্বীপ—এদের নাম হচ্ছে নর্থ আন্দামান, মিডল আন্দামান আর সাউথ আন্দামান। এই দ্যাখো, সাউথ আন্দামানের পেটের কাছে পোর্ট ব্লেয়ার—এইখানে আমরা আছি। আরও কয়েকটা দ্বীপের নাম নীল, হ্যাভলক, রস—এগুলো সব এক-একজন সাহেবের নামে। সাহেবরা আসবার আগে এই দ্বীপগুলো ছিল জলদস্যুদের আড্ডা!"

জলদস্যুদের কথা শুনেই সন্তু চমকে উঠল। জলদস্যু—তার মানেই গুপ্তধন—"ট্রেজার আয়ল্যান্ড" বইটার গল্পের কথা মনে পড়ল। তাহলে কি কাকাবাবু এখানে গুপ্তধনের সন্ধানে এসেছেন? কাকাবাবু সব সময় পুরনো

ইতিহাস-বই পড়তে ভালবাসেন। হয়তো সেই রকম কোনও বইতে এখানকার গুপ্তধনের কথা আছে।

কাকাবাবু বলতে লাগলেন, "এদিককার সমুদ্র দিয়ে যে-সব জাহাজ যেত, জলদস্যুরা হঠাৎ এসে আক্রমণ চালাত সেগুলোর ওপর। একটা পর্তুগীজ জাহাজ তো আগুন দিয়ে পুড়িয়েই দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জলদস্যুদের দমন করার জন্যই ব্রিটিশ সরকার এখানে একটা ঘাঁটি তৈরি করবে ঠিক করল। কিন্তু জলদস্যুরা ছাড়াও এখানে আর-একটা বিপদ ছিল। এই সব দ্বীপগুলোতে তখন ভর্তি ছিল হিংস্র আদিবাসী—বাইরের লোকজন দেখলেই তারা আক্রমণ করত!"

সন্তু আর মনের কথাটা চেপে রাখতে পারল না। হঠাৎ বলে ফেলল, "কাকাবাবু, এখানে গুপ্তধন নেই?"

কাকাবাবু অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকালেন, "গুপ্তধন? কিসের গুপ্তধন?"

"জলদস্যুরা যে অনেক সোনা আর হীরে-মুক্তো লুকিয়ে রাখত দ্বীপের মধ্যে? যদি এখানেও সেরকম রেখে থাকে—তারপর সেই জলদস্যুরা মরে গেছে—সেগুলোর কথা আর কারুর মনে নেই..."

কাকাবাবু হেসে চশমাটা খুললেন। তারপর বললেন, "ওসব তো গল্পের বইতে থাকে—আজকাল কি আর সত্যি সত্যি কেউ গুপ্তধন পায়?"

"আমরা যদি চেষ্টা করে পেয়ে যাই?"

"এমনি-এমনি চেষ্টা করলেই যদি গুপ্তধন পাওয়া যায়—তাহলে তো অনেকেই আগে পেয়ে যেত। শোনো, হঠাৎ টাকা-পয়সা পেয়ে বড়লোক হয়ে যাবার লোভ করতে নেই! টাকা রোজগার করতে হয় নিজে পরিশ্রম করে কিংবা বুদ্ধি খাটিয়ে। যাক ওসব বাজে কথা—শোনো, যা বলছিলাম, এই যে ম্যাপের মধ্যে অনেক ছোট-ছোট ফোঁটা দেখছ, এগুলোও এক-একটা দ্বীপ—আরও অনেক ছোট ছোট দ্বীপ আছে, যা ম্যাপেও নেই—এর মধ্যে অনেক দ্বীপেই মানুষ থাকে না। মানুষ কখনও যায়ও না—শুধু পাহাড় আর জঙ্গল—সেই রকম কোনও একটা দ্বীপে যদি কয়েকজন সাহেব লুকিয়ে থাকে, কেউ তাদের খুঁজে বার করতে পারবে?"

"কিন্তু সাহেবরা সেখানে লুকিয়ে থাকবে কেন? তাদের কী লাভ?"

কাকাবাবু উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দরজার বাইরে কার পায়ের শব্দ হল। কাকাবাবু থেমে গেলেন।

পর্দা সরিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করল, "আসব স্যার?"

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো। বলো কিছু খবর পেলে?

দাশগুপ্তর মুখখানা লালচে হয়ে গেছে। অনেকখানি রাস্তা সে যেন দৌড়ে এসেছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বলল, "বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার! আমরা আজ নিজের চোখে দেখলাম একটা মোটরবোট চ্যাথাম দ্বীপের

পাশ দিয়ে সমুদ্রে চলে গেল, অথচ হারবার মাস্টার বললেন, আজ সকালে কোনও বোটই যায়নি!"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে?"

দাশগুপ্ত একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বলল, "ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। এখানে অনেক রকম মোটরবোট আর স্টিমার আছে। কোনওটা যাত্রী নিয়ে যায়, কোনওটা মালপত্র, কোনওটা মাছ ধরার কিংবা ঝিনুক তোলার—তাছাড়া আছে পুলিশের বোট—সবগুলোর নাম রেজিস্ট্রি করা আছে, কোন্‌টা কোন্‌ সময় ছাড়ে বা ফিরে আসে তা লিখে রাখতে হয়। এখন হারবার মাস্টার বললেন, আজ খুব সকালে একটা শুধু যাত্রী-জাহাজ ছেড়েছে, আর কোনও বোটই ছাড়েনি। এমন কী, অন্য সব বোট কোন্‌টা এখন কোথায় আছে, তারও হিসেব মিলে যাচ্ছে। সুতরাং সকাল আটটার সময় আর কোনও বোট যেতেই পারে না।"

কাকাবাবু রেগে উঠে বললেন, "যেতেই পারে না মানে? তাহলে যেটা দেখলাম, সেটা কী?"

দাশগুপ্ত বলল, "আমিও তো সেই কথাই বললাম। আপনি দেখেছেন, আমি দেখেছি, সন্তু দেখেছে, আরও কয়েকজন দেখেছে। তাহলে বলতে হবে, একটা আলাদা মোটরবোট বেশি ছিল এখানে, যার খোঁজ কেউ রাখে না। সেটা কী করে সম্ভব?"

কাকাবাবু বললেন, "খুবই সহজে সম্ভব। ঠিক আর-একটা মোটরবোটের মতন একই রকম চেহারা করে আর নাম লিখে কেউ একটা জাল বোট রেখেছিল এখানে। সেই জাল বোটটাই সাহেবদের নিয়ে পালিয়েছে। তুমি পুলিশকে এ খবর জানিয়েছ?"

"হ্যাঁ, স্যার, জানিয়েছি। পুলিশ আপনার কাছেও আসবে। স্যার, পুলিশ আপনার পরিচয়টাও জানতে চাইছিল!"

কাকাবাবু একটা চুরুট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "আমার পরিচয় বিশেষ কিছু নেই। আমি এক সময় ভারত সরকারের একটা চাকরি করতাম। একটা দুর্ঘটনায় আমার একটা পা নষ্ট হয়ে যাবার পর আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু তারপর শুধু খেয়ে আর শুয়ে দিন কাটিয়ে দিই না। আমি কিছু-কিছু রহস্য সমাধানের চেষ্টা করি। এগুলো সাধারণ খুনটুনের সমস্যা নয়। পৃথিবীতে এমন কতকগুলো রহস্যময় ব্যাপার আছে, যার সমাধান মানুষ এখনও করতে পারেনি। যেমন ধরো, সাংহাইয়ের বাজারে অনেকদিন আগে একটা লোক নানারকম জড়িবুটি, পশুপাখির হাড়, শেকড়বাকড় এই সব বিক্রি করত। একবার তার দোকানে দুটো দাঁত পাওয়া গেল, যে-দুটো মানুষের দাঁত ছাড়া অন্য কারুর হতেই পারে না। কিন্তু সেই দাঁত দুটো ছিল এক ইঞ্চি করে লম্বা। অত বড় দাঁত আজ পর্যন্ত কেউ কোনও মানুষের দেখেনি। অন্তত দশ-বারো ফুট লম্বা মানুষের অত বড় দাঁত থাকতে পারে। অত লম্বা মানুষ

কি কখনও পৃথিবীতে ছিল? সব বৈজ্ঞানিকই বলছেন, মানুষ অত লম্বা কিছুতেই হতে পারে না। তাহলে দাঁত দুটো কোথা থেকে এল? দাঁত দুটো তো ভেজাল নয়—অনেক পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সে-দুটি খাঁটি মানুষের দাঁত। এই দাঁতের রহস্যের মীমাংসা আজও হয়নি!"

দাশগুপ্তর মুখখানা হাঁ হয়ে গেছে, তার সব কটা দাঁত দেখা যাচ্ছে, একটা চোখও ট্যারা হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে, সে খুবই অবাক হয়ে গেছে। সাহেব আর মোটরবোটের সঙ্গে এক ইঞ্চি লম্বা দুটো দাঁতের যে কী সম্পর্ক সে বুঝতেই পারছে না। সন্তুও বুঝতে পারেনি।

কাকাবাবু আবার বললেন, "দক্ষিণ আমেরিকার একটা জায়গায় কতকগুলো বিরাট বিরাট পাথরের বল আছে। বলগুলো কত বড় জানো? একটা মানুষের চেয়েও বড়—সেই একটা বল এই ঘরের দরজা দিয়েও ঢুকবে না—বলগুলো পাথরের হলেও নিখুঁত গোল আর চকচকে—সেগুলো মাঠেঘাটে ছড়ানো আছে—এখন রহস্য হচ্ছে, কে বা কারা অত বড় বড় বল তৈরি করেছিল, কেনই বা করেছিল? ঐ রকম বল দিয়ে তো আর ফুটবল খেলা যায় না! মানুষ এর রহস্যটা আজও জানতে পারেনি! তারপর ধরো, সম্রাট কণিষ্কের মূর্তিতে কেন মুণ্ডুটা নেই, কোথাও তার মুখের কোনও ছবি নেই কেন, সেটাও একটা রহস্য। আমি এরকম রহস্য সমাধানের চেষ্টা করি। কিছু একটা টের পেলে আমি ভারত সরকারকে চিঠি লিখে জানাই—সরকার তখন আমাকে নানা রকম সাহায্য দেয়। এ-সব কথা তোমাকে বললাম বটে, তবে তুমি বেশি লোককে আমার কথা জানিও না।"

কাকাবাবু একটু থেমে আবার চুরুট টানতে লাগলেন। দাশগুপ্ত আর সন্তু দারুণ কৌতূহলীভাবে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

কাকাবাবু বললেন, "এবার তোমরা জানতে চাইতে পারো, এখানে আমি কোন্ রহস্য সমাধানের জন্য এসেছি! এজন্য আন্দামানের ইতিহাসটা একটু জানা দরকার। ইংরেজরা মাত্র শ'দেড়েক বছর আগে এখানে এসেছিল বটে, কিন্তু তারও অনেক আগে অনেকের লেখায় এই দ্বীপের উল্লেখ আছে। এমন-কী, প্রায় দেড় হাজার বছর আগে একজন ভ্রমণকারী এই দ্বীপগুলোর পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আন্দামানের নাম দিয়েছিলেন 'সোনার দ্বীপ'। আরও অনেকে এটাকে সোনার দ্বীপ বলেছে। কেন? এ-দ্বীপগুলোর কোথাও তো সোনা পাওয়া যায় না? তবু সোনার দ্বীপ নাম দেওয়া হয়েছিল কেন? তারপর ধরো, এই দ্বীপের যে আদিবাসী, তাদের মাথার চুল নিগ্রোদের মতন কোঁকড়া কোঁকড়া। এটাই বা কী করে হল? ভারত কিংবা বর্মা কিংবা ইন্দোনেশিয়া—যেগুলো এর কাছাকাছি দেশ, সেখানকার লোকদের মাথার চুল তো এরকম নয়! তাহলে এই লোকগুলো এল কোথা থেকে? এটা রহস্য নয়?"

দাশগুপ্ত আস্তে আস্তে বলল, "তা বটে। এগুলো রহস্যই বটে।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু আমি এ-সব রহস্য সমাধানের জন্যও আসিনি! আমি এসেছি অন্য কারণে!"

কাকাবাবু উঠে গিয়ে সুটকেস থেকে একটা ফাইল আনলেন। তার মধ্যে অনেক পুরনো খবরের কাগজের পাতা কেটে-কেটে জমিয়ে রাখা আছে। সেগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে তিনি বললেন, "এই যে দ্যাখো, এটা অনেকদিন আগেকার কথা, উনিশশো পঁচিশ সাল, তার মানে একান্ন বছর আগে, ডক্টর স্পিরনভ নামে একজন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। তারপর তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কেউ আর তাঁর খোঁজ পায়নি। অনেকের ধারণা, তিনি জলে ডুবে মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর দেহটাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি খুব নামকরা লোক ছিলেন। তারপর দ্যাখো এটা—উনিশশো সাঁইত্রিশ সাল—পোলাণ্ড থেকে এসেছিলেন দু'জন বৈজ্ঞানিক, তাঁদের মধ্যে একজনের নাম শুধু কাগজে ছাপা হয়েছিল, মিঃ জারজেসকি আর তাঁর সঙ্গী, এঁরাও দু'জনে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তারপর উনিশশো একচল্লিশ সালে আবার রাশিয়া থেকে এলেন অধ্যাপক জুসকভ, ইনিও নিরুদ্দেশ। এঁর বেলায় খুব হৈ চৈ হয়েছিল। জাহাজ নিয়ে সমুদ্রেও খোঁজাখুঁজি হয়েছিল। তবু পাওয়া যায়নি। এরপর উনিশশো তিপান্ন সালে আবার দু'জন, সাতান্ন সালে একজন, উনিশশো চৌষট্টি সালে একসঙ্গে তিনজন বৈজ্ঞানিক উধাও হয়ে যান। পুরনো খবরের কাগজ থেকে আমি এগুলো বার করেছি। কেন একসঙ্গে এতগুলো বৈজ্ঞানিক এই জায়গায় এসে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে?"

দাশগুপ্ত তাড়াতাড়ি বলল, "স্যার, এর দু-একটা ঘটনা আমিও শুনেছি। তবে এ-রহস্যের মীমাংসা করা তো শক্ত নয়। এ-সব ব্যাপার তো পুলিশও জানে। আপনি জারোয়াদের কথা শুনেছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "শুনেছি।"

"আন্দামানের দ্বীপগুলোতে পাঁচ ধরনের আদিবাসী ছিল এক সময়। এর মধ্যে অন্যেরা শান্ত হয়ে গেলেও দুটো জাত খুবই হিংস্র। এরা হচ্ছে সেন্টিনেলিজ আর জারোয়া। সেন্টিনেলিজরা থাকে অনেক দূরে, আলাদা একটা দ্বীপে। জাবোয়ারা কিন্তু কাছেই থাকে—দক্ষিণ আর মধ্য আন্দামানের গভীর বনের মধ্যে। এই জারোয়ারা সাঙ্ঘাতিক হিংস্র; সভ্যলোক দেখলেই খুন করে। সাধারণ লোক কেউ ওদের এলাকায় যায় না। সাহেবদের তো সাহস বেশি হয়, তারা ঐ জঙ্গলে ঢুকেছে আর জারোয়াদের বিষ-মাখানো তীর খেয়ে মরেছে! এ তো খুব সোজা ব্যাপার। ভেবে দেখুন স্যার, জারোয়ারা এমন দুর্দান্ত যে, পুলিশ পর্যন্ত ওদের ধার ঘেঁষে না। এমন-কী, ওদের সংখ্যা যে কত তা গোনা পর্যন্ত যায়নি।"

কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, "না, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। কয়েকটা লোক

খুন হয়েছে বা নিরুদ্দেশ হয়েছে, সে খোঁজ নিতেও আমি আসিনি। সে তো পুলিশের কাজ। রহস্য হচ্ছে, এইসব বৈজ্ঞানিকরা এখানে এসেছিল কেন? প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু বৈজ্ঞানিক এখানে এসেছে খুন হবার জন্য বা নিরুদ্দেশ হবার জন্য? বৈজ্ঞানিকরা এত বোকা হয় না। তারা এসেছিল নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্যটা যে কী, তা এখনও জানা যায়নি। আমি এসেছি সেটা জানতে।"

দাশগুপ্ত চেঁচিয়ে বলে উঠল, "তাহলে এই যে সাহেব দুটো—"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এবার ঠিক ধরেছ। এই সাহেব দুটোরও নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে। শুধু এই দু'জন কেন, আমার ধারণা আরও কয়েকজন এসেছে এর মধ্যে, তারা কোথাও লুকিয়ে আছে।"

ফাইলটা মুড়ে রেখে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের জন্য লঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে?"

দাশগুপ্ত বলল, "হ্যাঁ, স্যার লঞ্চ রেডি। আপনি যখন খুশি ব্যবহার করতে পারেন।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলো! আমি এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে চাই।"

◀ ৫ ▶

তীরের কাছে সমুদ্রের জল খানিকটা ফিকে নীল আর সবুজে মেশানো, একটু দূরে গেলেই গাঢ় নীল। দূরে দূরে দু-একটা ছোট-ছোট দ্বীপ দেখা যায়। একটু পরেই মোটরবোটটা গভীর সমুদ্রে পড়ল।

মোটরবোটটা ছোট, কিন্তু খুব জোরে যায়। বিরাট-বিরাট ঢেউয়ের ওপর দিয়েও অনায়াসে চলে যাচ্ছে। শঙ্করনারায়ণ নামে একজন সেই বোটটা চালাচ্ছে, তার সঙ্গে রয়েছে আরও দু'জন লোক।

সন্তু ভেবেছিল, সমুদ্রের ওপর দিয়ে মোটরবোটে চেপে যেতে তার দারুণ লাগবে। তার বন্ধুদের মধ্যে কারুর তো এরকম অভিজ্ঞতা হয়নি কখনও। কিন্তু খানিকটা পরেই তার আর ভাল লাগল না। কী রকম মাথা ঘুরতে লাগল, পেটের মধ্যে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, তার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। সন্তু নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। বেড়াতে এসে এরকম তো কখনও হয় না তার।

সমুদ্র দেখতে একঘেয়ে লাগছে, একসময় সে শুয়ে পড়ল কাঠের বেঞ্চের ওপর। কাকাবাবু সামনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে ছিলেন, একবার পিছন ফিরে সন্তুকে শুয়ে থাকতে দেখেই তিনি উঠে এলেন। কাছে এসে বললেন, "কী সন্তু, শরীর খারাপ লাগছে?"

সন্তু লজ্জিতভাবে বলল, "না, না, এই এমনি একটু শুয়ে আছি।"

তাড়াতাড়ি সে উঠে বসার চেষ্টা করল, তার ভয় হল, তার শরীর খারাপ দেখলে কাকাবাবু যদি তাকে ডাকবাংলোয় রেখে আসার কথা বলেন!

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মাথা ঘুরছে? পেট ব্যথা করছে?"

সন্তু উত্তর দেবার আগেই দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করল, "ও বুঝি আগে কখনও সমুদ্রে আসেনি?"

"না।"

"তাহলে তো সী সিকনেস হবেই। এত বড় বড় ঢেউ..."

"দেখি, আমার কাছে বোধহয় ট্যাবলেট আছে।"

কাকাবাবু তাঁর বড় চামড়ার ব্যাগ হাতড়ে দুটো ট্যাবলেট বার করলেন। ঐ ব্যাগটার মধ্যে অনেক কিছু থাকে। এমন-কী, কাঁচি, গুলিসুতো, আঠার শিশি পর্যন্ত সন্তু দেখেছে।

কাকাবাবু বললেন, "এই ট্যাবলেট দুটো খেয়ে নাও সন্তু। তারপর শুয়ে থাকো। যদি বমি পায় বমি করে ফেলবে, লজ্জার কিছু নেই।"

সন্তুর সত্যি একটু-একটু বমি পাচ্ছিল। কিন্তু অতি কষ্টে চেপে রইল। পেটের মধ্যেও যেন সমুদ্রের ঢেউ ওঠা-নামা করছে।

সন্তু এক সময় ঘুমিয়েই পড়েছিল, হঠাৎ দাশগুপ্তের চিৎকারে জেগে উঠল। দাশগুপ্ত বলল, "ঐ দেখুন, ঐ দেখুন!"

সন্তু ধড়মড় করে উঠে বসে বলল "কী? কী?"

দাশগুপ্ত সমুদ্রের মাঝখানে একদিকে আঙুল তুলে বলল, "ঐ যে, দেখতে পাচ্ছ?"

সন্তু দেখল, "একটু দূরে জলের মধ্যে একটা খয়েরী তিনকোনা জিনিস উঁচু হয়ে আছে।"

"কী ওটা?"

"হাঙর। ঐ দ্যাখো আর একটা!"

"হাঙর ঐ রকম দেখতে?"

"ঐটুকু তো শুধু পাখনা। বাকি হাঙরটা জলের নিচে আছে।"

ক্রমে দশ-বারোটা হাঙরের পিঠের পাখনা দেখা গেল। দাশগুপ্ত সন্তুকে ভয় দেখিয়ে বলল, "দেখেছ তো? এখানে একবার জলে পড়লে আর বাঁচবার উপায় নেই। হাঙরগুলো এক মিনিটে শেষ করে দেবে।"

কাকাবাবু একটা দূরবীন চোখে লাগিয়ে বসে ছিলেন। খানিকটা দূরেই একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। তিনি দাশগুপ্তকে একটু ধমক দিয়ে বললেন, "হঠাৎ ওরকম ভাবে চেঁচিয়ে উঠো না। আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি কোনও মানুষজন দেখতে পেয়েছ!"

দাশগুপ্ত আবার চুপ করে গেল।

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে দ্বীপগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলোতে নামা যায়?"

দাশগুপ্ত বলল, "না, স্যার, জেটি না থাকলে নামবেন কী করে? বেশি কাছে গেলে বোট তো বালিতে আটকে যাবে!"

"একেবারে কাছে না গিয়ে যদি খানিকটা দূরে বোট দাঁড় করিয়ে জলে নেমে পড়া যায়?"

দাশগুপ্ত একেবারে আঁতকে উঠল। চোখ দুটো টলগুলির মতন গোল গোল করে বলল, "না, না, তা কখনও হয়? এখানে যেখানে-সেখানে জলে নামতে যাবেন না। তাহলেই হাঙর এসে একেবারে কঁ্যাচ করে পা কেটে নিয়ে যাবে!"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, সার, সত্যি কথা! একবার আমাদের চেনা একজনের পা কেটে নিয়েছিল।"

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, "আমার তো একটা পা এমনিতেই অকেজো হয়ে আছে। হাঙর কি মানুষের দুটো পা-ই কেটে নিয়ে যায়? সব সময় তো শুনি ওরা মানুষের এক পা কাটে, আর এক পা রেখে যায়।"

দাশগুপ্ত মজাটা বুঝল না। সে তখনও ভয় পাওয়া গলায় বলল, "ওসব চিন্তা ছাড়ুন। আপনি কি দুশোটা দ্বীপের প্রত্যেকটাতেই নেমে নেমে দেখতে চান? সে তো অসম্ভব ব্যাপার!"

"এই দ্বীপে মানুষ থাকতে পারে?"

"কী করে পারবে? খাবার জল কোথায়? সমুদ্রের জল তো খাবার উপায় নেই। চারিদিকে এত জল, দেখে দেখে চিত্ত মোর হয়েছে বিকল। এই সব দ্বীপে কেউ দু'দিন থাকলে জল তেষ্টাতেই শুকিয়ে মরবে!"

"তাহলে যে-সব দ্বীপে মানুষ থাকে, সেখানে কীভাবে জল পাওয়া যায়?"

"সে তো ঝরনার জল! যে-সব দ্বীপে বড় পাহাড় আছে, সেখানে ঝরনাও আছে। খুব মিষ্টি জল।"

কাকাবাবু শুধু বললেন, "হুঁ!"

মোটরবোটটা এবার মূল সমুদ্র ছেড়ে খাঁড়িতে ঢুকল। খাঁড়ি মানে, দু'-পাশে দ্বীপ, তার মাঝখান দিয়ে সমুদ্রের রাস্তা। দু'-পাশের দ্বীপগুলো দারুণ ঘন জঙ্গলে ভরা, এক-একটা গাছ প্রকাণ্ড লম্বা—তার গায়ে লতাপাতায় ফুটে আছে নানারকম ফুল। এ-সব জায়গায় একটা গাছও চেনা গাছের মতন নয়।

দাশগুপ্ত ফিসফিস করে সন্তুকে বলল, "তাকিয়ে থাকো, একটু পরেই কুমির দেখতে পাবে।"

সন্তু বলল, "কুমির? জলের মধ্যে ভেসে উঠবে?"

"না। দেখবে পাশের বালির চড়ায় রোদ পোহাচ্ছে। লঞ্চের আওয়াজ শুনেই ঝুপঝাপ করে জলে লাফিয়ে পড়বে।"

সন্তু একেবারে ঝুঁকে পড়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

দাশগুপ্ত বলল, "আজ যদি ভাগ্যে থাকে, তাহলে সাদা কুমিরও দেখতে পাবে!"

কাকাবাবু আবার মুখ ফেরালেন। দাশগুপ্তকে বললেন, "কী বাজে কথা বলছ? সাদা কুমির আবার হয় নাকি?"

"হ্যাঁ, স্যার হয়। মাঝে মাঝে দেখা যায়! একবার একটা বিরাট তিমিমাছও এসে পড়েছিল নিকোবরের দিকে। তার কঙ্কালটা রাখা আছে পোর্ট ব্লেয়ারে। আর কুমির আর হাঙরের যা লড়াই বাধে না, স্যার, সে একটা দেখার মতন জিনিস!"

কাকাবাবু হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে বললেন, "মানুষ! ঐ যে মানুষ দেখা যাচ্ছে!"

সন্তু কুমির দেখলে যতটা উত্তেজিত হত, কাকাবাবু মানুষ দেখে তার থেকে বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। সত্যি দেখা গেল বনের মধ্যে দুটি খাঁকি প্যান্ট পরা লোক ভেতর দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

দাশগুপ্ত কিন্তু বেশি উত্তেজিত হল না। বলল, "হ্যাঁ, এদিকে বন বিভাগের কিছু লোক কাঠ কাটতে আসে। কিন্তু ওদের শুধু বাঁ দিকেই দেখতে পাবেন। ডান দিকে পাবেন না!"

"কেন?"

"এই দিকের জঙ্গালে কারুর নামা নিষেধ। এই দিকের জঙ্গালেই জারোয়ারা থাকে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "জারোয়া কী?"

"এই রে, এর মধ্যে ভুলে গেলে? তখন বললাম যে! জারোয়া হচ্ছে খুব হিংস্র একটা জাত। তারা জামাকাপড় পরে না, তারা বিষাক্ত তীর মারে—আমাদের মতন লোক দেখলেই তারা খুন করতে চায়।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে এখান দিয়ে মোটরবোট কিংবা স্টিমার যায়—এর ওপর তারা তীর মারে না? হঠাৎ যদি তীর ছুঁড়তে শুরু করে?"

দাশগুপ্ত বলল, "সেই জন্যই দেখবেন, একটু পরে-পরে পুলিশের ক্যাম্প বসানো আছে—পুলিশ ওদের সমুদ্রের ধারে আসতে দেয় না। ওদের দেখলেই গুলির আওয়াজ করে ভয় দেখায়। ওরা বন্দুককে খুব ভয় করে!"

সন্তু বলল, "ওদের বন্দুক নেই বুঝি?"

"বন্দুক কী বলছ, ওরা আগুন জ্বালাতেই জানে না! ওরা লোহার ছুরিও ব্যবহার করতে জানে না। ওদের যে তীর, তার ডগায় লোহা নেই, এমনিই সরু বাঁশের তীর—কিন্তু সেগুলোতে সাঙ্ঘাতিক বিষ মাখানো থাকে। অনেক সময় সমুদ্রতে শিশি

বোতল ভেসে-ভেসে আসে তো, সেই বোতল ভেঙে ওরা কাচের ছুরি বানায়। কিংবা ঝিনুক বা পাথরের ছুরিও আছে। তবে শুনেছি, ওরা মাঝে মাঝে এদিকে এসে লোহা চুরি করারও চেষ্টা করে। সেই লোহা ঘষে ঘষে ধারালো অস্ত্র বানাচ্ছে।"

কাকাবাবু খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "জারোয়ারা যেখানে থাকে, সেখানে কোনও সভ্য মানুষ ঢোকেনি এ পর্যন্ত?"

"কার বুকের এত পাটা আছে বলুন? ওখানে ঢুকলে কেউ প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারে না। চলুন না, একটু দূরে একটা জায়গা আপনাকে দেখাচ্ছি।"

"তাহলে একথা মনে করা যেতে পারে যে, যে-সব বৈজ্ঞানিক আগে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তারা এ-জায়গাতেই যাবার চেষ্টা করেছিল?"

"তা হতে পারে!"

"এখানে যে সাহেবদের দেখেছিলাম, তারাও তো এখানে আসবার চেষ্টা করতে পারে। কারণ তাদের কাছে নিশ্চয়ই বন্দুক-পিস্তল আছে!"

"সেটা কিন্তু বলা শক্ত। মাত্র দু'-তিনজন সাহেব বন্দুক পিস্তল নিয়েও এখানে এসে কী করবে? পাঁচ-ছশো হিংস্র জারোয়া যদি তাদের ঘিরে ধরে—"

"এই দ্বীপের উল্টো দিকেও তো সমুদ্র, সেখানে যাওয়া যায় না?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যায়। তবে সেদিকে পুলিশ-পাহারা নেই। জারোয়ারা একেবারে তীরের কাছে যখন-তখন চলে আসে—"

"আমি সেদিকে একবার যেতে চাই।"

দাশগুপ্ত আবার অবাক হয়ে বলল, "এখন?"

কাকাবাবু জোর দিয়ে বললেন, "কেন, এখন যাওয়া যায় না?"

"তাহলে স্যার বড্ড দেরি হয়ে যাবে যে? আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে!"

"খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হবার কিছু নেই।"

"তা হলেও—মানে, এই বোটের শুধু এদিক দিয়ে যাওয়ারই পুলিশ-পারমিশান আছে। অন্য দিক দিয়ে যাবার জন্য আবার আলাদা করে অনুমতি নিতে হবে। চলুন না। দেখি যদি রঙ্গাত্ থেকে সেই অনুমতি জোগাড় করা যায়। ফেরার পথে না হয়—"

দাশগুপ্ত আর একটু থেমে কাচুমাচুভাবে বলল, "একটা কথা স্যার, ঐ জারোয়াদের মধ্যে যাবেন না! আপনি যে রহস্যের কথা বলছিলেন, তা কি শুধু ঐ জায়গাতেই আছে? তাহলে সে রহস্য যেমন আছে, থাক না! কেন শুধু-শুধু প্রাণটা দিতে যাবেন!"

কাকাবাবু বললেন, "সব মানুষ তো এক রকম হয় না? কেউ কেউ ভাবে,

সব যেমন চলছে তেমন চলুক। পুরনো জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করার কী দরকার? আর কোনও-কোনও লোক একটা জিনিস একবার ধরলে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না। এই রহস্যটা যদি আমি বুঝতে না পারি, তাহলে কোনওদিন আমার রাত্তিরে ঘুম হবে না।"

"কিন্তু স্যার, ওখানে গেলে যে আমাদের প্রাণটাও যাবে!"

"তোমাদের কারুর যাবার দরকার নেই।"

"তা কখনও হয়? গভর্নমেণ্ট থেকে আমার ওপর হুকুম হয়েছে, সব সময় আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে। আপনাকে সব রকম সাহায্য করতে।"

"তাহলে গভর্নমেণ্ট তো তোমাকে খুব বিপদে ফেলেছে দেখছি?"

"না স্যার, আমি তো আপনাদের সাহায্য করতেই চাই। আপনি তো এদিককার ব্যাপার সব জানেন না!"

"আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?"

"ঐ যে বললাম, রঙ্গাত্। এদিককার বেশ বড় জায়গা। আমি ওয়ারলেসে আমাদের আসবার কথা জানিয়ে দিয়েছি। জেটিতে জিপগাড়ি রাখা থাকবে। ওখানে খুব সুন্দর ডাকবাংলো আছে, পাহাড়ের ওপরে—"

"সেখানে পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে?"

"তিনটের মধ্যে পৌঁছে যাব। রঙ্গাত্ থেকে আরও অনেক জায়গায় যাওয়া যায়। আপনি যদি চান, আমরা মায়াবন্দরের দিকেও যেতে পারি। আমার কী মনে হয় জানেন? ঐ সাহেবগুলো মায়াবন্দরে থাকেত পারে!"

"কেন?"

"মায়াবন্দর খুব সুন্দর জায়গা। সাহেব-মেমরা খুব পছন্দ করে।"

"সে তো যারা বেড়াতে আসে! এই সাহেবরা এখানে বেড়াতে এসেছে, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই, তাহলে তারা এত লুকোচুরি করত না!"

একটুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল। মোটরবোটের গুটগুট শব্দ শুধু শোনা যায়। খাঁড়ির সমুদ্রে ঢেউ বেশি নেই। দু'পাশেই দেয়ালের মতন জঙ্গল।

সন্তু কুমির দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। এক সময় সত্যিই দেখা পেল। দুটো কুমির বালির ওপরে শুয়ে ছিল। ঠিক যেন দুটো পোড়া কাঠ। বোটের শব্দ শুনে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। তারপর খুব একটা ভয় না-পেয়ে আস্তে আস্তে জলে নামল।

সন্তু বলল, "ঐ যে! ঐ যে কুমির!"

দাশগুপ্ত একটু অবহেলার সঙ্গে বলল, "এ দুটো তেমন বড় নয়! আরও বড় আছে। এইটাই কিন্তু সেই জায়গা!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কোন্ জায়গা?"

"সেই যে বলেছিলাম দেখাব! এ জায়গাটার বালির রঙ দেখছ কেমন সোনালী সোনালী? অরণ্যদেবের গল্পে সোনা-বেলার কথা পড়েছ তো?"

"এই সেই সোনা-বেলা নাকি? তাহলে সেই জেড পাথরের ঘর কোথায়?"

"না, এটা সোনা-বেলা নয়। তবে এখানকার বালি খুব মিহি আর সোনালী রঙের। অনেকের ধারণা ওখানে বালির মধ্যে সোনা মিশে আছে।"

"না, না। গভর্নমেন্ট থেকে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, সে রকম কিছু নেই। তবু লোকের লোভ হয়। ওদিকে তো যাওয়া নিষেধ—তাও একদিন রাত্তিরবেলা তিনজন লোক ওদিকে বালি নেবার জন্য নেমেছিল। তিনটে বস্তায় বালি ভরেছে, এমন সময় পেছন থেকে জারোয়ারা আক্রমণ করে। দুটো ছেলেকে তক্ষুনি মেরে ফেলে—আর একটি ছেলে একজন জারোয়ার পেটে ছুরি মেরে নিজেকে কোনও রকমে ছাড়িয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জারোয়ারা সাঁতার জানে না—তাই জলে নামে না। সেই ছেলেটিও আহত হয়েছিল, সেই অবস্থায় সমুদ্রে ভাসতে থাকে। তার ভাগ্য ভাল, তাকে হাঙরে কুমিরে ধরেনি—বারো ঘণ্টা বাদে ছেলেটিকে একটা পুলিশের বোট উদ্ধার করে। তারপর তার পাগলের মতন অবস্থা। তারপর থেকে সে অনবরত চেঁচিয়ে বলে, জারোয়া! ঐ যে জারোয়া!"

গল্প বলার সময় ঝোঁকের মাথায় দাঁড়িয়ে উঠে নিজেই সেই ছেলেটিকে নকল করে বলতে থাকে, "জারোয়া! ঐ যে জারোয়া!"

সন্তু হাঁ করে ঘটনাটা শুনছিল। কিন্তু কাকাবাবু হঠাৎ দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি সেই ছেলেটিকে কখনও দেখেছ? নিজের চোখে?"

দাশগুপ্ত থতমত খেয়ে বলল, "তা দেখিনি। তবে সবাই এটা জানে!"

কাকাবাবু বললেন, "গল্প! এ-সব বানানো গল্প!"

"না স্যার, আপনি রঙ্গাতে গিয়ে যাকে খুশি জজ্ঞেস করবেন।"

"আমি লক্ষ্য করেছি তুমি বড্ড গল্প বানাও।"

দাশগুপ্ত এর পর একেবারেই চুপ করে গেল।

তিনটের সময় বোট এসে ভিড়ল রঙ্গাতে। জেটি থেকে উঠে এসে বাইরের রাস্তায় দেখা গেল সত্যি একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। আরও আট-ন মাইল যেতে হবে।

সন্তু গিয়ে জিপে উঠে বসেছে। কাকাবাবু জিপে উঠতে গিয়েও থেমে গিয়ে বললেন, "আমার চশমাটা বোটে ফেলে এসেছি!"

দাশগুপ্ত বলল, "আমি নিয়ে আসছি!"

"না, আমিই আনছি!"

কাকাবাবু ক্রাচ খট-খট করে নিজেই এগিয়ে গেলেন জেটির দিকে।

তারপর একটু বাদে মোটরবোটটার ইঞ্জিনের ঘট্‌ঘট্‌ আওয়াজ সোনা গেল। দাশগুপ্ত চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে বোটটা ছেড়ে গেল যে! কাকাবাবু গেলেন কোথায়?"

সন্তু তাড়াতাড়ি ছুটে এল জেটির কাছে। মোটরবোটটা সাঁ করে জল কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দাশগুপ্ত তার পাশে এসে বলল, "সর্বনাশের ব্যাপার! মোটরবোটটা আপনা-আপনি চলতে লাগল নাকি? তাহলে কি হবে? শঙ্করনারায়ণ শঙ্করনারায়ণ?"

বোটের চালক শঙ্করনারায়ণও বোটটার দিকে তাকিয়ে দেখছে। লোকটি খুব কম কথা বলে। এবার সে বলল, "বোট কখনও আপনা-আপনি চলে! ওটা তো উনি চালাচ্ছেন।"

দাশগুপ্তর চোখ ট্যারা আর মুখ হাঁ হয়ে গেছে। সে ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "উনি নিজে বোট চালাচ্ছেন? তাহলে উনি নিশ্চয় একলা-একলা জারোয়াদের কাছে যেতে চান। উঃ, কী গোঁয়ার লোক রে বাবা! জারোয়ারা ওঁকে মেরে ফেলবেই। আমি গভর্নমেণ্টকে কী জানাব?"

মোটরবোটটা এখনও দেখা যাচ্ছে। সন্তু চিৎকার করে ডেকে উঠল, "কাকাবাবু! কাকাবাবু!"

দাশগুপ্তও চ্যাঁচাল, "মিঃ রায়চৌধুরী।"

শঙ্করনারায়ণ গম্ভীরভাবে বলল, "উনি বেশি দূর যেতে পারবেন না। বোটে ডিজেল নেই। আমি এখান থেকে ডিজেল নেব ঠিক করেছিলাম।"

দাশগুপ্ত বলল, "অ্যাঁ? ডিজেল নেই? থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ শঙ্করনারায়ণ! তবে তো উনি আর জারোয়াদের জঙ্গলে যেতে পারবেন না!"

মোটরবোটটা কিন্তু ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সন্তু ভাবল, মোটরবোটটার ডিজেল যদি ফুরিয়ে যায়, তাহলে কাকাবাবু মাঝ-সমুদ্রে একা-একা ভাসবেন? বোটে তো খাবার-দাবার কিচ্ছু নেই!

দাশগুপ্ত বলল, "উঃ, কী ডানপিটে লোক বাবা। তাও তো একটা পা অচল। দুটো পা থাকলে আরও কী করতেন কে জানে। আচ্ছা, সন্তু, ওঁর একটা পা কাটল কী করে?"

"আফগানিস্তানে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।"

"ওরে বাবা, উনি আফগানিস্তানেও গিয়েছিলেন?"

শঙ্করনারায়ণ জেটির সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গিয়ে বালির চড়া ধরে দৌড়তে লাগল। দূরে এক জায়গায় কয়েকটা মোটরবোট রয়েছে। ওর মধ্যে কোনওটা মাছ ধরার, কোনওটা মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার। একটু বাদেই শঙ্করনারায়ণ একটা বোট চালিয়ে নিয়ে এল জেটির পাশে। তারপর বলল, "আপনারা একজন কেউ আসুন।"

দাশগুপ্ত বলল, "আমি যাচ্ছি। তুমি একটু থাকো, সন্তু।"

সন্তু সে কথা শুনল না। সে লাফিয়ে গিয়ে মোটরবোটে উঠল।

শঙ্করনারায়ণ এত জোরে বোটটা চালিয়ে দিল যে, ওরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল আর একটু হলে। সবাই শক্ত করে ধরে রাখল রেলিং।

একটু বাদেই আগের মোটরবোটটা দেখা গেল। সেটা এদিক-ওদিক এঁকে-বেঁকে যাচ্ছে। কাকাবাবু ভাল চালাতে পারছেন না। দাশগুপ্ত এদিক থেকে আবার চ্যাঁচাতে লাগল, "মিঃ রায়চৌধুরী, মিঃ রায়চৌধুরী!"

খানিকক্ষণ দুই বোটে পাল্লা চলল। কাকাবাবু থামতে চান না। তারপর হঠাৎ এক সময় কাকাবাবুর বোটটা থেমে গেল। মোটরবোট যখন সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলে, তখন তার একটা বেশ তেজী ভাব থাকে। থেমে গেলেই কী রকম যেন অসহায় দেখায়। ঠিক যেন একটা মোচার খোলা।

শঙ্করনারায়ণ প্রথমে এই বোটটা নিয়ে কাকাবাবুর বোটের চারপাশে বোঁ বোঁ করে ঘুরল কয়েকবার। তারপর একবার কাছাকাছি এসে একটা দড়ি নিয়ে ঐ বোটে লাফিয়ে পড়ল।

পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েও কাকাবাবুর কিন্তু লজ্জা নেই। বরং মুখে একটা রাগ-রাগ ভাব। কেউ কিছু বলার আগেই তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "এই বোটটা হঠাৎ আপনা-আপনি থেমে গেল কেন?"

শঙ্করনারায়ণ বলল, "তেল নেই আর!"

কাকাবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "কেন, তেল থাকে না কেন?"

দাশগুপ্ত বলল, "স্যার, আপনি এটা কী করছিলেন? এ-রকম পাগলামি করার কোনও মানে হয়? ওদিকে রঙ্গাতে সবাই আমাদের জন্য খাবার-দাবার নিয়ে বসে আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি এখানে খেতে আসিনি। একটা কাজ করতে এসেছি।"

"কিন্তু কাজ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না! কাজ মানে তো ঐ সাহেবগুলোকে খোঁজা? ওরা আর যাবে কোথায়?"

"আমি একটুও সময় নষ্ট করতে চাই না।"

"কিন্তু স্যার, আপনাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। আপনি ঐ জারোয়া-ল্যাণ্ডে যেতে পারবেন না। অর্ডার ছাড়া আমি কিছুতেই আপনাকে ওখানে যেতে দিতে পারি না।"

"অর্ডারটা দেবে কে?"

"পুলিশের এস পি সাহেবের কাছ থেকে অর্ডার আনতে হবে। তাও তিনি পারমিশান দেবেন কিনা সন্দেহ। কয়েকজন সাহেব ছবি তোলবার জন্য এসেছিল, তাও দেওয়া হয়নি।"

কাকাবাবু আর কোনও কথা না-বলে এই বোটে উঠে এলেন। ঐ বোটটাকে দাড়ি দিয়ে বাঁধা হল, তারপর দুটোই চলল একসঙ্গো।

তারপর জেটিতে পৌঁছে ওরা বোট থেকে নেমে জিপে উঠলেন, বেশ চওড়া বাঁধানো রাস্তা, দু'পাশে বড় বড় গাছ, কিন্তু মানুষজন বা বাড়িঘর বিশেষ দেখাই যায় না। এটাও একটা দ্বীপের মধ্যে, কিন্তু দু' পাশের ঘন জঙ্গল দেখে সে-কথা আর মনে থাকে না।

◀ ৬ ▶

আধ ঘন্টার মধ্যেই রঙ্গাতে পৌঁছানো গেল। দাশগুপ্ত বলেছিল, রঙ্গাত বেশ বড় জায়গা। আসলে একটা ছোট্ট গ্রামের চেয়েও ছোট। কয়েকটা দোকান, দু-তিনটে হোটেল আর কিছু বাড়িঘর। যে-কোনও বাড়ির পেছনেই নিবিড় বন।

রঙ্গাতের ডাকবাংলো একটা উঁচু পাহাড়ের ওপরে। রাস্তাটা এমন খাড়া যে, জিপটা ওঠবার সময় রীতিমতন গোঁগোঁ শব্দ করছে। যে-দিকে তাকানো যায়, শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল।

বাংলোটা অবশ্য বেশ সুন্দর। দোতলা বাড়ি, বড় বড় কাচের জানলা, সামনে সুন্দর ছোট্ট একটা ফুলের বাগান। দোতলার জানলার সামনে দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত পাহাড় আর বন দেখা যায়—এখান থেকে আর সমুদ্র দেখা যায় না। এখানকার জঙ্গল এত দেখা যায়—এখান থেকে আর সমুদ্র দেখা যায় না। এখানকার জঙ্গল এত ঘন যে আফ্রিকার কথা মনে পড়ে যায়—গল্পের বইতে যে-রকম জঙ্গালের কথা আমরা পড়েছি।

রান্না তৈরিই ছিল। ভাত, বড় বড় চিংড়ি মাছ ভাজা আর হরিণের মাংস। বাংলোর চৌকিদার খুব দুঃখ করে বলল, সে কিছুতেই পাঁঠার মাংস জোগাড় করতে পারেনি, তাই বাধ্য হয়ে হরিণের মাংস রেঁধেছে। সন্তু তো অবাক! পাঁঠার মাংস তো সে কতই খেয়েছে—কিন্তু হরিণের মাংস খাওয়াই দারুণ ব্যাপার। এখানে হরিণের মাংস খুবই শস্তা, এমন-কী, এক-একদিন বিনা পয়সাতেও পাওয়া যায়। মাছ তো শস্তাই। এখানে সবচেয়ে দামি জিনিস তরকারি। অনেক লোক তিন-চার বছরের মধ্যে ফুলকপি চোখেই দেখেননি।

কাকাবাবু দারুণ গম্ভীর, কারুর সঙ্গে কোনও কথা বলছেন না। সন্তু কাকাবাবুর এই স্বভাবটা জানে। অনেক লোক শুধু নিজের বাড়ির লোকজন কিংবা টাকাপয়সা নিয়ে চিন্তা করেন। কিন্তু কাকাবাবু এমন সব জিনিস নিয়ে চিন্তা করেন, যার সঙ্গে তাঁর নিজের কোনওসম্পর্কই নেই। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বৈজ্ঞানিকেরা এসে আন্দামানে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে, এজন্য কাকাবাবুর রাত্তিরে ঘুম হবে না কেন? কত লোক তো তবুও ঘুমোয়!

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত সন্তু শুনতে পেল, কাকাবাবু একা-একা বারান্দায়

পায়চারি করছেন। বারান্দাটা কাঠের। সেখানে কাকাবাবুর ক্রাচের শব্দ হচ্ছে ঠক্ ঠক্ ঠক্।

সকালবেলা দাশগুপ্ত বলল, "স্যার, জিপ রেডি! কখন বেরুবেন?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাব?"

"যেখানে আপনার খুশি। এখানে কত বেড়াবার জায়গা আছে! চিত্রকূট যাবেন?"

"আমি এখানে বেড়াতে আসিনি, দাশগুপ্ত!"

চিত্রকূট নামটা শুনে সন্তুর খুব কৌতূহল হল। চিত্রকূট নামটা তো রামায়ণ বইতে আছে। এখানেও একটা চিত্রকূট আছে নাকি? জায়গাটা কেমন?

দাশগুপ্ত এক গাল হেসে বলল, "স্যার, কাজ তো আছেই! তবু এত দূর এসে একটু বেড়াবেন না? এখানে ভাল-ভাল জায়গা আছে। মায়াবন্দর যাবেন? চমৎকার জায়গা! আর যদি ডিগলিপুর যেতে চান, তাও ব্যবস্থা করা যায়। হরিণের পাল আর কুমির দেখতে হলে ডিগলিপুর যেতে হয়! যাবেন?"

সন্তুর কাছে মায়াবন্দর নামটাও খুব সুন্দর লাগল। সত্যিই এ-রকম নামের কোনও জায়গা আছে? জায়গাটা কি যখন-তখন বদলে যায়?

কাকাবাবু কড়া সুরে বললেন, "আমি কোথাও যেতে চাই না। আমি আজই ফিরে যেতে চাই।"

দাশগুপ্ত হতাশভাবে বলল, "আজই ফিরে যাবেন? একটা দিন থেকে গেলে হত না?"

"না! শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে। এখানে আমাকে এনেছ কেন? আমি কি জায়গা দেখতে এসেছি? আজই ফিরে গিয়ে এস পি-র সঙ্গে দেখা করে অনুমতি নিয়ে নাও, যাতে আমি যে-কোনও জায়গায় যেতে পারি। এস পি যদি অনুমতি না দেন, তাহলে আমাকে দিল্লিতে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে!"

দাশগুপ্তর নিজেরই আসলে খুব বেড়াবার ইচ্ছে। বোঝা যায়, লোকটি আসলে খুব বেড়াতে ভালবাসে। তার মুখ দেখলে আরও বোঝা যায়, কাকাবাবুর কথা তার একটুও পছন্দ হয়নি। কাকাবাবুর দিল্লিতে টেলিগ্রাম পাঠাবার কথা শুনে সে আরও ভয় পেয়েছে।

সকালবেলায় চা-জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়া হল। আবার জিপে করে সেই বন্দর পর্যন্ত যাওয়া। কাকাবাবু আগাগোড়া মুখ বুজে রইলেন। জেটিতে গিয়ে মোটরবোটে ওঠার সময় শুধু বোট-চালককে একবার প্রশ্ন করলেন, "ভাল করে তেল ভরে নেওয়া হয়েছে তো? আবার কোথাও এটা থেমে যাবে না?"

এই প্রথম শঙ্করনারায়ণকে হাসতে দেখল সন্তু। সে বলল, "না, স্যার, থামবে না। আশা করছি, ঘন্টা চারেকের মধ্যে পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছে যাব।"

"ঠিক আছে, চলো!"

আশ্চর্যের ব্যাপার, মোটরবোটটা ছাড়বার পরই কাকাবাবু চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লেন। আসবার সময় তিনি চারদিক দেখতে-দেখতে আসছিলেন, কিন্তু এখন আর তাঁর কোনও আগ্রহই নেই।

সন্তু কিন্তু খুব আগ্রহের সঙ্গে চোখ মেলে রইল। এবার তার পেট ব্যথা হচ্ছে না কিংবা বমিও পাচ্ছে না। আসবার সময় সে শুধু ডান দিকটা দেখেছিল, এবার বসল বাঁ দিকে। যদি আবার কুমির কিংবা হাঙর দেখা যায়।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ওরা সেই জায়গাটায় এসে গেল, যেখানে জারোয়ারা থাকে। সেই বালির চড়াটাও দেখা গেল, যেটার নাম দাশগুপ্ত বলেছিল সোনা-বেলা। এখানকার বালিতে নাকি সোনা মিশে আছে।

ভুল হচ্ছে কিনা মিলিয়ে দেখবার জন্য সন্তু দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করল, "এইটা সেই জায়গা নয়? যেখানে কয়েকটা ছেলে নেমেছিল, আর জারোয়ারা হঠাৎ এসে আক্রমণ করল?"

দাশগুপ্ত বলল, "হ্যাঁ, ঠিক চিনেছ!"

তারপর দাশগুপ্ত ফিসফিস করে বলল, "তোমাকে তখন আমি ঘটনাটা বললাম, আর তোমার কাকাবাবু বিশ্বাস করলেন না। উনি ভাবলেন আমি বানিয়ে বলেছি! আমি কিন্তু ঠিকই বলেছিলাম। জারোয়ারা এমন হিংস্র—"

কাকাবাবু এই সময় চোখ মেলে বললেন, "আমি এখনও তোমার কথা বিশ্বাস করি না!"

তার মানে কাকাবাবু সব শুনছিলেন? সজাগই ছিলেন উনি!

কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হুকুমের সুরে বললেন, "বোট ঘোরাও! আমি ওই বালির চরে নামব!"

দাশগুপ্ত বলল, "সে কী? অসম্ভব! আপনাকে কিছুতেই নামতে দেব না, স্যার! আপনাকে বললাম না, অর্ডার ছাড়া এখানে নামা যায় না। আপনি কি প্রাণটা খোয়াতে চান?"

কাকাবাবু হঠাৎ এবার কোটের পকেট থেকে তাঁর রিভলভারটা বার করলেন। তারপর সেটা উঁচু করে তুলে বললেন, "আমি যা বলছি, তাই শুনতে হবে! বোট ঘোরাও!"

কাকাবাবু খট্ খট্ করে এসে শঙ্করনারায়ণের ঘাড়ের কাছে রিভলভারটা চেপে ধরে বললেন, "শঙ্করনারায়ণ, তুমি খুব ভাল ছেলে, আমার কথা শুনে চলো! নইলে, তোমাকে আহত করে আমি নিজেই বোট ঘোরাব!"

শঙ্করনারায়ণ একটাও কথা উচ্চারণ না করে খাঁড়ির ডান দিকে মোটরবোট ঘোরাল।

সেটা বালির চরে এসে থামবার পর কাকাবাবু নিজেই ক্রাচ নিয়ে অতি কষ্টে

নামলেন। হাতব্যাগটাও নিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "তোমরা সবাই ফিরে যাও! আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না।"

দাশগুপ্ত হাত জোড় করে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনি কেন এখানে যাচ্ছেন? আপনার রহস্য সমাধান করার জন্য এ ছাড়া আর কোনও জায়গা কি নেই?"

কাকাবাবু বললেন, "তার কারণ, অন্য সব জায়গায় গভর্নমেন্টের লোকেরা কখনও-না-কখনও যায়। সেখানে অদ্ভুত কিছু থাকলে এতদিনে জানা যেত! শুধু এই জায়গাটাতেই আর কেউ আসে না। সুতরাং কিছু রহস্য থাকলে এখানেই আছে। তোমরা ফিরে যাও। এস পি-কে বলে কালকে কিছু লোকজন নিয়ে আবার ফিরে এসো আমার জন্য।"

তিনি এবার সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সন্তু, তুমিও যাও, পোর্ট ব্লেয়ারে আমার জন্য অপেক্ষা করো।"

দাশগুপ্ত বলল, "ওরে বাবা, যে-কোনও মুহূর্তে জারোয়ারা তীর মারতে পারে।"

কাকাবাবু রিভলভারটা উঁচু করে বললেন, "তোমাদের আর তো থাকবার দরকার নেই। তোমরা যাও!"

সঙ্গে-সঙ্গে মোটরবোটটা চলতে শুরু করল।

কিন্তু সন্তু কিছুতেই কাকাবাবুকে ছেড়ে যাবে না। সে মোটরবোট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

বোটের চালক শঙ্করনারায়ণ আর একটুও দেরি করল না। সে বোটটা চালিয়ে দিল গভীর সমুদ্রের দিকে।

দাশগুপ্ত পাগলের মতন লাফাতে লাগল। সে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। "এ কি? এ কি? আমরা ওদের ফেলে চলে যাব নাকি? আমার তাহলে চাকরি যাবে! পাইলট, কোথায় চলে যাচ্ছ?"

শঙ্করনারায়ণ গম্ভীরভাবে বলল, "বসে পড়ুন! বসে পড়ুন! গায়ে তীর লাগতে পারে!"

"অ্যাঁ?"

দাশগুপ্ত ধপাস করে বোটের মধ্যে শুয়ে পড়ল।

শঙ্করনারায়ণ বলল, "সবাই মিলে একসঙ্গে মরে যাওয়ার কোনও মানে আছে? আমরা ওখানে আর একটুক্ষণ থাকলেই জারোয়ারা তীর মারত!"

"কিন্তু ওদের কী হবে?"

"মিঃ রায়চৌধুরীর কাছে রিভলবার আছে। তিনি গুলি ছুঁড়ে ভয় দেখিয়ে জারোয়াদের আটকাবার চেষ্টা করতে পারেন। পারবেন কিনা জানি না! আমাদের

উচিত পুলিশের এস পি সাহেবকে সব কিছু জানানো। তারপর পুলিশ নিয়ে এসে যদি ওঁদের বাঁচানো যায়...”

মোটরবোটটা অনেক দূর চলে এসেছে। এখন দ্বীপের সেই জায়গাটা দেখা যায় না। শুধু দেখা যায় জঙ্গল। ওর মধ্যে বিষাক্ত তীর নিয়ে লুকিয়ে আছে জারোয়ারা। ওখানে বাইরের লোক যে একবার গেছে সে আর ফেরেনি!

দাশগুপ্ত ফোঁস ফোঁস করে দুটো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর তার এমনই দুঃখ হল যে, চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

◀ ৭ ▶

পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছতে-পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। এস পি সাহেব অফিসে নেই। দাশগুপ্ত তক্ষুনি ছুটল তাঁর বাড়িতে। সেখানে গিয়েও এক দারুণ খারাপ খবর শুনল। এস পি সাহেব এইমাত্র লিট্‌ল আন্দামান রওনা হয়ে গেছেন।

দাশগুপ্ত হতাশ হয়ে মাটিতে বসে পড়ছিল, কিন্তু এস পি সাহেবের আর্দালি বলল, “সাহেব এই মাত্র বেরিয়েছেন, এখনও বোধহয় জেটিতে গেলে তাঁকে ধরতে পারবেন।”

দাশগুপ্ত আবার দৌড়ল জেটির দিকে। দূর থেকে দেখল, এস পি-র নিজস্ব মোটরবোট তখনও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে ছাড়বে। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সে চ্যাঁচাতে লাগল, “দাঁড়াও, দাঁড়াও! পাইলট, বোট ছেড়ো না!”

কোনও রকমে জেটিতে এসে সে লাফিয়ে মোটরবোটের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

এস পি সাহেবের মোটরবোটটা শুধু তাঁর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য। ভেতরে তাঁর বসবার জায়গাটা সিংহাসনের মতন, লাল ভেলভেট দিয়ে মোড়া। এস পি সাহেবের চেহারাটাও দারুণ। টকটকে ফর্সা রঙ, বিশাল মোটা গোঁফ মিশে গেছে তাঁর লম্বা জুলফির সঙ্গো। অনেকটা হরতনের গোলামের মতন মুখ। কোমরে চওড়া বেল্টে গোঁজা রিভলবার, পায়ে কালো জুতো চকচক করছে। তিনি পা ছড়িয়ে বসে চোখ বুজে ছিলেন।

দাশগুপ্ত ধড়াম করে লাফিয়ে পড়তেই তিনি চোখ মেলে কটমট করে তাকালেন। হুংকার দিয়ে বললেন, “এখানে লাফালাফি করছ কেন? সার্কাস দেখাতে এসেছ?”

দাশগুপ্ত বলল, “স্যার, সর্বনাশ হয়ে গেছে!”

“কিসের সর্বনাশ? তোমার তো রোজই একটা করে সর্বনাশ হয়!”

“না, স্যার! সেই যে মিঃ রায়চৌধুরী, যিনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের চিঠি নিয়ে এসেছিলেন, তিনি জারোয়াদের জঙ্গালে নেমে গেছেন!”

"কী?"

এস পি সাহেব এবার সোজা হয়ে বসলেন। এমনভাবে দাশগুপ্তর দিকে তাকালেন যেন ওকে একেবারে পুড়িয়ে ছাই করে দেবেন।

"তুমি সঙ্গে ছিলে, তাও উনি নেমে গেলেন কী করে?"

দাশগুপ্ত হাত জোড় করে বলল, "স্যার, আমার দোষ নেই, আমি অনেক বারণ করেছিলুম, উনি কিছুতেই শুনলেন না। জোর করে নেমে গেলেন।"

"কতক্ষণ আগে?"

"প্রায় তিন ঘণ্টা আগে।"

"তাহলে দেখো গিয়ে, এতক্ষণে তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসছে। লোকটা কি পাগল না রাম-বোকা? লোকটা তো রোগা আর এক পা খোঁড়া, ওকে জোর করে আটকে রাখতে পারলে না?"

"স্যার, ওঁর কাছে রিভলভার আছে।"

এস পি সাহেব আবার আঁতকে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, "রিভলবার? কে দিয়েছে? কার হুকুমে রিভলবার নিয়ে গেছে?"

"জানি না। আগেই ওঁর কাছে ছিল!"

"ছি ছি ছি ছি! এখন যদি একটাও জারোয়াকে গুলি করে মারে, তা হলে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে! জারোয়াদের মারা বারণ, তা জানো না?"

"তা তো জানি। কিন্তু উনি যে কথা শুনলেন না!"

"বাঘ-সিংহই শিকার করা বন্ধ হয়ে গেছে। আর উনি কি মানুষ-শিকারে গেছেন? ইচ্ছেমতন জারোয়াদের গুলি করে মারবেন?"

"উনি গেছেন সেই রহস্যের সন্ধানে।"

"চুলোয় যাক রহস্য! জারোয়ারা আপনমনে নিজেদের দ্বীপে আছে, কে ওনাকে বলেছে, সেখানে গিয়ে তাদের বিরক্ত করতে? রিভলভার থাকলেও উনি বেশিক্ষণ বাঁচতে পারবেন না। নিজে তো মরবেনই, আমাদেরও চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে!"

"এখন কী উপায় হবে, স্যার?"

"যাও, শিগগির প্রীতম সিংকে খবর দাও!"

মোটরবোটটা ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছিল। এস পি সাহেবের হুকুমে সেটা এসে আবার জেটিতে ভিড়ল। একজন গার্ড ছুটে গেল প্রীতম সিংকে ডেকে আনার জন্য।

প্রীতম সিং ছিলেন পুলিশের একজন ইন্সপেক্টর। এখন রিটায়ার করে পোর্ট ব্লেয়ারেই বাড়ি বানিয়ে আছেন। একমাত্র এই প্রীতম সিং-ই কয়েকবার জারোয়াদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তিনি জারোয়াদের ভাষাও জানেন। জারোয়ারা অন্য সবাইকে দেখলেই মারতে আসে, শুধু প্রীতম সিংকে কিছু বলে না।

আন্দামানে আদিবাসীদের সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে বলে গভর্নমেন্ট নানাভাবে সাহায্য করে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান। পুলিশের লোক গিয়ে মাঝে-মাঝে ওদের দ্বীপে নানারকম খাবার রেখে আসে। ভাত, চিনি, গুঁড়ো দুধ, নানারকম ফল। পুলিশের চলে যাবার খানিকক্ষণ পর জারোয়ারা এসে সেইসব নিয়ে যায়। তাদের জামা-কাপড় পরাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু জামা-কাপড় রেখে এলে তারা নেয় না, শুধু তারা পছন্দ করে লাল কাপড়। লাল কাপড় নিয়ে তারা কী করে কে জানে! জারোয়াদের কিন্তু খুব আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে। তারা ঐ সব জিনিস এমনি-এমনি নেয় না। অবশ্য ঐ সব খাবার-দাবার আর লাল কাপড়ের বদলে টাকা-পয়সা তারা দিতে পারে না, কিন্তু অনেকখানি শুয়োর আর হরিণের মাংস ঐ জায়গায় রেখে যায় পুলিশদের জন্য।

প্রীতম সিং-এর দারুণ সাহস। একবার তিনি একা ঐ খাবারের বস্তার মধ্যে লুকিয়ে বসেছিলেন একদম ন্যাংটো হয়ে। জারোয়ারা কাছে আসতেই তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে হাত উঁচু করে দাঁড়ালেন। তার মানে তিনি আগেই দেখিয়ে দিলেন যে, তাঁর কাছে বন্দুক পিস্তল নেই, আর জারোয়াদের যেমন গায়ে পোশাক নেই, তেমনি তিনিও কোনও জামা-কাপড় পরেননি। জারোয়ারা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। তাঁকে মারেনি।

তারপর থেকে আস্তে-আস্তে তাঁর সঙ্গে জারোয়াদের ভাব হয়ে যায়। তিনি নিজেই কয়েকবার খাবার নিয়ে গেছেন। এর পরে তিনি জামা-কাপড় পরে গেলেও জারোয়ারা তাঁকে অবিশ্বাস করেনি। এখন অবশ্য তিনি বুড়ো। এখন আর পুলিশের কেউ জারোয়াদের কাছে যেতে সাহস করে না। প্রীতম সিং এই কিছুদিন আগেও জারোয়াদের কাছে একবার গিয়েছিলেন। রঘুবীর সিং নামে একজন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার যখন এখানে ছবি তুলতে আসেন, তখন প্রীতম সিং-ই তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন জারোয়াদের দ্বীপে। প্রীতম সিং সঙ্গে ছিলেন বলেই জারোয়ারা সেই ফটোগ্রাফারকে মারেনি।

একটু বাদেই প্রীতম সিং সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দাড়ি, গোঁফ, চুল সব সাদা। কিন্তু এখনও খাঁকি প্যান্ট সার্ট পরতে ভালবাসেন। সব ঘটনা শুনে তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "খুবই চিন্তার কথা। ঐ সাহেবকে বাঁচানো খুবই শক্ত। যদি না এতক্ষণে মরে গিয়ে থাকেন!"

দাশগুপ্ত বলল, "ওঁর কাছে তো রিভলবার আছে। চট্ করে মারতে পারবে না।"

প্রীতম সিং বললেন, "আপনি জানেন না। জারোয়ারা একদম মরতে ভয় পায় না। একজনকে মারলে অমনি আর একজন এগিয়ে আসে। ওরা যদি চারদিক থেকে তীর-ধনুক নিয়ে এগিয়ে আসে, তাহলে উনি একা রিভলভার দিয়েই বা কী করবেন?"

দাশগুপ্ত বলল, "তবু এক্ষুনি আমাদের যাওয়া দরকার। একবার চেষ্টা করা উচিত অন্তত।"

প্রীতম সিং বললেন, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হবেন না। বাঙালি ভদ্রলোক যদি এখনও সমুদ্রের ধারে লুকিয়ে থাকতে পারেন, তাহলে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে একবার ঢুকে পড়লে আর উপায় নেই। জারোয়াদের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল বটে, কিন্তু খাতির হয়নি। ওরা খুব কম কথা বলে। ওদের ভাষাতেই মোট তিরিশ-চল্লিশটার বেশি শব্দ নেই। ওরা আমাকে মাটিতে দাগ কেটে দেখিয়ে বলেছিল, আমি যেন তার ওপাশে কক্ষনো না যাই! বনের ভেতরে আমাকে কোনওদিন যেতে দেয়নি। আমার মনে হয়, ওদের মধ্যে একজন এমন-কেউ আছে, যার খুব বুদ্ধি, তার কথাই ওরা মেনে চলে। একটা কিছু জিজ্ঞেস করলে ওরা সেদিন তার উত্তর না দিয়ে পরের বার দিত। আমি অনুরোধ করেছিলাম, একবার ওদের সারা দ্বীপটা ঘুরে দেখার জন্য। ঐ দ্বীপের ভেতরে তো সভ্য মানুষ কেউ যায়নি, ওখানে কী আছে, কেউ জানে না। কিন্তু পরের দিন এসে বলেছিল, না, যাওয়া চলবে না। সেদিনই মাটিতে দাগ কেটে সীমা টেনে দেয়।"

দাশগুপ্ত বলল, "আমরা সঙ্গে পুলিশ নিয়ে যাব। আপনি শুধু ওদের বুঝিয়ে বলবেন যে, আমরা ওদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আসিনি।"

"আমার সে-কথা ওরা শুনবে না! এ রকম চেষ্টা কি আগে হয়নি? অনেকবার হয়েছে। কোনও লাভ হয়নি। একবার কী হয়েছিল শুনবেন?"

প্রীতম সিং এস পি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "স্যার, আপনি তখন এখানে আসেননি। সে-সময় এস পি ছিলেন মিঃ ভার্মা। তাঁর কথা মতন পুলিশরা ফাঁদ পেতে তিনজন জারোয়াকে ধরে ফেলে। জ্যান্ত অবস্থায়। তারপর তাদের হাত পা শিকলে বেঁধে নিয়ে আসা হল। পোর্ট ব্লেয়ারে এনে তাদের শিকল খুলে দিয়ে খুব আদর-যত্ন করা হল। খাওয়ানো হল ভাল-ভাল খাবার। হেলিকপটারে চাপিয়ে তাদের দ্বীপ আর অন্যসব দ্বীপ দেখিয়ে আনা হল। অর্থাৎ তাদের বোঝানো হল যে, আমরা তাদের শত্রু নই, আমরা তাদের মারতে চাই না—তাদের দ্বীপটাই শুধু পৃথিবী নয়—বাইরে আরও কত জায়গা আছে, কতরকম মানুষ আছে। তিনদিন বাদে তাদের ফিরিয়ে দিয়ে আসা হল তাদের দ্বীপে—যাতে তারা গিয়ে অন্যদের বলতে পারে যে, সভ্য লোকরা তাদের মারেনি, বরং আদর করেছে। এরপর কী হল বলতে পারেন?"

এস পি সাহেব বললেন, "হ্যাঁ, আমি শুনেছি ঘটনাটা। পরদিন দেখা গেল সেই তিনজন জারোয়ার মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসছে।"

প্রীতম সিং বললেন, "অন্য জারোয়ারা তাদের মেরে ফেলেছে। তারা মনে করে,

সভ্য লোকদের ছোঁয়া লেগে ঐ তিনজন অপবিত্র হয়ে গেছে। তাহলেই বুঝুন, ওরা কতটা ঘেন্না করে আমাদের।"

দাশগুপ্ত বলল, "তবে কি আমরা কিছুই করব না! এখানে চুপ করে বসে থাকব?"

এস পি বললেন, "উনি একটা বয়স্ক লোক। নিজে যদি ইচ্ছে করে সেখানে যেতে চান, তাহলে নিজেই তার ঠ্যালা বুঝবেন! আমাদের কী করার আছে?"

"তা বলে আমরা লোকটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করব না? আমার কাছে দিল্লি থেকে অর্ডার এসেছে, ওঁকে সবরকমভাবে সাহায্য করার। স্যার, এক্ষুনি চলুন পুলিশ ফোর্স নিয়ে!"

এস পি সাহেব বললেন, "তারপর জারোয়ারা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়বে, সেগুলো কি আমরা খেয়ে হজম করে ফেলব?"

প্রীতম সিং বললেন, "বনের মধ্যে ওরা কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। তাহলে লড়াই লেগে যাবে।"

দাশগুপ্ত বলল, "দরকার হলে আমাদের গুলি চালাতে হবেই, উপায় কী?"

এস পি সাহেব বললেন, "আমরা শুধু-শুধু ওদের মারব? কেন, ঐ ভদ্রলোককে কে ওখানে যেতে বলেছিল? সারা পৃথিবীতে রটে যাবে যে, আমরা আমাদের আদিবাসীদের গুলি করে মারি।"

প্রীতম সিং মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "বাঙালি ছাড়া এমন উদ্ভট শখ আর কারুর হয় না। জারোয়াদের গুলি করে মারা আমিও সমর্থন করি না।"

দাশগুপ্ত এস পি সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরে বলল, "স্যার, একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে!"

এস পি সাহেব বললেন, "আমাকে তাহলে দিল্লিতে হোম সেক্রেটারির কাছে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। গভর্নমেন্টের হুকুম ছাড়া আমি কিছু করতে পারব না।"

"কিন্তু স্যার, দিল্লি থেকে হুকুম আসতে অন্তত একদিন লেগে যাবে।"

এস পি সাহেব বললেন, "একদিন অপেক্ষা করতেই হবে। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।"

দাশগুপ্ত প্রায় কান্না-কান্না গলায় বলল, "ওঁর সঙ্গে সেই ছোট ছেলেটিও আছে। হায়, হায়, এতক্ষণে ওদের কী হয়েছে, কি জানি!"

◀ ৮ ▶

এদিকে সন্তু জলে লাফিয়ে পড়ার পরই ভাবল, তাকে কুমিরে ধরবে। সে ভাল সাঁতার জানে। কিন্তু সাঁতার কাটতে হল না। সমুদ্রের একটা বড় ঢেউ তাকে পাড়ে এনে পৌঁছে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠেই চলে এল একটা গাছের আড়ালে।

আর-একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর চাপা গলায় বললেন, "তুমি বোকার মতন জলে লাফিয়ে পড়লে কেন? তোমাকে পোর্ট ব্রেয়ারে চলে যেতে বললুম না?"

সন্তু বলল, "তুমি কেন এলে?"

"আমি এসেছি, বেশ করেছি। আমি বুড়ো মানুষ, কোনও একটা বড় কাজের জন্য যদি আমি মরেও যাই তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ, তোমার মাকে আমি বলে এসেছি তোমার কোনও বিপদ হবে না।"

"মা আমাকে বলে দিয়েছিলেন, সব সময় তোমার কাছাকাছি থাকতে!"

"আঃ! তুমি এমন গণ্ডগোল বাধালে! যাক গে, তুমি আমার পেছনে এসে দাঁড়াও! একটুও নড়বে না। কোনও শব্দ করবে না!"

দু'জনে খানিকক্ষণ কান খাড়া করে রইল। কোথাও কোনও শব্দ নেই। বোধহয় জারোয়ারা এখনও তাদের আসার ব্যাপারটা টের পায়নি। সামনে থেকেই শুরু হয়ে গেছে ঘন জঙ্গল। ফাঁক নেই একটুও। এত ঘন জঙ্গালের মধ্যে গায়ে তীর লাগবার খুব ভয় নেই। একটু দূর থেকে তীর ছুঁড়লে কোনও না কোনও গাছে আটকে যাবে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরা বুঝতে পারল কাছাকাছি কোনও জারোয়া নেই। তখন পা টিপে-টিপে ওরা জঙ্গালের মধ্যে এগোতে লাগল। পায়ের তলার মাটি ভিজে স্যাঁতসেঁতে। গাছ থেকে খসে পড়া অসংখ্য পাতা পচে নরম হয়ে আছে। এখানে যখন-তখন বৃষ্টি হয়।

কাকাবাবু ভাবছেন, সমুদ্রের ধার থেকে যত দূরে সরে যাওয়া যায়, ততই ভাল। এতবড় জঙ্গালের মধ্যে জারোয়ারা তাঁদের চট্ করে খুঁজে পাবে না। জঙ্গালের মধ্যে দিনের বেলাতেও অন্ধকার।

কাকাবাবুর ক্রাচটা হঠাৎ এক জায়গায় নরম মাটিতে গেঁথে গেল। তিনি সেটা টেনে তুলতে গিয়ে তাল সামলাতে পারলেন না, পড়ে গেলেন হুমড়ি খেয়ে। সন্তু তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরল। তারপর সে নিজেই ক্রাচটা উপড়ে তুলল কাদা থেকে।

সন্তু ভাবল, কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়ে সব জায়গায় চলাফেরা করতে পারেন না। এই রকম জঙ্গালের মধ্যে তো আরও অসুবিধে। তবু তিনি সন্তুর ওপর রাগারাগি করছিলেন। ভাগ্যিস সন্তু জোর করে চলে এসেছে!

কাকাবাবু একটা গাছে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। সন্তু একটুখানি এগিয়ে দেখতে গেল। সব সময় গা-টা শিরশির করছে। দাশগুপ্ত বলেছিল, এখানকার জঙ্গাল এত গভীর হলেও বাঘ-সিংহের কোনও ভয় নেই। সবচেয়ে বেশি ভয় মানুষের! সন্তুর খালি মনে হচ্ছে, কাছেই কারা যেন লুকিয়ে থেকে তাকে দেখছে। যে-কোনও মুহূর্তে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সন্তু ওপরের দিকে মুখ তুলে দেখতে লাগল, কোনও গাছের ওপর কেউ বসে আছে কি না। অবশ্য এখানকার গাছে ওঠা সহজ নয়। প্রায় সব কটা গাছই বিরাট-বিরাট লম্বা। প্রথম দিকে অনেকখানি উঠে গেছে সোজা হয়ে, কোনও ডালপালা নেই, মাথার কাছটা প্রকাণ্ড ছাতার মতন। এক-একটা গাছের বয়স বোধহয় দু'শো তিনশো বছর। গায়ে শ্যাওলা ধরে গেছে।

হটাৎ দূরে একটা ছরছর শব্দ হল। ভয়ে কেঁপে উঠল সন্তু। কারা যেন ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড়ে আসছে। এইবার তাহলে আসছে জারোয়ারা। আর উপায় নেই। সন্তুও ছুটে গিয়ে দাঁড়াল কাকাবাবুর পাশে। কাকাবাবুও আওয়াজটা শুনেছেন। তিনি সন্তুকে ধরে এনে দাঁড়ালেন দুটো বড় গাছের ফাঁকে। হাতে রিভলবার।

একটু বাদেই ওদের খানিকটা দূর দিয়ে ছুটে গেল দুটো হরিণ। তারপর আরও তিনটে। শেষ হরিণটি ওদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে আরও জোরে দৌড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "সাবধান, একটুও নড়বি না। হরিণগুলোকে তাড়া করে পেছনে মানুষ আসতে পারে।"

কিন্তু কোনও মানুষ এল না। হরিণগুলো এমনিই দৌড়চ্ছে। সন্তু বোধহয় ইচ্ছে করলে একটাকে ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু এখন সে সময় নয়।

কাকাবাবু বললেন, "এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আমাদের চেষ্টা করতে হবে জারোয়াদের চোখ এড়িয়ে যাতে সারা দ্বীপটা একবার ঘুরে দেখে আসা যায়। তারপর কাল সকালেই দাশগুপ্ত পুলিশ নিয়ে ফিরে আসবে, তখন আমরা চলে যাব। চলো এগোই!"

চারদিক দেখতে দেখতে খুব সাবধানে ওরা এগোতে লাগল। ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। খানিকটা দূরে একটা খুব আস্তে শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হয় জলের শব্দ। নিশ্চয়ই ওখানে কোনও ঝর্না আছে। সন্তুর মনে পড়ে গেল তার খুব তেষ্টা পেয়েছে। তার গায়ের সমস্ত জামা-প্যান্ট ভিজে। জুতোটাও ভিজে থপ থপ করছে। কিন্তু তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ।

কাকাবাবু সেই জলের শব্দটা লক্ষ করেই এগুতে লাগলেন। হঠাৎ সন্তু কিসে একটা হোঁচট খেল।

নিচু হয়ে দেখল, একটা মানুষ। প্রকাণ্ড লম্বা একটা লোক, গায়ে কোনও জামা-কাপড় নেই। লোকটা মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, চোখ দুটো খোলা।

সন্তু ভয়ে আঁ করে শব্দ করতে গিয়ে নিজেই মুখে হাত চাপা দিল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?"

সন্তু কোনও উত্তর দিল না। ভয়ে তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

কাকাবাবুও এবার লোকটাকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রিভলভারটা উঁচিয়ে ধরলেন সেদিকে।

লোকটি কিন্তু একটুও নড়ল-চড়ল না, কোনও কথাও বলল না। শুধু খোলা দু' চোখে যেন কটমট করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

কাকাবাবু ঝুঁকে লোকটির গায়ে হাত দিয়েই বললেন, "এ তো মরে গেছে দেখছি!"

কাকাবাবু এবার লোকটির পাশে বসে পড়লেন। লোকটির গায়ে কোনও দাগ নেই, কোনও ক্ষত নেই, তাহলে মরল কী করে? লোকটার মাথার চুল নিগ্রোদের মতন, কুচকুচে কালো রঙ, হাত দুটো বেশ লম্বা, আর বুকখানা যেন মনে হয় পাথরের। এমন একটা জোয়ান লোক এমনি-এমনি মরে গেল?

কাকাবাবু লোকটাকে উল্টে দিলেন। তখন দেখা গেল, তার ঘাড়ের কাছে অনেকখানি রক্ত জমে আছে। সেখানে একটা গর্তের মতন।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "গুলি! এর ঘাড়ের মধ্যে গুলি ঢুকে গেছে। সর্বনাশ!"

সন্তু এত কাছ থেকে কোনওদিন কোনও মরা মানুষ দেখেনি। সে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটাও কথা বলতে পারছে না।

কাকাবাবু বললেন, "একে গুলি করে মেরেছে। তার মানে সেই সাহেবগুলোও এই দ্বীপে নেমেছে। আমি বলেছিলাম না? ওরা আমাদের আগে এসে পৌঁছে গেছে। সন্তু, আমাকে টেনে তোল্!"

কাকাবাবুর একটা পা কাটা বলে উনি একবার বসে পড়লে চট্ করে নিজে থেকে উঠতে পারেন না। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন, সন্তু সেই হাত ধরে টেনে তুলল তাঁকে।

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের চট করে লুকিয়ে পড়তে হবে। এখন আমাদের দু'দিক থেকে বিপদ। জারোয়ারা দেখলে মারবে, আর সাহেবগুলো দেখলেও আমাদের ছেড়ে দেবে না!"

দু'জনেই একটা ঝোপের আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কোথাও কোনও শব্দ নেই, শুধু দূরের একটা ঝর্নার জলের শব্দ ছাড়া। তবু মনে হচ্ছে যেন খুব কাছাকাছি কেউ দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ করছে। সব দিকে এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার যে, কিছুই দেখা যায় না। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

সন্তুর গলাটা একদম শুকিয়ে গেছে। জলতেষ্টায় মনে হচ্ছে যেন বুকটা ফেটে যাবে। ঘাড়ের কাছে অনবরত কটা মশা কামড়াচ্ছে। একবার সে চটাস করে মশা মারল।

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু! শব্দ করো না।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আমি জল খাব।"

কাকাবাবু বললেন, "আমারও জলতেষ্টা পেয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকেও তো কিছু লাভ নেই। চলো, আমরা আস্তে আস্তে ঝর্নাটার দিকে এগোই!"

অন্ধকারে কোথায় পা পড়ছে, তা বোঝবার উপায় নেই। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখে নিতে হচ্ছে সামনে কোনও বড় গাছ আছে কি না! তাও গাছে মাথা ঠুকে গেল কয়েকবার। কাকাবাবুর ক্রাচটা প্রায়ই জড়িয়ে যাচ্ছে বুনো লতায়, সেগুলো টেনে-টেনে ছিঁড়তে হচ্ছে।

বেশ খানিকটা যাবার পর ঝর্নাটা চোখে পড়ল। এখানে গাছপালা কিছু কম বলে চাঁদের আলো এসে জলে পড়েছে, তাই অন্ধকার এখানে পাতলা। ঝর্নাটা বেশ চওড়া, জলে স্রোত আছে।

এতক্ষণ অন্ধকারে থেকে বিচ্ছিরি লাগছিল, তাই সন্তু দৌড়ে চলে গেল ঝর্নাটার কাছে। ঝর্নার ধারে বালি ছড়ানো, বেশ ঝকঝকে, পরিষ্কার। সন্তু জলের মধ্যে এক পা দিয়েই আবার উঠে এল তাড়াতাড়ি। এত জোর স্রোত যে, তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। সে উবু হয়ে মাথাটা ঝুঁকিয়ে চুমুক দিয়ে জল খেয়ে নিল খানিকটা। জলটা ঠাণ্ডা নয়, একটু-একটু গরম, আর স্বাদটাও কষা-কষা। তবু পেট ভরে জল খেয়ে নিল সন্তু। সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি। এতক্ষণ খিদের কথা মনেই পড়েনি।

কাকাবাবু ঝর্নার ধারে বসতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। জলের মধ্যে গিয়ে পড়ার আগেই সন্তু তাঁর পিঠের জামা টেনে ধরল। তাতে কাকাবাবু নিজেকে সামলে নিতে পারলেন বটে, কিন্তু একটা সাঙ্ঘাতিক বিপদ ঘটে গেল। হুমড়ি খাবার সময় কাকাবাবুর ডান হাতের ক্রাচটা হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল জলে, আর অমনি স্রোতে সেটা ভেসে গেল। সন্তু ঝর্নার ধার দিয়ে খানিকটা দৌড়ে গেল তবু সেটাকে ধরতে পারল না, একটু পরেই একটা মস্ত বড় পাথর, সেটা ডিঙনো যায় না। ডান পাশ দিয়ে ঘুরে যখন আবার ঝর্নাটার কাছে এল, তখন ক্রাচটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সন্তু ফিরে আসতেই কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "পেলি না?"

"না।"

কাকাবাবু হতাশভাবে বললেন, "যাঃ, কী হবে এখন?"

ক্রাচ ছাড়া কাকাবাবু এক পাও চলতে পারেন না। বাঁ হাতেরটা রয়েছে বটে, কিন্তু একটা নিয়ে হাঁটতে গেলে একটু বাদেই বগলে দারুণ ব্যথা হয়ে যায়। এমনিতেই বিপদে পড়লে কাকাবাবু দৌড়তে পারেন না, এরপর যদি হাঁটতেও না পারেন, তাহলে কী হবে?

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইলেন। তারপর আঁজলা ভরে খানিকটা জল নিয়ে এলেন মুখের কাছে। প্রথমে একটু জিভ ঠেকিয়ে স্বাদ নিলেন,

তারপর বললেন, "এটা-একটা হট ওয়াটার স্প্রিং। কাছাকাছি কোনও জায়গায় পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়েছে। জলে অনেকটা গন্ধক আর লোহা মেশানো আছে। তাতে অবশ্য কোনও ক্ষতি হবেনা, এ-জল খাওয়া যায়।"

সন্তুর হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন কাকাবাবু। তারপর সন্তুর কাঁধে ভর দিয়েই এগোতে লাগলেন ঝর্নার ধার দিয়ে। একটু পরে বললেন, "কোনও গাছের ডাল ভেঙে একটা লাঠি বানিয়ে নিতে হবে অন্তত।"

সন্তু বলল, "আমি এক্ষুনি বানিয়ে দিচ্ছি।"

কাছেই একটা গাছের ডাল ধরে সে টান মারল। সেটা কিন্তু ভাঙল না। দারুণ শক্ত। সন্তু ডালটা ধরে ঝুলে পড়ল। সেটা নুয়ে পড়ছে, কিন্তু ভাঙছে না কিছুতেই।

কাকাবাবু বললেন, "ছুরি দিয়ে কাটতে হবে। এখানকার বেশির ভাগ গাছই প্যাডোক কিংবা সিলভার উড, খুব ভাল কাঠ হয়।"

সন্তুর পকেটে একটা ছোট্ট ছুরি আছে। তাতে বেশি মোটা ডাল কাটা যাবে না। তবু সে চেষ্টা করতে গেল, সেই সময় শুনতে পেল একটা অদ্ভুত শব্দ। কেউ যেন খুব জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। অনেকখানি রাস্তা দৌড়ে এলে যে-রকম নিশ্বাস পড়ে।

দু'জনেই কান খাড়া করে শুনল আওয়াজটা। এক-একবার থেমে যাচ্ছে, আবার শুরু হচ্ছে। খুব কাছেই। শব্দটা লক্ষ করে এগিয়ে যেতেই দেখল একটা লোক শুয়ে আছে মাটিতে। তার দেহটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে, আর মুখটা বেরিয়ে আছে বাইরে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে ঝর্নাটার দিকে আর ঐ রকম নিশ্বাস ফেলছে।

এর চেহারাও আগের লোকটার মতন, কিন্তু জ্যোৎস্নার আলোয় বোঝা যায়, এর সারা গায়ে রক্ত মাখা।

কাকাবাবু বললেন, "এর গায়েও গুলি লেগেছে। কিন্তু লোকটা এখনও বেঁচে আছে।"

ওরা গিয়ে লোকটার কাছে দাঁড়াল। লোকটা মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ওদের দিকে, সেই দৃষ্টিতে দারুণ ঘৃণা।

কাকাবাবু বললেন, "আহা রে, লোকটা গড়িয়ে গড়িয়ে এতটা এসেছে জল খাবার জন্য। আর এগোতে পারেনি। সন্তু, ওকে একটু জল এনে দাও তো!"

সন্তু আঁজলা করে খানিকটা জল নিয়ে এসে লোকটার মুখের ওপর ঢেলে দিল। লোকটা হাঁ করে আছে। যে-টুকু জল মুখের বাইরে পড়েছে, তা জিভ দিয়ে চেটে নিচ্ছে। সন্তু তিন-চারবার ওকে জল এনে-এনে দিল। কাকাবাবু ততক্ষণে লোকটার পাশে বসে পড়েছেন।

লোকটার পেটে, কাঁধে আর পায়ে তিনটে গুলি লেগেছে। এর মধ্যে পেটের জখমটাই সাঙ্ঘাতিক।

কাকাবাবু বললেন, "এখনও চেষ্টা করলে লোকটাকে বাঁচানো যায়।"

তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করে তুলোর মতন পেটের ক্ষতটাতে গুঁজে দিলেন। তারপর দু'পায়ের মোজা খুলে ফেলে সেগুলো ছিঁড়ে গিঁট বেধে ব্যাণ্ডেজ বানাতে লাগলেন।

সন্তু পাশে বসে আছে। হঠাৎ লোকটা একটা হাত তুলে সন্তুর গলা টিপে ধরল। সন্তু কিছু বোঝবার আগেই আঙুলগুলো সাঁড়াশির মতন বসে গেল তার গলায়। লোকটার শরীর থেকে কতখানি রক্ত বেরিয়ে গেছে, তবু তার গায়ে অসম্ভব জোর। সন্তু দু'হাত দিয়ে টেনেও লোকটার হাত ছাড়াতে পারছে না। তার দম আটকে আসছে, সে এবার মরে যাবে! সে কোনও শব্দ করতে পারছে না। কাকাবাবু অন্যদিকে ফিরে এক মনে মোজা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বানাচ্ছেন, তিনি কিছু টেরও পেলেন না।

প্রাণপণ চেষ্টায় সন্তু একবার শব্দ করে উঠল, আঁ আঁ—

কাকাবাবু পেছন ফিরে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রিভলভারের বাঁট দিয়ে খুব জোরে মারলেন লোকটার হাতে। লোকটা হাত ছেড়ে দিল, সন্তু ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।

লোকটা তখন মুখখানা উঁচু করে কাকাবাবুর একটা হাত কামড়ে ধরল। কাকাবাবু সব কিছু ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন 'উঃ' করে! তারপর অন্য হাত দিয়ে রিভলভারের বাঁটটা ঠুকে দিলেন লোকটার মাথায়। লোকটার কামড় আলগা হয়ে গেল, ঘাড় কাত করে চোখ বুজল।

কাকাবাবু হামাগুড়ি দিয়ে ঝর্না থেকে জল এনে এনে ঝাপটা দিতে লাগলেন সন্তুর চোখ-মুখে। আর ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগলেন, 'সন্তু, সন্তু!'

একটু বাদে সন্তু চোখ মেলল। তাড়াতাড়ি উঠে বসতে যেতেই কাকাবাবু বললেন, "থাক্ থাক্ উঠতে হবে না। একটু শুয়ে থাক। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু আবার হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে জল এনে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন সেই লোকটির মুখে। সে কিন্তু আর চোখ খুলল না।

কাকাবাবু বললেন, "লোকটা মরেই গেল নাকি? আমি ওকে মেরে ফেললাম?"

তিনি লোকটার নাকের কাছে হাত নিয়ে বললেন, "না, এখনও নিশ্বাস পড়ছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে। থাক্।"

এবার তিনি লোকটার ক্ষত জায়গাগুলো মুছে দিলেন। কিছু লতাপাতা ছিঁড়ে রস লাগিয়ে দিলেন সেখানে। তাঁর মোজার ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দিলেন পেটে।

তারপর বললেন, "পেট থেকে যদি রক্ত পড়া বন্ধ হয়, তাহলে বেঁচেও যেতে পারে।"

সন্তু ততক্ষণে উঠে বসেছে। এখনও তার মাথা ঝিম-ঝিম করছে। সে ভেবেছিল সে মরেই যাবে। গলাটা ফুলে গেছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কেমন লাগছে? কষ্ট হচ্ছে?"

সন্তু বলল, "না।"

"বাবাঃ, কী সাঙ্ঘাতিক!"

সন্তু খানিকটা অভিমানের সঙ্গে বলল, "আমি ওকে জল খাওয়ালাম, তবু ও আমাকে মারতে চাইল কেন? আমরা তো ওকে বাঁচাবারই চেষ্টা করছিলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা আমাদের বিশ্বাস করে না। বাইরের যে-কোনও লোকই ওদের কাছে শত্রু।"

"আমার আর এখানে একটুও থাকতে ভাল লাগছে না।"

"কাল সকালেই আমরা চলে যাব। পুলিশের বোট আসবে।"

"যদি না আসে?"

"আসবে না কেন? নিশ্চয়ই আসবে। ওরা কি আমাদের ভুলে যেতে পারে? আমরা রাত্তিরটাতে সারা দ্বীপটা একবার ঘুরে দেখে আসব। রাত্তিরেই সুবিধে। তারপর ভোরবেলা আমরা সমুদ্রের ধারে লুকিয়ে বসে থাকব। লঞ্চ এলেই উঠে পড়ব চট্ করে!"

এত রকম বিপদের পরও কাকাবাবু দ্বীপটা ঘুরে দেখতে চান। ওঁর উৎসাহ কিছুতেই কমে না। ভয়ডর একটুও নেই। একটা ক্রাচ নেই, নিজে হাঁটতে পারছেন না, তবু এখনও হেঁটে বেড়াবেন।

সন্তু বলল, "আমরা এখনি সমুদ্রের ধারে চলে যাই না কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ গোটা দ্বীপটা না-দেখেই চলে যাব? তাহলে এলাম কেন? সবটা না-দেখে ফিরব না!"

আবার তিনি সন্তুর কাঁধ ধরে হাঁটতে লাগলেন। ঝর্নার পাশ দিয়ে-দিয়েই। কারণ বালির ওপরটা বেশ পরিষ্কার। পায়ে লতাপাতা আটকে যায় না। জ্যোৎস্নায় সামনেটাও দেখা যায়।

তবু বেশি দূর আর এগোনো হল না। খানিকটা বাদে হঠাৎ দেখা গেল, বনের মধ্যে এক জায়গায় জ্বলে উঠল একটা টর্চের আলো।

কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে সন্তুকে এক ধাক্কা দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়লেন মাটিতে। গড়াতে-গড়াতে ঝর্নার ধার থেকে সরে গিয়ে ঢুকে পড়লেন একটা ঝোপের মধ্যে। সন্তুও চলে এল কাকাবাবুর পাশে-পাশে।

অমনি গুড়ুম-গুড়ুম করে দুটো গুলির শব্দ হল।

সেই গুলির শব্দ যেন প্রতিধ্বনি তুলল জঙ্গলের মধ্যে। যেন দূরে কোনও পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে শব্দগুলো ফিরে আসছে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ আর কোনও আওয়াজ নেই। সন্তু প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে থাকে, কিন্তু তার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ শব্দ হচ্ছে, যেন সেটাই বাইরের লোক শুনে ফেলবে।

একটু বাদে শোনা গেল পায়ের শব্দ। একসঙ্গে অনেক লোকের। ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, যারা হাঁটছে, তাদের খালি পা নয়, তারা জুতো পরে আছে। লোকগুলো আসছে এদিকেই। মাঝে-মাঝে টর্চের আলো জ্বলেই নিভে যাচ্ছে। তারপর প্রায় সাত-আটজন লোক এসে দাঁড়াল ঝর্নাটার ধারে। এরা সবাই সাহেব। না, সবাই নয়, একজনকে মনে হয় পাঞ্জাবী শিখ। তারা টর্চ ঘুরিয়ে চার পাশটা দেখতে লাগল।

একজন ইংরিজিতে বলল, "নিশ্চয়ই এখানে একটু আগে কেউ ছিল। আমি গলার আওয়াজ শুনেছি।"

আর-একজন বলল, "এই দ্যাখো, বালিতে পায়ের ছাপ।"

আবার তারা টর্চের আলো ফেলল ঝর্নার দু'দিকে।

কাকাবাবু আর সন্তু যদিও একটা বেশ ঘন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আছে, কিন্তু সেটা ঝর্না থেকে খুব দূরে নয়। ঐ সাহেবরা একটু ভাল করে খুঁজলেই সন্তুরা ধরা পড়ে যাবে। কাকাবাবু একহাতে রিভলভারটা তাক করে ধরে, অন্য হাতটা তার ওপর চাপা দিয়ে রেখেছেন।

সাহেবদের মধ্যে দু'জনের হাতে রাইফেল, বাকিদের হাতে রিভলভার! আর পাঞ্জাবীর মতন চেহারার লোকটির হাতে টর্চ।

সন্তু টের পেল তার পায়ের কাছে কী যেন একটা নড়ছে। একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জিনিস তার গায় লাগছে। সাপ নাকি? কাকাবাবু যদিও বলেছিলেন যে, এখানকার সাপের বিষ নেই, কিন্তু সে-কথা সন্তুর তখন মনে পড়ল না। সে তাড়াতাড়ি পা-টা সরিয়ে নিল। এবার পা-টা পড়ল বেশ বড় একটা ঠাণ্ডা জ্যান্ত জিনিসের ওপর। দারুণ ভয় পেয়েও সন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করল না বটে, কিন্তু পা-টা আবার সরিয়ে নিতেই শুকনো পাতায় খচমচ শব্দ হল।

সঙ্গে-সঙ্গে টর্চের আলোটা ঘুরে গেল এদিকে।

কিন্তু সন্তুরা ধরা পড়ার আগেই একটা সাহেব 'ওয়া' বলে চেঁচিয়ে উঠল। আর-একজন উত্তেজিতভাবে বলল, "ওরা আবার তীর ছুঁড়ছে। টর্চটা শিগগির নেভাও, বোকা!"

তারপরই একসঙ্গে ছ'টা বন্দুক পিস্তল গর্জে উঠল। সন্তুরা বুঝতে পারল, ওদের পিছন দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসছে। কয়েকটা তীর গাছের ডালে লেগে আটকে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে। জারোয়াদের সঙ্গে সাহেবদের যুদ্ধ শুরু

হয়ে গেছে। সন্তুরা পড়ে গেছে মাঝখানে। যে-কোনও দিক থেকে গুলি কিংবা তীর এসে লাগতে পারে ওদের গায়ে। কিন্তু এখন কিছুই করার উপায় নেই।

সাহেবরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, তারা এদিক-ওদিক দৌড়চ্ছে আর গুলি চালাচ্ছে। জারোয়ারা যাতে তাদের ওপর টিপ না করতে পারে। এর মধ্যে এত গোলাগুলির শব্দ শুনে ভয় পেয়ে কোথা থেকে বেরিয়ে পড়ল এক পাল বুনো শুয়োর। তারা জীবনে কখনও এরকম শব্দ শোনেনি—একসঙ্গে হুড়মুড় করে ছুটে গেল ঝর্নার ধার দিয়ে। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা।

যুদ্ধ থেমে গেল মিনিট দশেকের মধ্যেই। জারোয়ারা তীর ছোঁড়া বন্ধ করে পিছিয়ে যাচ্ছে।

একজন সাহেব বলল, "লেট্‌স মুভ!"

আর একজন সাহেব বলল, "আমার গায়ে তীর লেগেছে। শিগগির তুলে দাও! ইনজেকশন, ইনজেকশন কার কাছে?"

তারপর কিছুক্ষণ ফিসফাস। একটা কাচ ভাঙার শব্দ হল। একটু করে বোঝা গেল, ওরা চলে যাচ্ছে।

আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর কাকাবাবু উঠে বসলেন। সন্তু উঠে প্রথমেই দেখল, তার পায়ের কাছের জিনিসটা কী। না, সাপ নয়, একটা মস্ত বড় ব্যাঙ, প্রায় আধ কিলো ওজন হবে। সন্তু জুতোর ঠোক্কর দিয়ে সেটাকে দূরে সরিয়ে দিল।

কাকাবাবু কোট থেকে মাটি আর শুকনো ডালপালা ঝেড়ে ফেললেন। তারপর বললেন, "আমরা দু'জন সাহেবকে পালাতে দেখেছিলাম, কিন্তু এখানে এরা ছ'জন। তার মানে আগে থেকে কয়েকজন এসে অন্য দ্বীপে লুকিয়ে ছিল। আশ্চর্য জাত!"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আস্তে কথা বলো, জারোয়ারা যদি কাছেই থাকে?"

কাকাবাবু বললেন, "না, সে সম্ভাবনা নেই। জারোয়ারা পালিয়েছে। তারা ভয় পেয়েছে। এরকম জিনিস কখনও তারা দেখেনি।"

"কী? বন্দুক? আগে বন্দুক দেখেনি?"

"না, বন্দুক নয়। আমি যতদূর শুনেছি, জারোয়ারা গুলি বন্দুককে ভয় পায় না। তারা মরতেও ভয় পায় না। কিন্তু এরকম ব্যাপার ওরা কখনও দেখেনি আগে।"

"কোন্ ব্যাপার?"

"তুইও বুঝতে পারলি না। একজন সাহেব যে ইনজেকশন ইনজেকশন বলে চ্যাঁচাল, সেটা শুনিসনি?"

"হ্যাঁ, শুনেছি।"

"এবার সাহেবরা আটগাট বেঁধে এসেছে। সাহেবের জাত তো, কোনও ত্রুটি রাখে না। সবাই জারোয়াদের বিষাক্ত তীরকে ভয় পায়। ঐ তীর গায়ে বিঁধলে মানুষ মরে যায়। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, বিষেরও ওষুধ আছে। এমন কী, সাপের বিষও সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ দিয়ে নষ্ট করা যায়। ঐ সাহেবরা সেই ওষুধ নিয়ে এসেছে। কারুর গায়ে তীর লাগলেই ওষুধের ইনজেকশন নিয়ে নিচ্ছে একটা করে। তীর খেয়েও কোনও সাহেব মরছে না, এই দেখে ভয় পেয়ে গেছে জারোয়ারা। এবার ওরা হারবেই।"

কাকাবাবু হামাগুড়ি দিয়ে ঝর্নার কাছে এগিয়ে গেলেন। এদিক-ওদিক হাতড়িয়ে কী যেন খুঁজতে লাগলেন। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলেন একটা তীর। খুব সাবধানে তীরটার পেছনটা ধরে সেটাকে খুব সাবধানে ধুয়ে নিলেন জলে। তারপর সেটা তুলে বললেন "এই দ্যাখ্। এমনিতে এটা এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র নয়।"

সন্তু দেখল, তীরটা সত্যিই অন্যরকম। অনেকটা খেলবার তীরের মতন। তীরের ডগায় যে লোহার ফলক থাকবার কথা, এতে তা নেই। তীরটা বাঁশের, মুখটা খুব ছুঁচলো। তীরের পেছন দিকটায় পালকও লাগানো নেই।

কাকাবাবু বললেন, "যদি বিষ না থাকে, তাহলে এরকম তীর আট-দশটাও যদি কারুর গায়ে বেঁধে, তাহলেও এমন-কিছু লাগবে না। বিষের জন্য সাহেবরা ইনজেকশন নিয়ে নিচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে কী আর এমন বিষ পাওয়া যাবে? খুব সম্ভব জারোয়ারা স্ট্রিকনিন ধরনের বিষ ব্যবহার করে। সঙ্গে-সঙ্গে অ্যান্টিডোট নিলে সে-বিষ কোনও ক্ষতিই করতে পারে না। সাহেবরা বুদ্ধি করে সেই ওষুধ সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আমাদেরও আনা উচিত ছিল।"

কাকাবাবু সেই তীরটা নিজের ব্যাগের মধ্যে ভরে নিলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ঐ ছ'-সাতটি সাহেব মিলে পাঁচ-ছশো জারোয়াকে মেরে ফেলতে পারে। আমাদের উচিত এক্ষুনি পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরে গিয়ে পুলিশকে এই খবর জানানো!"

কিন্তু পোর্ট ব্লেয়ারে ফেরা হবে কী করে? সন্তু সেই কথাই ভাবল। এই অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে সমুদ্রের দিকের রাস্তা খুঁজে পাওয়াই প্রায় অসম্ভব। সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছলেই বা কী লাভ? লঞ্চ কিংবা মোটরবোট কোথায় পাওয়া যাবে? দাশগুপ্তরা তো ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। কাল যদি দাশগুপ্ত পুলিশ সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে—

কাকাবাবু অনেকটা আপন মনেই বললেন, "সাহেবরা এত আটঘাট বেঁধে এখানে এসেছে কেন? নিশ্চয়ই এখানে সাঙ্ঘাতিক কোনও দামি জিনিস আছে। এর আগে-আগে এসেছে বৈজ্ঞানিকরা। কিন্তু এদের বৈজ্ঞানিক বলে মনে হয় না, কোনও বৈজ্ঞানিক গুলি করে মানুষ মারে না। এরা নিশ্চয়ই ডাকাত-টাকাত হবে।"

তারপর তিনি সন্তুর দিকে ফিরে উত্তেজিতভাবে বললেন, "সন্তু, তোকে একটা কাজ করতে হবে। এর জন্য খুব সাহসের দরকার। ভয় পেলে একদম চলবে না। তুই সমুদ্রের ধারে চলে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাক। এখন জারোয়ারা সমুদ্রের ধারে পাহারা দেবার সময় পাবে না। তবু তুই খুব সাবধানে থাকবি। দাশগুপ্ত কাল কোনও সময় মোটরবোট নিয়ে আসবেই। তাকে সব বুঝিয়ে বলবি। দরকার হলে পঞ্চাশ-ষাটজন পুলিশ নিয়ে ভেতরে ঢুকে আসে যেন। ঐ সাহেবগুলোকে আটকাতেই হবে। যে-কোনও উপায়ে হোক। যা, তুই এগিয়ে পড়।"

সন্তু অবাক হয়ে বলল, "আমি একা যাব?"

"হ্যাঁ।"

"আমি একা কেন যাব? না, তা হয় না।"

"বেশি কথা বলিস না। তোকে একাই যেতে হবে।"

"তুমি এখানে থাকবে? তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে।"

"সহজে পারবে না। আমি লুকিয়ে থাকব।"

"কাকাবাবু, আমি তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই যাব না। মা বলে দিয়েছেন, সব সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে।"

"সন্তু, অবুঝ হয়ো না। এখানে এখন দু'জনের থাকার কোনও মানে হয় না। তাহলে দু'জনেই মরব। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, আমি মরে গেলেও কী এমন ক্ষতি আছে! মানুষ তো এক সময় না এক সময় মরেই! তবু মরার আগে এই রহস্যটা জেনে যাওয়ার চেষ্টা করব। তোমাকে বাঁচতেই হবে। তাছাড়া, তুমি গিয়ে দাশগুপ্তকে খবর দিলে তারা হয়তো আমাকে বাঁচাবার চেষ্টাও করতে পারে।"

"কিন্তু তুমি তো একটা ক্রাচ নিয়ে বেশিক্ষণ হাঁটতেই পারবে না।"

"আমি রাত্তিরটা এখানেই ঝোপের মধ্যে শুয়ে থাকব। সকালবেলা একটা গাছের ডাল জোগাড় করে নেব ঠিকই। আমার অসুবিধে হবে না। সমুদ্রের ধারটাই এখন সবচেয়ে নিরাপদ।"

"কিন্তু আমি অন্ধকারের মধ্যে সমুদ্রের ধারে যাব কী করে? রাস্তা হারিয়ে ফেলব।"

"সমুদ্রের কাছে যাওয়া তো খুব সোজা। এই ঝর্নাটা যখন পাওয়া গেছে। এটার ধার দিয়ে গেলেই হবে। এই ঝর্নাটা নিশ্চয়ই সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। খুব সাবধানে যাবে কিন্তু।"

সন্তুর বুক ঠেলে কান্না উঠে এল। সে কাকাবাবুর হাত চেপে ধরে বলল, "কাকাবাবু, আমি যাব না। আমি তোমাকে একা ফেলে কিছুতেই যাব না!"

কাকাবাবু সন্তুর মাথায় হাত রেখে ভারী গলায় বললেন, "সন্তু, এবার তোমাকে

এখানে আনাই ভুল হয়েছে। এতটা বিপদের কথা আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখানে আমাদের দু'জনের একসঙ্গে থাকা খুবই বিপজ্জনক। পুলিশকে একটা খবর দেওয়া খুবই দরকার।"

"তুমিও চলো আমার সঙ্গে।"

"আমি গেলে চলবে না। আমি ঐ সাহেবগুলোর ওপর নজর রাখতে চাই।"

"তুমি একা ওদের সঙ্গে কী করবে? যদি ওরা আবার এদিকে এসে পড়ে?"

"আমি লুকিয়ে থাকব, ওরা আমাকে দেখতে পাবে না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি এখানেই থাকব, অন্য কোথাও যাব না।"

"তাহলে শুধু-শুধু কেন একলা বসে থাকবে। না কাকাবাবু, তুমি চলো আমার সঙ্গে। আমি একা কিছুতেই যাব না।"

কাকাবাবু এবার গম্ভীর কড়া গলায় বললেন, "সন্তু, তোমাকে যেতে বলছি, যাও! তুমি জানো না, আমার কথার নড়চড় হয় না? আমি অনেক ভেবেচিন্তেই তোমাকে যেতে বলেছি। আমি এখানেই থাকব। যাও, এক্ষুনি রওনা হও!"

সন্তু আর কথা বলার সাহস পেল না। এক পা এক পা করে চলতে শুরু করল। কয়েকবার পেছন ফিরে তাকাল, কিন্তু একটু বাদেই আর কাকাবাবুকে দেখতে পেল না। কাকাবাবু ঝোপের অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। সন্তুও বড় পাথরটার ওপাশে চলে গেল।

ঝর্নার পাশে বালির ওপর হালকা চাঁদের আলো, তাতে সন্তুর ছায়া পড়েছে। সেই ছায়াটাই তার সঙ্গী। বন এত নিস্তব্ধ যে, এমনিতেই গা ছমছম করে। কোথায় আড়ালে গাছের ওপর জারোয়ারা লুকিয়ে আছে কে জানে। যে-কোনও সময় একটা তীর এসে গায়ে লাগতে পারে।

সন্তু তাড়াতাড়ি ঝর্নার পাড় থেকে সরে জঙ্গলে চলে গেল। ঝর্নার পাশে থাকলে দূর থেকেও তাকে দেখা যাবে। কিন্তু বনের মধ্যে আসার পর ছায়াটাও আর তার সঙ্গী রইল না।

মনের মধ্যে ভীষণ খারাপ লাগছে। কাকাবাবুকে এরকমভাবে ছেড়ে চলে যাওয়া কি ঠিক হল? একলা এই ভয়ংকর জঙ্গলের মধ্যে উনি কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবেন? নিজে ভাল করে হাঁটতেও পারেন না। অথচ কাকাবাবু যে কিছুতেই শুনবেন না অন্য কারুর কথা।

ঝর্নাটা ক্রমশই চওড়া হচ্ছে। এখানে হাঁটাও খুব শক্ত। মাঝে-মাঝেই কাঁটাঝোপ। একটা বড় গাছের গায়ে একবার সন্তু হাত দিতেই তার হাত ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। গাছের গায়েও কাঁটা। খালি তার ভয় হচ্ছে। হোঁচট খেয়ে পড়ে না যায়। তাকে সমুদ্রের ধারে পৌঁছতেই হবে।

হঠাৎ একটা আওয়াজে সে দারুণ চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠল। শব্দটা এমনই বিকট যে, শরীরের রক্ত প্রায় জল হয়ে যায়। প্রথমে মনে হল, যেন একসঙ্গে দু'-তিনটে পাখি ডেকে উঠল। কিন্তু কোনও পাখি এরকম বিশ্রী সুরে ডাকে? আর এত জোরে? শব্দটা এই রকম : কিলা কিলা কিলা কিলা কিলা কিলা!

সন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু বাদেই সেই রকম আবার কিলা কিলা কিলা কিলা শব্দ উঠল ডান দিক থেকে। আগের শব্দটা এসেছিল বাঁ দিক থেকে। এবার মনে হল, যেন কয়েকজন লোক উলু দিচ্ছে। কিন্তু শব্দটা শুনলেই গা শিউরে ওঠে।

তারপর চারদিক থেকে কিলা কিলা কিলা কিলা শব্দ উঠল। যেন শত শত লোক একসঙ্গে চিৎকার করছে। বনের সব দিক থেকে ঐ শব্দ করতে করতে কারা ছুটে আসছে। এর মধ্যেই দুমদুম করে গুলির শব্দ শুরু হয়ে গেল। তবু ঐ কিলা কিলা থামল না। সন্তু একটা পাথরের আড়ালে গুটিসুটি মেরে বসে রইল। তার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে। তার মনে হচ্ছে যেন নরকের সব প্রাণীরা জেগে উঠে বন ঘিরে ধরছে।

বন্দুকের গুলির শব্দ কিন্তু একটু বাদেই থেমে গেল, কিন্তু কিলা কিলা শব্দ থামল না। এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ঐ রকম শব্দ করে এক জায়গায় লাফাচ্ছে। তারপর শব্দটা একটু একটু করে দূরে সরে যেতে লাগল।

ব্যাপারটা কী হল, তা বোঝার চেষ্টা করল সন্তু। তার শরীর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দু'-হাত দিয়ে মুখটা ঘষতে লাগল জোরে জোরে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। গুঁড়ি মেরে ঝর্নার পাশে এসে চুমুক দিয়ে জল খেয়ে নিল অনেকটা। তারপর তার পেট ব্যথা করতে লাগল।

সারাদিন কিছুই খায়নি, পেট খালি। শুধু ঝর্নার জল খাচ্ছে। জলেও কষা-কষা স্বাদ। জলের জন্যই পেট ব্যথা করছে কি না কে জানে।

কিলা কিলা আওয়াজটা এখনও শোনা যাচ্ছে, কিন্তু অনেকটা দূরে চলে গেছে এবার। সন্তুর মনে হল যে, নিশ্চয়ই একসঙ্গে একশো-দুশো জারোয়া এসে সাহেবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সাহেবরা গুলি করেও আটকাতে পারেনি। এবার ওরা সাহেবগুলোকে ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাহলে কাকাবাবুর কী হল? ওরা যদি কাকাবাবুকেও ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে? কিংবা যদি কাকাবাবুকে মেরে ফেলে?

সন্তুর ভীষণ ইচ্ছে হল, কাকাবাবুকে আর-একবার দেখে আসে। যদিও কাকাবাবু তাকে হুকুম দিয়েছেন সমুদ্রের কাছে যেতে, কিন্তু সন্তু তক্ষুনি যেতে পারবে না কিছুতেই। সে আবার উল্টো দিকে ফিরল।

এখন আর সন্তু গ্রাহ্যই করছে না কেউ তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে কি না। সে বালির ওপর দিয়ে তীরের মতন ছুটতে লাগল। পেটের ব্যথাটা ক্রমেই বাড়ছে, সে দু'-হাতে চেপে ধরে রাখল পেট।

সেই ঝোপটার কাছাকাছি এসেই সে ডাকল, "কাকাবাবু কাকাবাবু!"

কোনও উত্তর পেল না।

সন্তু হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে। কাকাবাবু সেখানে নেই। এর মধ্যে তিনি কোথায় গেলেন? কাকাবাবু যে বলেছিলেন, এ-জায়গাটা ছেড়ে যাবেন না? সন্তু এদিক-ওদিক ঘুরে কাকাবাবুর নাম ধরে ডাকতে লাগল। কাকাবাবুর কোনও চিহ্নই নেই। সন্তু চলে এল ঝর্নার পাশে। দূরে কিলা কিলা শব্দ শোনা যাচ্ছে, এখন শব্দটা এক জায়গায় গিয়ে থেমেছে মনে হচ্ছে।

সন্তুর দৃঢ় বিশ্বাস হল জারোয়ারা কাকাবাবুকেও ধরে নিয়ে গেছে। সে আর কোনও কিছুই চিন্তা করল না, সেই শব্দটা লক্ষ্য করে ছুটল।

অন্ধকারের মধ্যে সন্তু ছুটছে তো ছুটছেই। নদীর ধারে বালির ওপরে মাঝে মাঝে বড়-বড় পাথর আর কাঁটাগাছের ঝোপ, কিন্তু সন্তু কোনও বাধাই মানছে না। কাকাবাবুকে ফেলে রেখে সে যাবে না কিছুতেই। যদি কোনওক্রমে সে এখান থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরতেও পারে, তাহলে বাড়িতে মা, বাবা, আর সবাই বলবেন, তুই কাকাবাবুকে দ্বীপে রেখে নিজে চলে এলি? তুই এত কাপুরুষ? না, যদি মরতে হয় তো কাকাবাবুর সঙ্গে সন্তু নিজেও মরবে।

কিলা কিলা কিলা কিলা শব্দটা এখনও দূরে শোনা যাচ্ছে। ঐ শব্দটা শুনলেই ভয়ে রক্ত হিম হয়ে যায়। মানুষের গলার আওয়াজ যে এরকম হতে পারে, নিজের কানে না শুনলে সন্তু বিশ্বাস করত না কিছুতেই। যেন মুখের মধ্যে একটা লোহার জিভ নিয়ে কেউ চ্যাঁচাচ্ছে।

সাহেবরা এতগুলি বন্দুক নিয়ে এসেও হেরে গেল জারোয়াদের কাছে। ওরা একসঙ্গে দু'-তিনশো জন এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সাহেবদের ওপর। এখন বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। কাকাবাবু কী করে পড়ে গেলেন ওদের মধ্যে? কাকাবাবুর একটা পা নেই, একটা ক্রাচও নদীর জলে ভেসে গেছে, তিনি হাঁটতে পারবেন না। ওরা কি কাকাবাবুকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে যাচ্ছে? ইস্, কত কষ্ট হচ্ছে তাঁর। কাকাবাবু যদি এর মধ্যে মরে গিয়ে থাকেন?

সন্তু আরও জোরে দৌড়তে গেল। তার পেটের মধ্যে দারুণ ব্যথা করছে, দম ফুরিয়ে আসছে, তবু সে কিছুতেই থামবে না। কিন্তু একটু পরেই সন্তু একটা বড় পাথরে দারুণ জোরে হোঁচট খেয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল। আর একটা পাথরে তার মাথাটা এমন জোরে ঠুকে গেল যে, সে সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

অজ্ঞান অবস্থায় সন্তু উপুড় হয়ে পড়ে রইল ঝর্নাটার ধারে। সেই অবস্থাতেই তার বমি হতে লাগল। মুখ দিয়ে গল গল করে বমি বেরিয়ে আসছে তো আসছেই। সন্তুর জামাটামা সব বমিতে মাখামাখি হয়ে গেল। অজ্ঞান অবস্থায় আর মানুষের

কোনও ভয় থাকে না। এখন আর সাহেবদের ভয় নেই, জারোয়াদের ভয় নেই। খুব শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়ার মতন সন্তুর চোখ দুটো বোজা।

খানিকটা বাদে একপাল হরিণ এল সেই ঝর্নার জল খেতে। এখানকার জঙ্গলে বাঘ সিংহের মতন কোনও হিংস্র প্রাণী নেই বলে হরিণের সংখ্যা খুব বেশি। হরিণগুলো সন্তুকে দেখেও কোনও ভয় পেল না। কয়েকটা হরিণ সন্তুর কাছে এসে তার গায়ের গন্ধ শুঁকল। আবার তারা ফিরে গেল বনের মধ্যে।

তারপর ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। সন্তু ভিজতে লাগল সেই বৃষ্টিতে। সমস্ত জঙ্গল জুড়ে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে, তার মধ্যে সেই কিলা কিলা শব্দটা আর শোনা যায় না।

এখানকার বৃষ্টি হঠাৎ আসে, হঠাৎ থেমে যায়। এই বৃষ্টিও থেমে গেল একটু বাদে। কিন্তু বৃষ্টিতে ভেজার জন্য সন্তুর জ্ঞান ফিরে এল। সে উঠে বসল ধড়মড়িয়ে। সে কোথায় আছে, কেন শুয়ে আছে—প্রথমে এসব কিছুই তার মনে এল না। একটুক্ষণ বসে রইল ঝিম দিয়ে, তারপর সব মনে পড়ল। সে শিউরে উঠল একেবারে। সে এরকম ফাঁকা জায়গায় শুয়ে ছিল? যে-কোনও জারোয়ার চোখে পড়লে একেবারে শেষ হয়ে যেত। সে তাড়াতাড়ি চারদিকে তাকিয়ে দেখল। না, কোথাও কেউ নেই। সেই কিলা কিলা শব্দটা এখন একেবারে থেমে গেছে।

বমি হয়ে যাওয়ার জন্য সন্তুর পেটের ব্যথাটা একদম সেরে গেছে। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। শুধু মাথার এক জায়গায় ব্যথা। সেখানে হাত দিয়ে দেখল, চুলের মধ্যে এক জায়গায় চটচট করছে। রক্ত বেরিয়ে চুলের মধ্যে জমে আছে। সন্তুর হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। বাড়ি থেকে কত দূরে এই বিদঘুটে জঙ্গলের মধ্যে সে একা পড়ে আছে। কী করে বাঁচবে জানে না। কাকাবাবু কোথায় তার ঠিক নেই। কাকাবাবু কেন এইসব জায়গায় আসেন?

আবার সন্তু লজ্জা পেয়ে গেল। কাকাবাবু তো তাকে জোর করে আনেননি। সে-ই তো ইচ্ছে করে এসেছে অ্যাডভেঞ্চারের লোভে। এখন বিপদে পড়ে সে কাঁদছে কেন? কেঁদে কোনও লাভ নেই, তাকে বাঁচার চেষ্টা করতেই হবে।

চোখের জল মুছে ফেলে সন্তু গেল ঝর্নার ধারে। ভাল করে বমিটমি ধুয়ে ফেলল। এখানকার জলটা বেশ গরম। যাকে উষ্ণ প্রস্রবণ বলে, এই ঝর্নাটা বোধহয় তাই। এর জল খেয়েই সন্তুর পেট ব্যথা করছিল। কিন্তু উপায় তো নেই। আবার আঁজলা করে খানিকটা জল তুলে সন্তুকে খেতে হল। তার খুব তেষ্টা পেয়েছিল।

আবার সে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। কিলা কিলা শব্দটা বন্ধ হয়ে গেলেও যে-দিক থেকে শব্দটা আসছিল, সন্তু যেতে লাগল সেই দিকে। এখন আর দৌড়তে পারছে না। হাঁটছে আস্তে আস্তে।

খানিকটা যাবার পর সে জঙ্গালের মধ্যে একটা আলো দেখতে পেল। সেই আলোটা দেখেও ভয় পাবার কথা। এই জঙ্গালের মধ্যে এরকম আলো আসবে কোথা থেকে? একদম নীল রঙের আলো। গাছপালা ভেদ করে বেরিয়ে আসছে সেই আলোর ছটা। কালীপুজোর সময় ম্যাগনেসিয়ামের তার পোড়ালে এরকম নীল আলো হয়। সন্তু যত এগোতে লাগল ততই আলোটা উজ্জ্বল হতে লাগল। যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সন্তু কাকাবাবুর কাছে শুনেছিল যে, জারোয়ারা আগুনই জ্বালতে জানে না। তা এরকম আলো এখানে কে জ্বেলেছে?

আলোটা দেখা যাচ্ছে জঙ্গালের মধ্যে। তাই সন্তু নদীর ধার ছেড়ে জঙ্গালের মধ্যে ঢুকে সেই দিকে এগোল। আরও খানিকটা যাবার পর সে থমকে দাঁড়াল। যা দেখল, তাতে তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার মতন অবস্থা। বুকের মধ্যে এত জোর দুম দুম শব্দ হচ্ছে যেন বাইরে থেকেও শোনা যাবে।

জঙ্গালের মধ্যে হঠাৎ অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। তার পাশে একটা গোল জিনিস দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই গোল জিনিসটা একটা একতলা বাড়ির সমান। সবচেয়ে আশ্চর্য তার আগুনটা। এরকম অদ্ভুত আগুনের কথা সন্তু কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। আগুনটা নানা রঙের। বেশির ভাগই একদম নীল, তাই দূর থেকে নীল রঙের আলো দেখা যায়। কিন্তু ঐ নীল আগুনের মধ্যে আবার লক লক করছে কয়েকটা লাল, সবুজ আর গোলাপী রঙের শিখা। গ্যাসের আগুন নিয়ে ঝালাই-টালাইয়ের কাজ হয় যে-সব দোকানে, সেখানে সন্তু অনেকটা এরকম নীল রঙের আগুন দেখেছে, কিন্তু সবুজ কিংবা আলতার মতন টকটকে লাল রঙের আগুনের কথা কে কবে শুনেছে? ঐ গোল জিনিসটা কী? ওটার মধ্যে যেন অনেকগুলো জিনিস আছে, সেগুলো থেকে আলাদা-আলাদা আগুন বেরুচ্ছে। যেন একটা আগুনের ফুলের তোড়া। ওটার দিক থেকে সহজে চোখ ফেরানো যায় না।

তবু কোনওরকমে চোখ ফিরিয়ে সন্তু দেখল, সেই গোল আগুনটা থেকে অনেক দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের আকৃতিতে সার বেঁধে বসে আছে কয়েক শো জারোয়া। ওরা বসেছে মাটিতে হাঁটু গেড়ে, সকলের শরীর সোজা। আর ওদের সামনে পড়ে আছে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সাহেবগুলো। নীল আলোয় জায়গাটা দিনের বেলার মতন পরিষ্কার। সব স্পষ্ট দেখা যায়।

সন্তু গুঁড়ি মেরে আরও একটু সামনে এগিয়ে গেল। এখন সে আর নিজের প্রাণের কথা চিন্তাই করছে না। সে দেখতে চায় ওখানে কাকাবাবুও আছেন কি না। খুব শক্ত কোনও জংলী লতা দিয়ে সাহেবগুলোর হাত-পা একসঙ্গে এমনভাবে বাঁধা যে, তারা নড়তে-চড়তে পারছে না। কিন্তু কাকাবাবু তো ওদের মধ্যে নেই। তাহলে কি কাকাবাবুকে আগেই মেরে ফেলেছে?

ফাঁকা জায়গাটার এক পাশে কতগুলো ঘর রয়েছে। ঘরগুলো গাছের ডাল আর লতা দিয়ে তৈরি করা। সেই সব ঘর থেকে কিছু কিছু জারোয়া মেয়ে আর বাচ্চা বেরিয়ে আসছে, কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে সাহেবদের। তারপর মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করছে। একটা জারোয়া মেয়ে একটা লম্বা শুকনো গাছের ডাল নিয়ে এগিয়ে গেল সেই আগুনটার কাছে। দূর থেকে সে ডালটা ঢুকিয়ে দিল আগুনের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। মেয়েটি সেই জ্বলন্ত ডালটা নিয়ে ফিরে এল আবার। এই ডালের আগুনটা কিন্তু সাধারণ আগুনের মতনই, নীল নয়। মেয়েটি সেই আগুন নিয়ে ঢুকে গেল একটা ঘরের মধ্যে।

সন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে, বুঝতে পারছে না। কাকাবাবুকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কাকাবাবুকে এরা মেরে বনের মধ্যে কোথাও ফেলে রেখে এসেছে? কিন্তু সাহেবগুলোকে যখন নিয়ে এসেছে, তখন কাকাবাবুকেই বা আনবে না কেন? তাহলে কি কাকাবাবু ধরা পড়েননি, তাহলে কাকাবাবু গেলেন কোথায়? কাকাবাবু যেখানটায় লুকিয়ে ছিলেন, সন্তু সে-জায়গাটা খুঁজে দেখেছে। কাকাবাবু একটা ক্রাচ নিয়ে বেশিদূর যেতেও পারবেন না। তাহলে ব্যাপারটা কী হল?

সাহেবগুলোকে ওরকমভাবে হাত-পা বেঁধে রাখা হলেও ওদের মুখে কোনও ভয়ের চিহ্ন নেই। কেউ কান্নাকাটিও করছে না। জারোয়ারা সবাই একদম চুপ করে বসে আছে। সাহেবরা কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। সন্তু ইংরিজি ভালই জানে, কিন্তু সাহেবদের মুখের উচ্চারণ অনেক সময় বুঝতে পারে না। তবু একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করল। সে টুকরো-টুকরো কয়েকটা কতা শুনতে পেল...দিজ বেগারস্ উইল সার্টেনলি কিল আস...দ্যাট মেটিওরাইট ...ইনভেলুয়েবল...সো নীয়ার...

একজন সাহেব পাশ ফিরে শুতেই একজন জারোয়া উঠে গিয়ে তাকে আবার চিৎ করে দিল। কচ্ছপকে যেমন চিৎ করে রাখা হয়, এদেরও তেমনি চিৎ হয়েই থাকতে হবে।

জারোয়াদের দেখলেই মনে হয় তারা যেন কিসের জন্য অপেক্ষা করছে। ওরা যদি সাহেবগুলোকে মারতে চায়, তাহলে তো মেরে ফেললেই পারে। দেরি করছে কেন?

সন্তু নিশ্বাস ফেলছে খুব আস্তে-আস্তে। একটুও নড়াচড়া করতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু এখানেই বা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? কাকাবাবু এখানে নেই, তা বোঝাই যাচ্ছে। মনে হয় ভোর হতেও আর দেরি নেই। বারবার সে সেই গোল আগুনটার দিকে তাকাচ্ছে। ওই দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে—যদিও চোখটা একটু জ্বালা-জ্বালা করে। তবু যেন মনে হয়; ওটার মধ্যে চুম্বক আছে। আগুন যে এত সুন্দর

হয়, সন্তু তা জানত না। সবুজ আগুন? এক-একবার মনে হয় যেন রঙিন কাগজ। কিন্তু কাগজ নয়, সত্যিকারের আগুন। একটু আগেই তো একজন মেয়ে ঐ আগুন থেকে একটা গাছের ডাল জ্বালিয়ে নিল।

আর এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। কাকাবাবুকে খুঁজে বার করতেই হবে। কিন্তু এত বড় জঙ্গালের মধ্যে কোথায় সে কাকাবাবুকে খুঁজে পাবে। তবু শেষ পর্যন্ত চেষ্টা না করে সন্তু ছাড়বে না।

হঠাৎ সন্তুর একটা কথা খেয়াল হল। একটা দারুণ সুযোগ। এখন যদি কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে তারা খুব সহজেই পালিয়ে বেঁচে যেতে পারে। জারোয়ারা সব এখানে, তারা জঙ্গালের মধ্যে খুঁজবে না। ঐ সাহেবগুলোর একটা মোটরবোট নিশ্চয়ই সমুদ্রের ধারে কোথাও আছে। সেই বোটটায় চেপেই তো তারা পালাতে পারে এখান থেকে। সাহেবগুলোকে ফেলে তাদের মোটরবোট নিয়েই যেতে হবে—কিন্তু তাতে কোন দোষ নেই, সাহেবরা তো তাদের শত্রু!

সন্তু পা টিপে-টিপে আস্তে আস্তে পিছিয়ে যেতে লাগল। আরও খানিকটা দূরে গিয়েই সে দৌড় মারবে। কিন্তু তার যাওয়া হল না। হঠাৎ জারোয়াগুলো শব্দ করে উঠে দাঁড়াল। আবার তারা বিকটভাবে সেই কিলা কিলা কিলা কিলা শব্দ করে উঠল। সন্তু কেঁপে উঠল একেবারে। জারোয়ারা কি তার কথা টের পেয়ে গেছে? সন্তু দৌড়ে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু জারোয়ারা তেড়ে এল না তার দিকে। সেখানেই দাঁড়িয়ে চ্যাচাতে লাগল। ব্যাপারটা কী ঘটছে তা দেখবার জন্য সন্তু আর কৌতূহল দমন করতে পারল না। আস্তে আস্তে আবার মাথা উঁচু করল।

এবারে সেখানে রয়েছে আর-একজন নতুন লোক। পাতার ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে সেই লোকটি ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই জারোয়ারা ওরকম চিৎকার করছে ঠিক যেন জয়ধ্বনি দেবার মতন। লোকটি একটি হাত উঁচু করে আছে ওদের দিকে।

লোকটি অসম্ভব বুড়ো। মনে হয় নব্বই·কিংবা একশো বছর বয়েস। ছোট্টখাট্টো চেহারা, পিঠটা একটু বেঁকে গেছে। মাথার চুল ধপধপে সাদা, মুখেও সাদা দাড়ি। লোকটির ভুরু দুটিও পাকা। লোকটি একটি লাল রঙের ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরে আছে গায়ে একটা লাল রঙের চাদর। অন্য কোনও জারোয়া জামা কাপড় কিছুই পরে না। এই বুড়ো লোকটিকে জারোয়া বলে মনেও হয় না, গায়ের রঙ বেশ ফর্সা, মাথার চুলও কোঁকড়ানো নয়। এ লোকটা কে? এ কি জারোয়াদের রাজা?

লোকটি আস্তে আস্তে হেঁটে এসে সাহেবগুলোর কাছে দাঁড়াল। খুব ভাল করে দেখতে লাগল তাদের মুখগুলো। আর মাঝে-মাঝে মাটিতে চিক চিক করে থুতু ফেলতে লাগল। তারপর মুখ তুলে কী যেন জিজ্ঞেস করল জারোয়াদের। চার-পাঁচজন জারোয়া একসঙ্গে উত্তর দিল।

একজন সাহেবের পাশে তার বন্দুকটা পড়ে ছিল। বুড়ো লোকটি নিজের হাতে তুলে নিল বন্দুকটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর টুক টুক করে হেঁটে চলে গেল সেই গোল আগুনটার কাছে। বন্দুকটা ছুঁড়ে দিল আগুনের মধ্যে। আবার জারোয়াদের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে অদ্ভুত ভাষায় কী যেন বলল।

অমনি চার-পাঁচজন জারোয়া এগিয়ে এসে একজন সাহেবকে মাটি থেকে উঁচু করে তুলল। তারপর চ্যাংদোলা করে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল বুড়োটির দিকে। সাহেবটা এবার চ্যাঁচাতে লাগল, "হেই, হোয়াট আর য়ু ডুইং... লীভ মি অ্যালোন। হেই!"

জারোয়ারা সাহেবটিকে বুড়ো লোকটির কাছে নিয়ে এল। বুড়ো লোকটি হাত তুলে দেখাল আগুনের দিকে। তারপর সন্তু কিছু বোঝবার আগেই জারোয়ারা সাহেবটিকে ছুঁড়ে দিল আগুনের মধ্যে। ঠিক যেমনভাবে লোকে জলের মধ্যে পাথর ছোঁড়ে। শেষ মুহূর্তে সাহেবটি প্রচণ্ডভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিল আঁ আঁ করে। আগুনের মধ্যে পড়েই সব থেমে গেল। তার আর কোনও চিহ্ন রইল না। একটু ধোঁয়া পর্যন্ত বেরুল না।

সন্তু দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলল। চোখের সামনে এরকমভাবে কোনও মানুষকে মরতে কে কবে দেখেছে? সন্তুর মনে হল, সে বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু অজ্ঞান হলে চলবে না। তাকে পালাতে হবে।

বুড়ো লোকটি আবার কিছু একটা হুকুম দিতেই জারোয়ারা আর-একজন সাহেবকে চ্যাংদোলা করে তুলল। এবার সব কটা সাহেব একসঙ্গে চিৎকার শুরু করে দিল। সেটা চিৎকার না কান্না ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু জারোয়ারা কিছুই গ্রাহ্য করল না। তারা তাকে নিয়ে গেল আগুনের কাছে।

সাহেবটি সেই বুড়ো লোকটিকে কেঁদে কেঁদে বলল, "ইউ, ইউ আর নট আ জারোয়া...ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ? প্লিজ ফরগিভ মী, স্পেয়ার মাই লাইফ, প্লীজ..."

বুড়ো লোকটি কিছুই বলল না। চিক করে মাটিতে থুতু ফেলল, তারপর আগুনের দিকে আঙুল দেখিয়ে জারোয়াদের দিকে তাকাল।

জারোয়ারা দ্বিতীয় সাহেবটিকেও আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্য যেই উঁচু করে তুলেছে, অমনি দড়াম করে একটা গুলির শব্দ হল। জঙ্গলের মধ্য থেকে একটা গুলি ছুটে এসে লাগল একজন জারোয়ার হাতে। সবাই সেদিকে ফিরে তাকাল।

দূর থেকে স্তম্ভিত হয়ে সন্তু দেখল রিভলভার হাতে নিয়ে জঙ্গলের মধ্য থেকে কাকাবাবু সেই ফাঁকা জায়গাটায় চলে এলেন। এক হাতে ক্রাচ নিয়ে তিনি লাফিয়ে-লাফিয়ে হাঁটছেন। তাঁর রিভলভারটা সোজা সেই বুড়ো লোকটির বুকের দিকে তাক করা।

◀ ৯ ▶

দাশগুপ্তর মনটা আজ একদম ভাল নেই। পুলিশের এস পি সাহেবের কাছ থেকে ফেরার পথে সে বারবার চমকে-চমকে উঠছে। সন্ধে হয়ে গেছে, এতক্ষণে সন্তু আর মিঃ রায়চৌধুরীর কী অবস্থা হয়েছে কে জানে! জারোয়ারা কি ওদের এখনও দেখতে পায়নি? জারোয়ারা কারুকে ছাড়ে না, দেখামাত্র বিষাক্ত তীর মারে। ইস্, শুধু-শুধু ওঁদের প্রাণ যাবে! মিঃ রায়চৌধুরী যে কোনও কথাই শুনলেন না। জোর করে নেমে গেলেন ঐ দ্বীপে। নিজে থেকে কেউ ওখানে যায়? ভদ্রলোকের একটা পা খোঁড়া, তবু এত সাহস! আর সন্তু তো বাচ্চা ছেলে, সে-ও কাকাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে মরবে। কাল সকালেই হয়তো দেখা যাবে, ওদের লাশ সমুদ্রের জলে ভাসছে।

আর এস পি সাহেবও যা গোঁয়ার! কিছুতেই ওঁদের উদ্ধার করতে যেতে রাজি হলেন না। দিল্লি থেকে হুকুম না পেলে তিনি যাবেন না। দিল্লি থেকে হুকুম আসতে অন্তত দু'-তিন দিন লেগে যাবে, তারপর আর ওদের মৃতদেহও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দাশগুপ্ত হাঁটতে হাঁটতে এসে টুরিস্ট হোমের খাবার ঘরের একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল। চেঁচিয়ে বলল, "কে আছ, এক কাপ চা দেবে?"

সেখানকার বেয়ারা কড়কড়ি এসে বলল, "হ্যাঁ বাবু, চা দিচ্ছি। আর কী খাবেন?"

দাশগুপ্ত বলল, "আর কী খাব! তোমার মাথা খাব!"

কড়কড়ি হাসতে হাসতে নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "এটা খেতে পারবেন না বাবু, বড় শক্ত!"

দাশগুপ্ত রেগে উঠে বলল, "ইয়ার্কি করতে হবে না, চা নিয়ে এসো শিগগির।"

"সেই বাবুরা কোথায় গেল?"

"কে জানে! সে বাবুরা আর ফিরবেন কিনা।"

"অ্যাঁ? সে কী কথা? ওঁদের মালপত্র রয়েছে যে! সেই খোকাবাবু আর সেই বুড়োবাবু, তাঁরা আর ফিরবেন না? তাঁদের কী হয়েছে?"

"তাঁদের জারোয়ারা ধরে নিয়ে গেছে।"

একথা শুনে কড়কড়ি একেবারে হাউমাউ করে উঠল। মাথা চাপড়ে বলতে লাগল, "কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ!"

কড়কড়ির কান্না শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল আরও দু'-তিনজন লোক। তারা অবাক হয়ে গেছে। যখন তারাও শুনল যে, সন্তু আর কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে জারোয়ারা, খুব দুঃখ হল তাদের। জারোয়ার হাতে পড়লে যে আর কেউ

বাঁচে না, তা ওরা সবাই জানে। ওরা দাশগুপ্তকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনতে লাগল।

এমন সময় আকাশে একটা শব্দ উঠল। দাশগুপ্ত চমকে উঠে বলল, "কী ব্যাপার? এখন কিসের শব্দ?"

কড়কড়ি বলল, "একটা এরোপ্লেন আসছে বাবু!"

দাশগুপ্ত চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলল, "প্লেন, এই সময়? কিসের প্লেন? সন্ধের পর কখনও এখানে প্লেন আসে?"

সকলেই তখন ভাবল, সত্যিই তো, পোর্ট ব্লেয়ারে তো প্লেন আসে দুপুরে। কোনও-দিন তো সন্ধ্যের পর এখানে কোনও প্লেন আসেনি। তাহলে এটা কিসের প্লেন?

প্লেনটা আকাশে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। তার মানে, এখানেই নামবে।

দাশগুপ্ত হাত পা ছুঁড়ে বলল, "ট্যাক্সি! আমার এক্ষুনি একটা ট্যাক্সি চাই। ফোন করো ট্যাক্সির জন্য। না, না, ফোন করতে হবে না, দেরি হয়ে যাবে। আমি নিজেই যাচ্ছি।"

দাশগুপ্ত টুরিস্ট হোমের বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোজা রাস্তা দিয়ে দৌড়তে লাগল। খানিকটা বাদেই রাস্তায় একটা ট্যাক্সি আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল মাঝরাস্তায়। সেই ট্যাক্সিতে দু'জন লোক ছিল। দাশগুপ্ত হাত জোড় করে বলল, "আমার বিশেষ দরকার, আমাকে এক্ষুনি একবার এয়ারপোর্ট যেতে হবে। যেতেই হবে! আপনারা দয়া করে নেমে পড়বেন?"

দাশগুপ্তর রকম-সকম দেখে মনে হল, সে পাগল হয়ে গেছে। লোক দুটি হতভম্ব হয়ে নেমে গেল। দাশগুপ্ত ট্যাক্সিতে উঠে বসেই বলল, "জলদি চালাও, এয়ারপোর্ট। জলদি!"

দাশগুপ্ত যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছল, তার আগেই প্লেনটা নেমে গেছে। এয়ারপোর্টে অনেক পুলিশ, স্বয়ং এস পি সাহেবও উপস্থিত। নিশ্চয়ই হোমরা-চোমরা কেউ এসেছে।

দাশগুপ্ত একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করল, "কে এসেছেন? কে উনি?"

পুলিশটি বলল, "হোম সেক্রেটারি সাহেব এসেছেন!"

দাশগুপ্ত আনন্দে একেবারে নেচে উঠল। এত বড় সৌভাগ্যের কথা ভাবাই যায় না। এস পি সাহেব এই হোম সেক্রেটারির কাছ থেকেই অনুমতি আনার কথা বলেছিলেন। সেই হোম সেক্রেটারি নিজেই দিল্লি থেকে এখানে এসে উপস্থিত! কোনও গুরুতর ব্যাপার তাহলে আছেই।

হোম সেক্রেটারি একজন বেশ লম্বা মতন লোক। মাঝারি বয়েস। মাথার চুলগুলো বড়-বড়। তিনি বড়-বড় পা ফেলে গিয়ে একটা গাড়িতে উঠলেন। দাশগুপ্ত সেদিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করতেই কয়েকজন পুলিশ তাকে বাধা দিল।

দাশগুপ্ত তখন চেঁচিয়ে এস পি সাহেবকে লক্ষ্য করে বলল, "স্যার, ওঁর সঙ্গে আমার এক্ষুনি কথা বলা দরকার। সেই ব্যাপারটা..."

এস পি মিঃ সিং বললেন, "দাঁড়ান, ওঁকে একটু বিশ্রাম করতে দিন। উনি অতদূর থেকে সবে এসে পৌঁছেছেন—"

দাশগুপ্ত বলল, "একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না এখন। আপনি বুঝতে পারছেন না..."

কিন্তু ততক্ষণে হোম সেক্রেটারির গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। দাশগুপ্ত চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে সেদিকে ছুটে গিয়েও গাড়িটা থামাতে পারল না।

রাগে-দুঃখে দাশগুপ্তর চোখে জল এসে গেল। এবার আর সে এস পি সাহেবকে ভয় পেল না। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলল, "আপনাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। দিল্লি থেকে আমার ওপর অর্ডার দেওয়া আছে, মিঃ রায়চৌধুরীর যাতে কোনও রকম বিপদ না হয়, তার ব্যবস্থা করার। কিন্তু আপনি আমাকে কোনও সাহায্য করেননি। একথা আমি হোম সেক্রেটারিকে বলব।"

মিঃ সিং বললেন, "অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? হোম সেক্রেটারি যখন এসেই গেছেন, তখন ওঁর কাছ থেকে অনুমতি পেলেই আমি আপনাকে সাহায্য করব।"

দাশগুপ্ত বলল, "কিন্তু প্রতিটি মিনিট নষ্ট করা মানেই সাঙ্ঘাতিক ভুল করা।" দিল্লি থেকে খুব হোমরা-চোমরা কেউ এলে ওঠেন এখানকার সরকারি অতিথি-ভবনে। দাশগুপ্ত তা জানে। ট্যাক্সিটা রাখাই ছিল, সেটা নিয়ে সে আবার সেইদিকে ছুটল।

অতিথি-ভবনে দাশগুপ্ত আর এস পি মিঃ সিং পৌঁছল প্রায় একই সময়ে। এস পি সাহেব গটগট করে ঢুকে গেলেন ভেতরে। গেটের পুলিশ দাশগুপ্তকে আটকাতে যেতেই সে পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে বলল, "এটা হোম সেক্রেটারিকে দাও, তাহলেই তিনি বুঝবেন।"

হোম-সেক্রেটারির নাম কৌশিক ভার্মা। তিনি তখন ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে এক কাপ চা খাচ্ছিলেন। আর এস পি সাহেবকে বলছিলেন, "শুনুন, আমি এখানে এসেছি একটা বিশেষ কাজে। আমি গোপন রিপোর্ট পেয়েছি, কিছু বিদেশি গুপ্তচর আন্দামানে নিয়মিত যাতায়াত করছে। তারা কলকাতা আর দিল্লি থেকে কিছু-কিছু পাসপোর্ট চুরি করে ভারতীয় সেজে প্লেনে করে চলে আসছে আন্দামানে। কী তাদের উদ্দেশ্য, সেটা আমাদের জানা দরকার। আন্দামানের মতন একটা সাধারণ জায়গায় বিদেশিদের নজর পড়ল কেন?"

এস পি মিঃ সিং বললেন, "না স্যার, এখানে তো কোনও বিদেশি আসেনি অনেকদিন। বিদেশি কোনও টুরিস্ট এলে আমার অনুমতি ছাড়া তো এখানে ঢুকতেই পারবে না।"

মিঃ ভার্মা বললেন, "তারা কি আর টুরিস্ট সেজে আসবে? তারা ভারতীয় সেজে গোপনে ঢুকবে।"

মিঃ সিং বললেন, "না স্যার, বিদেশি এলে আমার নজরে পড়তই!"

এই সময় দাশগুপ্ত সেখানে ঢুকে পড়ে বলল, "স্যার, আমি সেই বিদেশিদের কথা জানি।"

এস পি অমনি ভুরু কোঁচকালেন। মিঃ ভার্মা মুখ তুলে দাশগুপ্তকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?"

দাশগুপ্ত বলল, "স্যার, আমি আপনার ডিপার্টমেন্টেই কাজ করি। দু'-বছর ধরে আন্দামানে আছি। আমার কাজ হল এখানকার অবস্থার ওপর লক্ষ্য রাখা। বিদেশি গুপ্তচরদের কথা প্রথমে আমিও বিশ্বাস করিনি। কিন্তু মিঃ রায়চৌধুরী আমার চোখের সামনে প্রমাণ করে দিয়েছেন—"

মিঃ ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "রায়চৌধুরী? কোন্ রায়চৌধুরী?"

দাশগুপ্ত বলল, "সেই যে মিঃ রায়চৌধুরী, যিনি আগে ভারত সরকারের কাজ করতেন, এখন রিটায়ার্ড, নানান জায়গায় রহস্যের সন্ধান করে বেড়ান..."

কৌশিক ভার্মা চমকে উঠে বললেন, "ও সেই ওয়ান-লেগেড ম্যান? সেই দারুণ সাহসী মানুষটি? কোথায় তিনি? তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।"

দাশগুপ্ত বলল, "স্যার, তাঁর সাঙ্ঘাতিক বিপদ। এতক্ষণ তিনি বেঁচে আছেন কি না সন্দেহ!"

কৌশিক ভার্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, "সে কী কথা? কেন, তাঁর কী হয়েছে?"

"তিনি জারোয়াদের হাতে ধরা পড়েছেন।"

"হোয়াট? জারোয়াদের হাতে? কীভাবে ধরা পড়লেন? আপনারা কিছু করতে পারেননি?"

দাশগুপ্ত হাতজোড় করে বলল, "স্যার, আমি স্বীকার করছি, আমার কিছুটা দোষ আছে। আমি ওঁর সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু উনি আমার দিকে রিভলভার তুলে ভয় দেখিয়ে মিডল আন্দামানের একটা দ্বীপে নেমে গেলেন জোর করে। তারপর আমি রেসকিউ পার্টি পাঠাবার জন্য পুলিশের এস পি সাহেবকে অনুরোধ করেছিলাম। উনি রাজি হননি।"

কৌশিক ভার্মা এস পি সাহেবের দিকে তাকালেন। এস পি সাহেব তখন গোঁপে তা দিচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি গোঁপ থেকে হাত নামিয়ে বললেন, "আমি ঠিক কাজই করেছি। আমি সব ঘটনা জানিয়ে দিল্লিতে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি একটু আগে।"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "দিল্লি থেকে হুকুম আসতে যদি দু'-তিনদিন লাগে, ততদিন আপনি ওরকম একটা লোককে জারোয়াদের হাতে ছেড়ে রাখবেন?"

মিঃ সিং বললেন, "স্যার, তাছাড়া আমি কী করব বলুন? সেখানে পুলিশ পাঠালে জারোয়াদের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে যেত। গুলি খেয়ে বেশ কিছু জারোয়া মরত। একজন জারোয়াকেও মারার হুকুম নেই আমার কাছে। তাছাড়া সেই মিঃ রায়চৌধুরীকে আর বাঁচানো যাবে কি না সন্দেহ। কেউ বাঁচে না ঐ অবস্থায়।"

কৌশিক ভার্মা উঠে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে বললেন, "তা বলে কোনও চেষ্টাও করবেন না? মিঃ রায়চৌধুরী কে জানেন? ওরকম সাহসী লোক সাহেবদের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে ক'জন আছেন? ওরকম একজন মানুষ আমাদের দেশের গর্ব। সেই লোককে আমরা বাঁচাবার চেষ্টা করব না? ছি ছি ছি। এক্ষুনি রেসকিউ পার্টি পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আমি নিজে তাদের সঙ্গে যাব।"

এস পি সাহেব আস্তে আস্তে বললেন, "এই রাত্তিরবেলা? সে তো প্রায় অসম্ভব।"

"কেন, অসম্ভব কেন?"

"মোটরবোট নিয়ে অতদূর যেতে অন্তত চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা লাগবে—বনের মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার, সেখানে এখন যে নামবে তাকেই প্রাণ দিতে হবে। জারোয়ারা চব্বিশ ঘণ্টা লুকিয়ে থেকে পাহারা দেয়।"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "মোটরবোটের সঙ্গে সার্চ-লাইট লাগানো যেতে পারে না? সার্চ-লাইটের আলোয় অনেক দূর দেখা যাবে।"

"স্যার, আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, সার্চলাইটের আলোয় আর কতদূর দেখা যেতে পারে, দ্বীপটা অনেক বড়। তাছাড়া জারোয়ারা যুদ্ধ না করে পিছু হটবে না। তাতে দু'পক্ষের অনেক লোক মরবে। এটা আমাদের নীতি নয়।"

কৌশিক ভার্মা চিবুকে হাত রেখে চিন্তা করতে লাগলেন।

দাশগুপ্ত আস্তে আস্তে বলল, "স্যার, আমি একটা কথা বলতে পারি?"

"বলুন।"

"একটা উপায়ে এক্ষুনি সাহায্যের ব্যবস্থা করা যায়। বোটে না গিয়ে আমরা যদি হেলিকপটারে যাই, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায়। হেলিকপটারের ওপর থেকে আলো ফেলে খুঁজে দেখা যায় সারা জঙ্গলটা। তাতে যুদ্ধও হবে না। জারোয়ারা হেলিকপটারে তীর মারতেও পারবে না। ওদের তীর বেশি উঁচুতে পৌঁছয় না।"

কৌশিক ভার্মা টেবিলে এক চাপড় মেরে বললেন, "ঠিক! খুব ভাল কথা। সেই ব্যবস্থাই করা যাক।"

দাশগুপ্ত বলল, "সেই সঙ্গে প্রীতম সিংকেও নিয়ে গেলে ভাল হয়।"

"প্রীতম সিং কে?"

"প্রীতম সিং আগে এখানেই পুলিশের কাজ করতেন। উনি জারোয়াদের ভাষা

জানেন। হেলিকপটার থেকে উনি মাইকে জারোয়াদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। মিঃ রায়চৌধুরীকে যদি ওরা মেরে না ফেলে বন্দী করে রাখে, তাহলে প্রীতম সিং-এর কথায় হয়তো ছেড়ে দেবে। প্রীতম সিং ছাড়া আর তো কেউ জারোয়াদের সঙ্গে কথাই বলতে পারবে না।"

কৌশিক ভার্মা অবাক হয়ে বললেন, "সেরকম লোকও আছে? তবু আপনারা কিছু চেষ্টা করেননি!"

মিঃ সিং গম্ভীরভাবে বললেন, "হ্যাঁ, প্রীতম সিংকে ডেকে আমি তার মত নিয়েছিলাম। প্রীতম সিং-এর মতে এখন আর চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। প্রীতম সিংকে জারোয়ারা বনের ভেতরে ঢুকতে দেয় না।"

"প্রীতম সিং হেলিকপটার থেকে ওদের সঙ্গে কথা বলে আসল খবরটা অন্তত জেনে নিতে পারবে। হেলিকপটার কোথায় আছে? চলুন!"

"আমাদের হেলিকপটার নেই।"

দাশগুপ্ত আবার বলল, "এখানে নেভির হেলিকপটার আছে, স্যার। আমরা বললে দেবে না। কিন্তু আপনি অর্ডার দিলে ঠিকই দেবে।"

"আমি এক্ষুনি অর্ডার লিখে দিচ্ছি।"

কৌশিক ভার্মা তাঁর সেক্রেটারিকে ডেকে তক্ষুনি অর্ডার লিখিয়ে দিলেন। তারপর এস পি-কে বললেন, "একজন লোক দিয়ে এই চিঠি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন। তাকে জেনে আসতে বলুন আধঘণ্টার মধ্যে হেলিকপটার পাওয়া যাবে কি না!"

একজন লোক চিঠি নিয়ে তক্ষুনি ছুটে গেল। কিন্তু একটু বাদেই সে ফিরে এল খারাপ খবর নিয়ে।

নেভির দুটি মাত্র হেলিকপটার। একটা চলে গেছে নিকোবর, সেটা তিন-চারদিনের মধ্যে ফিরবে না। আর-একটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। সেটা সারাবার চেষ্টা চলছে।

কৌশিক ভার্মা চেঁচিয়ে উঠলেন, "সেটা সারিয়ে তুলতেই হবে...যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...আধ ঘণ্টা, অন্তত এক ঘণ্টার মধ্যে..."

দাশগুপ্তর মুখটা শুকিয়ে গেছে। এত চেষ্টা করেও শেষরক্ষা করা গেল না? হেলিকপটারটাও এই সময় খারাপ!

কৌশিক ভার্মা দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, "চলুন, আমি নিজে সেই হেলিকপটারটা দেখে আসতে চাই..."

◀ ১০ ▶

এদিকে তখন বনের মধ্যে কী হচ্ছে?

হঠাৎ গুলির শব্দ। তারপরেই কাকাবাবু একটামাত্র ক্রাচ নিয়ে প্রায় লাফাতে লাফাতে চলে এলেন সেই আগুনের কাছে। তাঁর রিভলভার সোজা সেই বুড়ো রাজার বুকের দিকে তাক করা।

জারোয়ারা প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি। তারপর কাকাবাবুকে দেখে সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।

কাকাবাবু বুড়ো রাজাকে আবার ইংরেজিতে বললেন, "আপনার লোকদের বলুন, কেউ যেন আমার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা না করে! কেউ আমার কাছে এলেই আমি তার আগে আপনাকে গুলি করে মেরে ফেলব!"

বুড়ো রাজা কিন্তু একটুও ভয় পাননি। তার পাকা ভুরুর নীচে চোখ দুটি ঘোলাটে। একদৃষ্টে তিনি কাকাবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর দুটো হাত তুললেন মাথার ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে জারোয়ারা থেমে গেল।

বুড়ো রাজা কাকাবাবুকে স্পষ্ট ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে?"

কাকাবাবু বললেন, "তার আগে বলুন, আপনি কে? আপনি জারোয়া নন, তা বুঝতেই পারা যায়। আপনি সভ্য মানুষ। আপনি কেন সাহেবগুলোকে পুড়িয়ে মারছেন?"

বুড়ো রাজা মাটিতে চিক করে থুতু ফেললেন। তারপর হাসলেন। সেই রকম একদৃষ্টিতে কাকাবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "তুমি আমাকে গুলি করলেও নিজে বাঁচতে পারবে না। তোমাকে এরা শেষ করে ফেলবে। তুমি এখানে কেন এসেছ?"

কাকাবাবু ডান দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, "এই আগুনটা দেখতে। এই সাহেবগুলোও সেইজন্যেই এসেছে।"

বুড়ো রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ওদের সঙ্গে এসেছ?"

কাকাবাবু বললেন, "না। কিন্তু আপনি এই অসভ্যদের সঙ্গে থেকে কি অসভ্য হয়ে গেছেন? জ্যান্ত মানুষদের পুড়িয়ে মারছেন?"

বুড়ো রাজা বললেন, "তোমাকে কে বলেছে, এই জারোয়ারা অসভ্য? আর এই সাহেবরা কিংবা তোমরা সভ্য? তোমাদের আমি ঘৃণা করি!"

"এদের ছেড়ে দিন!"

এবার বুড়ো রাজা ঝুঁকে-ঝুঁকে এগিয়ে আসতে লাগলেন কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবুর হাত কাঁপছে। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "খবর্দার, আমার কাছে আসবেন না, আমি গুলি করব, ঠিক গুলি করব!"

বুড়ো রাজা কোনও কথা না বলে হাসিমুখে তবু এগিয়ে আসতে লাগলেন।

কাকাবাবু বললেন, "আমি গুলি করব কিন্তু! আমার রিভলবার কেড়ে নেবার চেষ্টা করবেন না, তার আগেই আমি গুলি করব।"

বুড়ো রাজা একেবারে কাকাবাবুর মুখের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর কাকাবাবুর চোখের দিকে চেয়ে থেকে বাংলায় বললেন, "তোমরা এই আগুনটা দেখতে এসেছ? এই আগুনটা বুঝি এত দামি? ঠিক আছে, তোমাদের সবাইকে আমি এই আগুনের মধ্যে পাঠিয়ে দেব।"

দূরে, গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সন্তু শুনতে পেল, বুড়ো রাজা স্পষ্ট বাংলায় কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এই আগুনটা দেখতে এসেছ?"

সন্তু তার নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না।

কাকাবাবু দারুণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বাঙালি?"

বুড়ো রাজা সে-কথার উত্তর না দিয়ে কাকাবাবুর হাত থেকে রিভলবারটা কেড়ে নিতে গেলেন।

কাকাবাবু বললেন, "খবর্দার, আর এগোবেন না, আমি গুলি করব! ঠিক গুলি করব।"

বুড়ো রাজা মাথার ওপর দু'হাত তুলে বললেন, "করো গুলি করো, দেখি তোমার কত সাহস?"

কাকাবাবু গুলি করতে পারলেন না। তাঁর হাত কাঁপছে। তিনি বললেন, "আমি আপনাকে মারতে চাই না। আমি জানতে চাই, আপনি কে?"

বুড়ো রাজা কাকাবাবুর ডান হাতে জোরে একটা ধাক্কা মারতেই রিভলবারটা ছিটকে পড়ে গেল একটু দূরে। কাকাবাবু আবার সেটা কুড়িয়ে নেবার জন্য ঝুঁকতেই পড়ে গেলেন হুমড়ি খেয়ে। কাকাবাবুর যে একটা পা নেই, সেটা তাঁর মনে থাকে না সব সময়। কাকাবাবু পড়ে যেতেই বুড়ো রাজা তাঁর পিঠের ওপর একটা পা রেখে দাঁড়ালেন।

সমস্ত জারোয়ারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। তারা দেখল তাদের বুড়ো রাজা রিভলবারকেও ভয় পান না। কাকাবাবু জোর করে ওঠবার চেষ্টা করতে যেতেই দু'জন জারোয়া ছুটে এসে তাঁকে চেপে ধরল।

হাত-পা বাঁধা সাহেবগুলোও ভয়ের শব্দ করে উঠল।

দূরে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে সন্তু সব দেখল। তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। এবার ওরা কাকাবাবুকে মেরে ফেলবে? সন্তু একা কী করে তাঁকে বাঁচাবে? এখনও সন্তুকে কেউ দেখতে পায়নি।

বুড়ো রাজা চিক করে মাটিতে থুতু ফেললেন। তারপর খুব কড়া গলায় কাকাবাবুকে বললেন, "তোমাদের সবকটাকে আমি এক্ষুনি যমের বাড়ি পাঠাব। আমরা জারোয়ারা এখানে জঙ্গলের মধ্যে আপন মনে থাকি। আমরা কারুর কোনও ক্ষতি করি না। তোমরা কেন আমাদের বিরক্ত করতে আসো?"

কাকাবাবু বললেন, 'আপনি জারোয়া নন। আপনি কে?"

বুড়ো রাজা বললেন, "আমি এক সময় বাঙালি ছিলাম। এখন আমি এদেরই একজন। আমি আর তোমাদের মতন পরাধীন নই। আমি স্বাধীন।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কষ্ট হচ্ছে, আমাকে উঠে দাঁড়াতে দিন।"

বুড়ো রাজা বললেন, "তোমার সব কষ্ট এক্ষুনি শেষ করে দেব। তোমরা এই আগুনটা দেখতে এসেছিলে না? এই আগুনের মধ্যেই তোমরা যাবে। যত সব চোরের দল!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কিছু চুরি করতে আসিনি। আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম।"

"মিথ্যে কথা! যে-পাথরটা থেকে এই আগুন বেরুচ্ছে, তোমরা আসো সেই পাথরটা চুরি করতে। এর আগেও কয়েকটা সাহেব এসেছিল, সব কটাকে আমি যমের বাড়ি পাঠিয়েছি। তুমি বাঙালি হয়েও এই সাহেবদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছ। সাহেবের পা-চাটা! পরাধীন দেশের মানুষেরাই এরকম কাপুরুষ হয়ে যায়!"

"আমি ওদের সঙ্গে আসিনি। আমি ওদের পথ দেখিয়ে আনিনি।"

"চুপ! মিথ্যুক! কুকুর!"

বুড়ো রাজা কাকাবাবুকে আর কোনও কথা বলতে দিলেন না। জারোয়াদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা কাকাবাবুকে টেনে তুলল। এবার বুঝি আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবে!

সন্তু আর থাকতে পারল না। তার যা হয় হোক। কাকাবাবু যদি মরে যান, তাহলে সে-ও মরবে!

সে কাকাবাবু বলে চিৎকার করে তীরের মতন ছুটে এল। কোনও জারোয়া তাকে ধরতে পারল না, তার আগেই সে দৌড়ে কাকাবাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সন্তুকে দেখে কাকাবাবুও খুব অবাক হয়ে গেছেন। আস্তে আস্তে বললেন, "তুই চলে যাসনি? তোকে যে আমি বললাম।"

বুড়ো রাজা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছেলেটি কে?"

কাকাবাবু বললেন, "এ আমার ভাইপো। আপনি আমাকে মারতে চান মারুন, কিন্তু ওকে ছেড়ে দিন।"

"এইটুকু ছেলেকেও সাহেবদের চাকরের কাজে লাগিয়েছ?"

সন্তু বলল, "বিশ্বাস করুন, আমরা ঐ সাহেবদের সঙ্গে আসিনি। আমরা আলাদা এসেছি। ঐ সাহেবরা আমাদেরও মেরে ফেলতে চেয়েছিল।"

বুড়ো রাজা সন্তুকে বললেন, "আমার কাছে এসো!"

বুড়ো রাজার চোখের দিকে তাকালেই ভয় করে। তবু সন্তু এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল। বুড়ো রাজা একটা হাত বাড়িয়ে সন্তুর গালটা ছুঁলেন। রাজার

গায়ের সব চামড়া কুঁচকে গেছে। লম্বা লম্বা আঙুলের ছোঁয়ায় সন্তুর গাটা একবার শিরশির করে উঠল।

রাজা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর মুখে একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব ফুটে উঠল। তিনি আপনমনে বললেন, "আমার ঠিক এই বয়েসী একটা ভাই ছিল। জানি না সে এখনও বেঁচে আছে কি না।"

তারপর তিনি মুখ নামিয়ে সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?"

"সুনন্দ রায়চৌধুরী। আমার কাকাবাবু একজন খুব পণ্ডিত লোক। উনি মোটেই চোর নন।"

"অনেক পণ্ডিতও চোর হয়। টাকা-পয়সার লোভে তারাও সাহেবদের পা চাটে।"

"আমার কাকাবাবু মোটেই সেরকম লোক নন।"

"তাহলে সাহেবদের বাঁচাবার জন্য ওর এত দরদ কেন?"

এবার কাকাবাবু বললেন, "কোনও মানুষকেই মেরে ফেলা আমি পছন্দ করি না। এই সাহেবদের অন্য শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, মেরে ফেলা উচিত নয়!"

"ওরা আমার অন্তত পনেরোজন জারোয়াকে মেরে ফেলেছে। কেন? জারোয়ারা ওদের কোনও ক্ষতি করেছিল? জারোয়ারা এখানে শান্তভাবে থাকে—তারা তো অন্য কোনও জায়গায় গিয়ে অন্যদের মারতে যায় না।"

"সাহেবরা অন্যায় করেছে ঠিকই। সেজন্য তাদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। আপনি সভ্যজগতের মানুষ।"

"চুপ! তোমাদের সভ্যতাকে আমি ঘৃণা করি!"

কাকাবাবুকে তখনও দু'জন জারোয়া চেপে ধরে আছে। আগুনটা এখান থেকে খুব কাছে। গায়ে আঁচ লাগছে। কিন্তু ঐ আগুনের কতরকম রঙ। দেখতে খুব সুন্দর লাগে।

হঠাৎ ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। এরকমভাবে যখন-তখনই বৃষ্টি নামে এখানে। সন্তু ভাবল, বৃষ্টিতে কি আগুনটা নিভে যাবে? কিন্তু সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখল। বৃষ্টির জল, সেই আগুনের মধ্যে পড়তেই পারছে না। ছ্যাঁত ছ্যাঁত শব্দে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ছোট ছোট আগুনের ফুলকি হয়ে যাচ্ছে। যেন সেই আগুনের শিখার ওপর অসংখ্য জোনাকি। এরকম দৃশ্য সন্তু কখনও দেখেনি।

কাকাবাবু বিড়বিড় করে বললেন, এটা পৃথিবীর আগুন হতেই পারে না। এই আগুন অন্য কোনও জায়গা থেকে এসেছে।

বুড়ো রাজা বললেন, "এই আগুন জ্বলছে বহু বছর ধরে। কখনও নিভবে না।"

বৃষ্টি আরও জোরে এল। বুড়ো রাজা জারোয়াদের কিছু একটা হুকুম করে পেছন ফিরে চলতে লাগলেন। জারোয়ারা সন্তু আর কাকাবাবুকে ধরে রেখে তাঁর সঙ্গে

চলল। রাজা একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, জারোয়ারা সন্তু আর কাকাবাবুকে তার মধ্যে ঠেলে দিল।

ঘরটার মধ্যে প্রায় কিছুই জিনিসপত্র নেই। মাটিতে ছড়ানো রয়েছে একগাদা শুকনো পাতা, তার ওপর দুটো হরিণের শুকনো চামড়া। একটা আস্ত গাছ উঠে গেছে ঘরের এক কোণ দিয়ে। সেই গাছের ডালে একটা বাঁশের চোঙা ঝোলানো। তাতে জল ভর্তি। বুড়ো রাজা সেটা নিয়ে ঢক ঢক করে জল খেলেন খানিকটা। তারপর কাকাবাবুদের বললেন, "বসো।"

বসবার পর আর দুটো জিনিসের দিকে চোখ পড়ল ওদের। ঘরের এক পাশে এক টুকরো লাল কাপড়ের ওপর রাখা আছে একটা বই। বইটার মলাটের ওপর লেখা আছে 'গীতা'। আর তার পাশে একটা লোহার হাতকড়া। পুলিশরা চোর ডাকাতের হাতে যে-রকম হাতকড়া পরিয়ে দেয়।

ওরা দু'জনেই সেই দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বুড়ো রাজা বললেন, "ঐ দুটো আমার পুরনো কালের স্মৃতি। আর কিছুই নেই।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার বয়েস কত?"

বুড়ো রাজা বললেন, "হিসেব রাখি না। কী দরকার বয়েসের হিসেবে? আশি-নব্বই হতে পারে, একশোও হতে পারে। জানি না কতদিন আগে এসেছি।"

কাকাবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, "আমি বোধহয় আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনার নাম কি গুণদা তালুকদার?"

"কী বললে?"

"আপনি নিশ্চয়ই গুণদা তালুকদার?"

"কে গুণদা তালুকদার? তুমি তার কথা কী করে জানলে?"

"আমি আন্দামানে আসবার আগে, এখানকার সম্পর্কে যত কিছু বইপত্র আছে, তা সব পড়ে ফেলেছি। বহু বছর আগে আন্দামান জেল থেকে গুণদা তালুকদার নামে একজন বিপ্লবী পালিয়েছিলেন। ঐ জেল থেকে মাত্র ঐ একজনই পালিয়েছেন কিন্তু ধরা পড়েননি। সবাই তখন ভেবেছিল, গুণদা তালুকদার সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন। আজ এই হাতকড়াটা দেখেই হঠাৎ মনে হল..."

বুড়ো রাজা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "এসব কথা বইতে লেখা আছে? গুণদা তালুকদারকে এখনও লোকে মনে রেখেছে?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই! আপনার ছবি ছাপা হয়েছে কত বইতে। অবশ্য সে-ছবি দেখে এখন আপনাকে চেনা যায় না। আপনার জন্মদিনে উৎসব হয় অনেক জায়গায়। নেতাজীকে যেমন খুঁজে পাওয়া যায়নি, তেমনি আপনাকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। দেশের লোক আপনাকে শ্রদ্ধা করে।"

"নেতাজী কে?"

"সে কী, আপনি নেতাজীর নাম শোনেননি? সুভাষচন্দ্র বসু, আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে যিনি যুদ্ধ করেছিলেন ব্রিটিশের সঙ্গে?"

"সুভাষবাবু? তিনি যুদ্ধ করেছেন? কবে?"

"আপনি এসব কিছুই জানেন না?"

"না। আমার নাম লোকে মনে রেখেছে? তার মানে পুলিশ এখনও আমার খোঁজ করে?"

"পুলিশ? আপনাকে খুঁজবে কেন? ও সেই জন্যই আপনি আমাদের পরাধীন দেশের মানুষ বলছিলেন? আমাদের দেশ তো বহুদিন আগে স্বাধীন হয়ে গেছে। এই যে সন্তু, ও তো স্বাধীন দেশে জন্মেছে। ভারত এখন পৃথিবীর একটি প্রধান দেশ।"

"স্বাধীন হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। আপনি দেশের জন্য কত লড়াই করেছেন, জেল খেটেছেন, আর সেই খবরটা রাখেন না?"

"আমি গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে বাইরের কোনও লোকের সঙ্গে কথাই বলিনি।"

"আপনার কথা জানতে পারলে সবাই দারুণ খুশি হবে। সারা দেশ আপনাকে নিয়ে উৎসব করবে।"

"আমি আর কোথাও যাব না। আমি এইখানে খুব ভাল আছি।"

"আপনি এখানে এলেন কী করে? জারোয়ারা আপনাকে রাজা করে নিল?"

"আমি একটা ছোট ভেলা নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়েছিলাম। ঝড়ে সেই ভেলা উল্টে গেল। আমি মরেই যেতাম। অজ্ঞান অবস্থায় ভাসতে ভাসতে এই দ্বীপে এসে ঠেকেছিলাম। আমাকে এরা মারেনি কেন জানি না। তখনও আমার এক হাতে হাতকড়া ঝুলছিল। এরা মোটেই হিংস্র নয়। এদের যদি কেউ বিরক্ত না করে, এরা কখনও অন্য মানুষকে মারে না। এরা আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ করে তুলেছিল। সে কতকাল আগের কথা!"

"কিন্তু আপনি তো এদের সভ্য করে তুলতে পারতেন!"

"চুপ, ও কথা বলো না! সভ্য মানে কী? তোমরা সভ্য আর এরা অসভ্য? এখানে কেউ চুরি করে না, মিথ্যে কথা বলে না। এখানে সবাই খাবার একসঙ্গে ভাগ করে খায়। এখানে কোনও রোগ নেই। এর থেকে বেশি সুখ মানুষ আর কী চায়? আমিই এদের বারণ করেছি তোমাদের মতন সভ্য লোকদের সঙ্গে মিশতে। তোমরা এদের নষ্ট করে দেবে!"

"আপনার মতন একজন মানুষ এখানে এইভাবে লুকিয়ে আছেন, একথা আমার কাছে শুনলেও কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"তোমরা কেন এই জারোয়াদের ওপর অত্যাচার করতে আসো?"

"আমি বন্ধুত্ব করতে এসেছি।"

"তোমারও ঐ পাথরটার ওপর লোভ আছে নিশ্চয়ই?"

"কোন্ পাথরটা?"

"যেটা দিয়ে আগুন জ্বলে?"

"ওটার কথা আমি জানতামই না। তবে আন্দাজ করেছিলাম, এরকম একটা মহা-মূল্যবান জিনিস এখানে আছে। সাহেবরা আগেই টের পেয়েছে নিশ্চয়ই।

"ওটা কী তুমি বুঝতে পেরেছ?"

"নিশ্চয়ই ওটা কোনও উল্কা। কিংবা অন্য কোনও গ্রহের ভাঙা টুকরো। পৃথিবীতে এরকম কিছু কিছু মাঝে-মাঝে এসে পড়ে। অনেকগুলো আসার পথেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু এটা বহু বছর ধরে জ্বলছে। এটার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোনও ধাতু আছে, যা আমাদের পৃথিবীতে নেই। সে রকম নতুন ধাতুর আবিষ্কার হলে তার সাঙ্ঘাতিক দাম হবে। পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে হৈচৈ পড়ে যাবে।"

"জারোয়ারা আগুন জ্বালাতে পারে না। এই আগুন থেকেই তারা সব কাজ চালায়। সেই আগুন চুরি করতে চায় কেন সভ্য মানুষ?"

"তা বলে একটা নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হবে না? এর বদলে ওদের আমরা হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ দেশলাই দিতে পারি—"

"না, এটা প্রকৃতির দান ওরা তাই নিয়েছে। ওরা সভ্য মানুষদের কাছ থেকে কিছুই চায় না। তোমাদের আমি ছেড়ে দিতে পারি এক শর্তে, তোমরা এই আগুনের কথা কখনও কারুকে বলতে পারবে না।"

"কিন্তু আমরা আপনাকেও নিয়ে যেতে চাই।"

"আমাকে?"

"দেশ স্বাধীন হয়েছে, আপনি একবার দেখতে আসবেন না? একবার দিল্লিতে আর কলকাতায় চলুন। দেখবেন, কত কী বদলে গেছে!"

"না, আমি যাব না!"

এই সময় বাইরে হঠাৎ দারুণ একটা গোলমাল শোনা গেল। ডিসুম্ ডিসুম্ করে শব্দ হল বন্দুকের গুলির।

ওরা তিনজনই চমকে উঠল।

বুড়ো রাজা উঠে গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়ালেন। তারপর বাইরে একবার তাকিয়েই কাকাবাবুর দিকে মুখ ফেরালেন। আস্তে আস্তে বললেন, "তোমার জন্যই এবার আমাদের সর্বনাশ হল!"

সন্তুও লাফিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে। সে দেখল, সেই সাহেবগুলো

হাতের বাঁধন খুলে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। তিন-চারজনের হাতে বন্দুক, এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছে চারদিকে।

বুড়ো রাজা বললেন, "এবার ওরা সবাইকে মেরে ফেলবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি ঘরের মধ্যে ঢুকে আসুন। বাইরে যাবেন না!"

বুড়ো রাজা বললেন, "ঘরের মধ্যে ঢুকলেও বাঁচা যাবে না। ওদের কাছে লাইট মেশিনগান আছে। ওরা আমার লোকজনকে মারছে!"

সত্যিই তাই। কয়েকজন জারোয়া প্রাণের ভয় না করে সাহেবদের দিকে তাড়া করে আসছিল, সাহেবরা কট্ কট্ কট্ কট্ করে গুলি চালাল, সঙ্গে সঙ্গে তারা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। জারোয়াদের বিষাক্ত তীর দু'জন সাহেবের গায়ে লাগল, কিন্তু তাতে তাদের কিছুই হল না। সাহেবরা আগেই বিষ প্রতিষেধক ইনজেকশন নিয়ে নিয়েছে।

কাকাবাবুকে ঠেলে বুড়ো রাজা বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে। দু'হাত উঁচু করে ইংরিজিতে চেঁচিয়ে বললেন, "হোল্ড অন্!"

সঙ্গে সঙ্গে একজন সাহেব হিংস্রভাবে ঘুরে দাঁড়াল সেই দিকে। তার হাতে একটা বেঁটে আর মোটা ধরনের বন্দুক। সন্তু বুঝল, ওটারই নাম বোধহয় লাইট মেশিনগান।

সন্তুর মনে হল, সাহেবটি এক্ষুনি বুড়ো রাজাকে মেরে ফেলবে।

কিন্তু বুড়ো রাজার দারুণ সাহস। তবু তিনি লাঠি ঠুকতে ঠুকতে একপা একপা করে এগিয়ে গেলেন সাহেবদের দিকে। তারপর ইংরিজিতে বললেন, "তোমরা আমার লোকদের শুধু-শুধু মেরো না। তোমরা যা চাও, তাই নিয়ে যাও।"

তিনি জারোয়াদের দিকে তাকিয়ে কী একটা অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করলেন। অমনি তারা সার বেঁধে পেছিয়ে যেতে লাগল। সেইসঙ্গে মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। সেই শব্দটা ঠিক কান্নার মতন।

আর-একজন সাহেব এগিয়ে এসে খুব নিষ্ঠুরভাবে প্রচণ্ড এক চড় কষাল বুড়ো রাজার গালে। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন হুমড়ি খেয়ে। সাহেবটা বুড়ো রাজার বুকের ওপর পা তুলে বলল, "একে এক্ষুনি মেরে ফেলব! এই বুড়োটাই যত নষ্টের মূল। এর হুকুমেই আমাদের একজন বন্ধুকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এতক্ষণে আমাদেরও মেরে ফেলত।"

মেশিনগান-হাতে সাহেবটি বলল, "ওকে এক্ষুনি মেরো না, একটু পরে। ওর কাছ থেকে আরও কিছু খবর জানা যেতে পারে।"

যে লতা দিয়ে সাহেবদের বাঁধা হয়েছিল, সেই লতা দিয়েই ওরা বেঁধে ফেলল বুড়ো রাজাকে।

সেই অবস্থাতেও বুড়ো রাজা বললেন, "আমাকে মারার চেষ্টা কোরো না। তাহলে তোমরা একজনও বেঁচে ফিরতে পারবে না এখান থেকে। তোমরা যা চুরি করতে এসেছ, তাই নিয়ে ফিরে যাও!"

একজন সাহেব বুড়ো রাজার মুখে থুতু ছিটিয়ে দিল।

সন্তু আর কাকাবাবু সেই কুঁড়ে ঘরের দরজার কাছে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। মাটিতে শুয়ে থাকলে হঠাৎ গায়ে গুলি লাগে না। বুড়ো রাজার এই দুর্দশা দেখে ওরা শিউরে উঠল।

কাকাবাবু আফশোস করে বললেন, "ইস, আমার রিভলবারটা যদি এখন কাছে থাকত!"

সন্তু দেখল, খানিকটা দূরে মাটির ওপরে কাকাবাবুর রিভলবারটা পড়ে আছে। একজন সাহেবের পায়ের কাছে।

কিন্তু চারজন সাহেবের হাতে বন্দুক একজনের হাতে লাইট মেশিনগান, কাকাবাবু শুধু একটা রিভলবার নিয়ে কী করতেন?

একজন সাহেবের কাঁধে ঝোলানো আছে একটা ব্যাগ। সে সেটা খুলে ফেলল। তার মধ্য থেকে বেরুল অনেক কিছু। নানারকম যন্ত্রপাতি আর একটা খুব মোটা ফিতের মতন জিনিস গোল পাকানো। সেটা খুলে ফেলতেই দেখা গেল, সেটা আসলে একটা বিরাট লম্বা ক্যাম্বিসের জলের পাইপ। তার একটা মুখ ধরে দু'জন সাহেব ছুটে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

একটু বাদেই সেই পাইপটা ফুলে উঠল আর তার অন্য মুখ দিয়ে জল বেরুতে লাগল। আর দু'জন সাহেব সেটা নিয়ে গেল আগুনটার দিকে।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "ওরা ঝর্না থেকে জল আনছে।"

সন্তুও ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওরা আগুন নেভাতে চাইছে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "যে পাথরটা থেকে ঐ আগুন বেরুচ্ছে, সেটার সংঘাতিক দাম। কোটি কোটি টাকা। ওরা সেটা চুরি করতে এসেছে। ওটা নিশ্চয়ই অন্য কোনও গ্রহের টুকরো কিংবা উল্কা। হয়তো ওর মধ্যে এমন অনেক নতুন ধাতু আছে, যা পৃথিবীর মানুষ কখনও দেখেনি। ওগুলো পেলে আমাদের বিজ্ঞানের অনেক নিয়ম উল্টে যেতে পারে।"

সন্তু বলল, "সাহেবগুলো ঐ পাথরটা যে এখানে আছে তা জানল কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীতে কোথায় কখন উল্কাপাত হয়, অনেক বৈজ্ঞানিক তার খবর রাখেন। সবগুলোরই সন্ধান পাওয়া যায়, শুধু এটারই পাওয়া যায়নি। তবে এই লোকগুলো বৈজ্ঞানিক নয়। এরা যেমন হিংস্র আর নিষ্ঠুর, তাতে মনে

হয় এরা একটা ডাকাতের দল। কোনও বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে খবর পেয়ে এখানে চলে এসেছে।"

সন্তু বলল, "ওদের মধ্যে একজন পাঞ্জাবীও তো রয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঐ পাঞ্জাবীটি ওদের পথ দেখিয়ে এনেছে। নিশ্চয়ই অনেক টাকা দিয়ে হাত করেছে ওকে।"

তারপর আর ওরা কথা বলতে পারল না। অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল আগুনের দিকে।

সাহেবরা পাইপে করে আগুনের মধ্যে জল ছেটাতেই একটা আশ্চর্য সুন্দর জিনিস হল। আগুনের মধ্যে জল পড়তেই সেই জল লক্ষ লক্ষ রঙিন ফুলঝুরি হয়ে উঠে আসতে লাগল ওপরের দিকে। সমস্ত জায়গাটা লাল-নীল আলোয় ভরে গেল। আগুন নেভার কোনও চিহ্নই দেখা গেল না।

সাহেবরা তবু থামবে না। তারা জল ছিটিয়েই যেতে লাগল। আর সন্তু একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল সেই ফুলঝুরি। এত সুন্দর রঙের খেলা সে কখনও দেখেনি। এখন আর ভয়ের কথা, বিপদের কথা তার মনে পড়ছে না।

কাকাবাবু বললেন, "ও আগুন এই পৃথিবীর নয়। পৃথিবীর জল দিয়ে ঐ আগুন নেভানো যাবে না। ঐ আগুনেই পাথরটা পুড়ে পুড়ে একদিন শেষ হয়ে যাবে।"

সাহেবরা এবার একটা কৌটো থেকে মুঠো মুঠো পাউডার ছড়াতে লাগল আগুনে। তাতেও কাজ হল না কিছুই। পাউডারগুলো পড়তেই দপ্ করে এক-একটা শিখা বেরিয়ে আসতে লাগল।

তাতেও নিরাশ হল না সাহেবরা। এবার একটা সরু লম্বা গাছের গুঁড়ির কাছে গিয়ে মেশিনগানের গুলি চালাল পঁচিশ তিরিশটা। তারপর গাছটাকে ধরে কাৎ করতেই সেটা ভেঙে গেল মড়াত করে।

ওরা চারজনে মিলে সেই গাছটাকে বয়ে এনে আগুনের মধ্যে তার একদিকটা ঢুকিয়ে দিল অনেকখানি। গুম করে একটা শব্দ হল। পাথরটার গায়ে গাছটার ধাক্কা লেগেছে।

তখন সাহেবরা উৎসাহ পেয়ে গাছটাকে আবার বার করে এনে খানিকটা পিছিয়ে এল। তারপর জোরে দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মারল আবার। আবার গুম করে শব্দ হল, আগুনের শিখাগুলো যেন নড়ে-চড়ে উঠল খানিকটা।

সন্তুরা দম বন্ধ করে দেখছে। তারা বুঝতে পেরেছে সাহেবদের মতলবটা কী! তারা গাছ দিয়ে ধাক্কা মেরে মেরে আগুনের ভেতর থেকে পাথরটাকে বার করে আনতে চাইছে। কিংবা আগুনসুদ্ধই পাথরটাকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে ঝর্নার মধ্যে ফেলবে।

কিন্তু একটু পরেই আর একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হল। পাথরটা সহজে নড়ানো

যায় না বলে ওরা খুব জোরে জোরে ধাক্কা মারছিল। এতবার ধাক্কা মারতে গিয়ে ঝোঁক সামলাতে না পেরে একজন সাহেব আগুনটার খুব কাছে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চুম্বকের মতন আগুন তাকে টেনে নিল ভেতরে। ঠিক যেন একটা হাতের মতন একটা আহুনের শিখা বেরিয়ে টেনে নিয়ে গেল লোকটিকে। সে একটা বীভৎস চিৎকার করে উঠল, তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

শেষ মুহূর্তে সন্তু চোখ বুজে ফেলেছিল। আবার যখন চোখ মেলল, তখন দেখল, গাছটা ফেলে দিয়ে অন্য সাহেবরা ভয়ে পালিয়ে আসছে। কাকাবাবু কপালের ঘাম মুছছেন।

সাহেবটা আগুনে পুড়ে যাবার সময় দূরের জারোয়ারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগান হাতে সাহেবটি সেদিকে এক ঝাঁক গুলি চালাল।

বুড়ো রাজা হাত পা বাঁধা অবস্থাতেই আবার হুকুমের সুরে চেঁচিয়ে বললেন, “ওদের মেরো না! আমি হুকুম দিলে ওরা তোমাদের এখনও শেষ করে দিতে পারে!”

সাহেবটা অসম্ভব রেগে গেল সেই কথা শুনে। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, “বুড়ো বদমাশ, এবার তোকেই আগুনে পোড়াব। এই ল্যারি, এই বুড়োটাকে তুলে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দে তো!”

অন্য সাহেবরা কাছাকাছি এক জায়গায় হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজন সঙ্গী তাদের চোখের সামনে আগুনে পুড়ে গেল! ব্যাপারটা ওরাও যেন সহ্য করতে পারছে না।

মেশিনগান-হাতে সাহেবটিই বোধহয় ওদের সর্দার। সে কিন্তু দমেনি। সে আবার চিৎকার করে বলল, “ল্যারি, এদিকে এসো, এই বুড়োটাকে আগুনে ফেলে দাও!”

ওপাশ থেকে ল্যারি উত্তর দিল, “জ্যাক, পাথরটা পাবার কোনও আশা নেই। ওটা খুনে আগুন। চলো, আমরা এবার পালাবার চেষ্টা করি। নইলে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব!”

জ্যাক বলল, “পালাবার আগে প্রতিশোধ নিতে হবে. এই বুড়োটাকে আমার চোখের সামনে আগুনে পোড়াতে চাই। আমি জারোয়াদের দিকে মেশিনগান তুলে রাখছি, তুমি একে আগুনে ফেলে দাও!”

ল্যারি এগিয়ে এল।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, “সন্তু, আমার রিভলবারটা...”

সন্তু বুকে হেঁটে আস্তে আস্তে এগোল। রিভলবারটা যেখানে পড়ে আছে, সাহেবটা সেখান থেকে খানিকটা দূরে। সন্তু মাটির ওপর দিয়ে শুয়ে শুয়ে গেলে বোধহয় ওরা তাকে দেখতে পাবে না।

এই সময় তিনবার কাক ডেকে উঠল।

অর্থাৎ ভোর হয়ে আসছে। আলো ফোটার আর বেশি দেরি নেই। আরও কয়েকটা পাখির ডাক, আরও কী যেন শব্দ হচ্ছে দূরে।

সন্তু রিভলবারটা নিয়ে ফিরে আসার সময় পেল না। ল্যারি এসে বুড়ো রাজাকে পাঁজাকালো করে তুলে নিতেই কাকাবাবু আর থাকতে পারলেন না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাঙ্গারুর মতন লাফাতে লাফাতে ছুটে গেলেন ওদের কাছে। চিৎকার করে বললেন, "থামো, থামো! ওকে মেরো না!"

জ্যাক চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখল কাকাবাবুকে। তারপর বলল, "এই আর একটা শয়তান! ধর এটাকেও!"

কাকাবাবুকে দেখে বুড়ো-রাজা শান্তভাবে বললেন, "আমি কিছুতেই ইংরেজের হাতে মরব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তোমার জন্য সেই অপমানের মৃত্যুই আমাকে মরতে হচ্ছে। তুমিও মরবে!"

কাকাবাবু ল্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাকে একজন জারোয়া আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, সেই সময় আমি এসে তোমাক বাঁচিয়েছিলাম, ঠিক কি না? তুমি এই বুড়ো রাজাকে ছেড়ে দাও!"

ল্যারি তাকাল জ্যাকের দিকে। জ্যাক বলল, "এই দুটো বুড়োকেই আগুনের মধ্যে ফেলে দাও! নইলে আমরা পালাবার সময় এরা আমাদের পেছনে জারোয়াদের লেলিয়ে দেবে।"

ল্যারি তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যাক ধমক দিয়ে বলল, "দেরি করছ কী? দাও, ফেলে দাও!"

সঙ্গে সঙ্গে আকাশে একটা প্রচণ্ড ঘট্ ঘট্ শব্দ শোনা গেল। দূর থেকে শব্দটা এগিয়ে এল খুব কাছে। সবাই চমকে ওপরে তাকাল। একটা হেলিকপটার!

ল্যারি বলল, "জ্যাক, শিগগির পালাও! হেলিকপটার নিয়ে পুলিশ এসেছে!

হেলিকপটার দেখে সন্তুরও মনে হল, নিশ্চয়ই তাদের উদ্ধার করার জন্যই ওটা এসেছে। আর কোনও চিন্তা নেই। সে উঠে সোজা হয়ে বসল।

জ্যাক দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "একটা মোটে হেলিকপটার এসেছে, তাতে ভয় পাবার কী আছে? আমি এই মেশিনগান দিয়ে ওটাকে ফুঁড়ে দিচ্ছি এক্ষুনি। তোমরা সরে দাঁড়াও, কিংবা মাটিতে শুয়ে পড়ো!"

কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "সন্তু—"

সন্তু বুঝতে পারল না, কাকাবাবু তাকে কী করতে বলছেন। হেলিকপটারটা নীচের দিকে নেমে আসছে। আর একটু নীচে নামলেই জ্যাক গুলি চালাবে। তাদের সব আশা শেষ হয়ে যাবে।

সন্তুর খুব কাছেই পড়ে আছে কাকাবাবুর রিভলবারটা। সে সেটা চট করে তুলে নিল। কোনও চিন্তা না করেই সে দুটো গুলি চালিয়ে দিল জ্যাকের দিকে। গুলির

শব্দে তার নিজেরই কানে তালা লেগে গেল, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল হাতে। সে চোখ বুজে ফেলল ভয়ে।

আবার চোখ খুলে দেখল, জ্যাক মাটিতে পড়ে গেছে, আর কাকাবাবু মেশিনগানটা তার হাত থেকে তুলে নিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে।

তারপর কাকাবাবু সেটা বাকি সাহেবদের দিকে ফিরিয়ে বললেন, "তোমরা সব চুপ করে সারি বেঁধে দাঁড়াও। কেউ একটু নড়বার চেষ্টা করলেই গুলি চালিয়ে শেষ করে দেব—"

ঘ্যাট ঘ্যাট ঘ্যাট ঘ্যাট শব্দ করে হেলিকপটারটা ঘুরতে লাগল ওদের মাথার ওপরে। একটু একটু করে নীচে নেমে আসছে। অনেকটা কাছে আসার পর সেটা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল। কে যেন মাইকে বলছে, "আকিলা কিলকিল টুংকা টাকিলা! আকিলা কিলকিল টুংকা টাকিলা!"

সন্তু অবাক হয়ে গেল। এ আবার কী?

সেই আওয়াজ শুনে জারোয়ারা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "টাকিলা! টাকিলা!"

হেলিকপটার থেকে আবার আওয়াজ ভেসে এল, "কাকিনা সুপি সুপি! কাকিনা সুপি সুপি!"

এবার জারোয়ারা কোনও উত্তর দিল না। সবাই বুড়ো রাজার দিকে তাকিয়ে রইল।

কাকাবাবু বুড়ো রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা কী বলছে?"

বুড়ো রাজা বললেন, "ঐ জিনিসটা থেকে কেউ একজন জারোয়া ভাষায় বলছে, মাঝখানে জায়গা ছেড়ে দিতে। ওটা এখানে নামবে।"

কাকাবাবু বললেন, "সবাইকে আপনি সরে যেতে বলুন! জায়গা করে দিতে বলুন!"

এবার হেলিকপটার থেকে ইংরিজিতে কেউ জিজ্ঞেস করল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আর ইউ দেয়ার? মিঃ রায়চৌধুরী, আর ইউ দেয়ার?"

কাকাবাবু চিৎকার করে বললেন, "ইয়েস, আই অ্যাম হিয়ার। রায়চৌধুরী স্পিকিং—"

কিন্তু হেলিকপটারের ঘ্যাটঘ্যাট আওয়াজে তাঁর কথা বোধহয় ওপরে পৌঁছল না, কারণ, ওরা সেই কথাই বারবার বলে যেতে লাগল।

কাকাবাবু সাহেবদের দিকে মেশিনগান তুলে রেখে, চোখ না সরিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "সন্তু, তোমার পকেটে রুমাল আছে?"

রিভলবার থেকে গুলি চালাবার পর সন্তু আচ্ছন্নের মতন হয়ে মাটিতেই বসে ছিল। এবার সে তাড়াতাড়ি উঠে বলল, "হ্যাঁ আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই রুমালটা বার করে মাথার ওপরে ওড়াতে থাকো।"

সন্তু তার সাদা রুমালটা বার করে ডান হাতে প্রাণপণে ঘোরাতে লাগল।

কাকাবাবু সাহেবদের হুকুম করলেন, "তোমরা সব মাটিতে বসে পড়ো। প্রত্যেকে হাত দুটো মাথার ওপরে তুলে রাখো।"

একজন সাহেব মাটিতে পড়ে থাকা একটা বন্দুকের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, কাকাবাবু বললেন, "সাবধান, একটু নড়লেই খুলি উড়িয়ে দেব!"

হেলিকপটারটা আস্তে-আস্তে ফাঁকা জায়গাটায় এসে নামল। প্রথমেই তার থেকে বেরিয়ে এল ধপধপে সাদা দাড়িওয়ালা একজন শিখ। সে হাত তুলে বলল, "টুংচা সংচু! টুংচা সংচু!"

বুড়ো রাজা বললেন, "টুংচা সংচু!"

সঙ্গে সঙ্গে সব জারোয়া সেই কথা বলে চেঁচিয়ে উঠল।

বৃদ্ধ শিখটি তখন হেলিকপটারের দিকে হাত নাড়তেই তার থেকে বেরিয়ে এল আরও কয়েকজন।

প্রথমেই লম্বা চেহারার কৌশিক ভার্মা, তারপর বেঁটে গোলগাল পরেশ দাশগুপ্ত, তারপর বিশাল গোঁফওয়ালা পুলিশের এস পি মিঃ সিং আর চারজন সৈন্য, তাঁদের প্রত্যেকের হাতে মেশিনগান।

পরেশ দাশগুপ্ত ছুটে এসে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরে খুশিতে লাফাতে-লাফাতে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি বেঁচে আছেন। আঃ, কী যে আনন্দ হচ্ছে! এই দেখুন, হোম সেক্রেটারি কৌশিক ভার্মা নিজে এসেছেন আপনাকে উদ্ধার করতে।"

কাকাবাবুর আনন্দ হলেও মুখে তা প্রকাশ করেন না। কৌশিক ভার্মাকে দেখে তিনি বললেন, "আপনার সোলজারদের বলুন, এই সাহেবগুলোকে ঘিরে ফেলতে। আমি আর এই ভারী মেশিনগানটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না!"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "এরা কারা?"

কাকাবাবু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "এরা ডাকাত!"

কৌশিক ভার্মা অবাক হয়ে বললেন, "জারোয়াদের মধ্যে ডাকাতি করতে এসেছে? কিসের লোভে? এদের কাছে কি সোনা আছে? হীরে আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "না, সে সব কিছু নেই। কিন্তু এইটা আছে।"

কাকাবাবু সেই রঙিন আগুনটার দিকে হাত দেখালেন।

দিনের আলো ফুটে উঠেছে। এই সময় আগুনের রঙ বদলে যায়। এই আগুনটার রঙ কিন্তু একইরকম আছে।

কৌশিক ভার্মা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "আশ্চর্য! এরকম আগুন কখনও দেখিনি। সাহেবরা এটা চুরি করতে এসেছিল? এটা কী?"

কাকাবাবু বললেন, "সে সব পরে বলব। আপনি জারোয়াদের দ্বীপে এসেছেন, আগে এখানকার রাজাকে নমস্কার করুন! ইনিই জারোয়াদের রাজা!"

হাত থেকে মেশিনগানটা ফেলে দিয়ে কাকাবাবু বুড়ো রাজার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

কৌশিক ভার্মা আরও অবাক হয়ে বললেন, "ইনি রাজা? মাই গড! ইনি তো জারোয়া নন?"

কৌশিক ভার্মা হাত জোড় করে নমস্কার করলেন বুড়ো রাজাকে।

কাকাবাবু বললেন, "না, ইনি জারোয়া নন। এঁর নাম গুণদা তালুকদার।"

বুড়ো রাজা আস্তে আস্তে বললেন, "সাহেবগুলোকে ভাল করে বেঁধে ফেলতে বলুন। এরা সাঙ্ঘাতিক লোক। আপনারা চলুন, আমার ঘরে বসে কথা বলা যাক।"

কাকাবাবু পরেশ দাশগুপ্তর কাঁধে ভর দিয়ে বুড়ো রাজার কুঁড়েঘরের দিকে এগোলেন। বুড়ো রাজা যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তারপর সন্তুকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন।

সন্তু কাছে যেতেই বুড়ো রাজা তার মাথায় খুব স্নেহের সঙ্গে হাত বোলাতে লাগলেন, তারপর কৌশিক ভার্মাকে বললেন; "এই ছেলেটি না-থাকলে আজ আমরা কেউ বাঁচতুম না। আপনারাও বাঁচতেন না।"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "তাই নাকি? কেন? এ কী করেছে?"

বুড়ো রাজা বললেন, "ঐ একজন সাহেবের হাতে মেশিনগান ছিল, সে গুলি চালিয়ে আপনাদের ঐ ফড়িঙের মতন যন্ত্রটায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারত।"

বুড়ো রাজা আগে কখনও হেলিকপটার দেখেননি, তাই নাম জানেন না।

কৌশিক ভার্মা বললেন, "তা হয়তো পারত। সাহেবগুলো মেশিনগান নিয়ে ডাকাতি করতে এসেছে, এ ভারী আশ্চর্য ব্যাপার। এই জঙ্গলের মধ্যে ডাকাতি?"

বুড়ো রাজা বললেন, "সাহেবগুলো আমাকে আর ওর কাকাকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। ঠিক সময় এই ছেলেটি রিভলবারের গুলি চালিয়ে সাহেবটির হাত থেকে মেশিনগানটা ফেলে দেয়। তাই তো আমরা সবাই বেঁচে গেলাম।"

কৌশিক ভার্মা প্রশংসার চোখে তাকালেন সন্তুর দিকে। তারপর তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "ব্রেভ বয়! এইটুকু ছেলে রিভলবার চালাতে জানে? টিপও নিশ্চয়ই খুব ভাল।"

সন্তু লজ্জা-লজ্জা মুখ করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। সে তো এমন কিছু করেনি। আনতাবড়ি একবার রিভলবার চালিয়ে দিয়েছে। সে যে এর আগে কখনও রিভলবার চালায়ইনি সে কথা আর বলল না।

কৌশিক ভার্মা বললেন, "হি মাস্ট গেট আ রিওয়ার্ড। আমরা শুধু জারোয়াদেরই ভয় পেয়েছিলাম, সাহেব ডাকাতদের কথা ভাবিইনি। সত্যিই সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা হয়ে যেতে পারত। কিন্তু আপনি এখানে কী করে এলেন?"

কথা বলতে-বলতে ওঁরা ঢুকলেন কুঁড়েঘরের মধ্যে। সেখানে সেই গীতা বইটি

আর বহুকালের পুরনো একজোড়া হাতকড়া দেখে কৌশিক ভার্মা আবার চমকে উঠলেন। তিনি বললেন, "আমরা জানতাম, সভ্য জগতের সঙ্গে জারোয়াদের কোনও সম্পর্কই নেই, অথচ দেখছি, তাদের রাজা একজন লেখাপড়া-জানা মানুষ!"

কাকাবাবু মাটির ওপরে বসে পড়েছেন। সেখান থেকে তিনি বললেন, "এই গুণদা তালুকদার এক সময় ছিলেন একজন নামকরা বিপ্লবী। আন্দামান জেল থেকে ইনি পালিয়ে যান। সে বহু-বহু বছর আগেকার কথা। সকলের ধারণা ইনি মারা গেছেন। স্বাধীনতার ইতিহাসের প্রত্যেক বইতে এঁর নাম আছে, ছবি আছে। এঁর জন্মদিনে উৎসব হয়!"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "হ্যাঁ, এখন আমারও মনে পড়েছে। এ যে দারুণ ব্যাপার। দিল্লিতে ফিরে গিয়ে এই খবর দিলে তো বিরাট হৈচৈ পড়ে যাবে! কিন্তু আপনি এখানে এলেন কী করে?"

বুড়ো রাজা বললেন, "এই হাতকড়ি বাঁধা অবস্থাতেই জেল থেকে পালিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আমাকে হাঙরে কুমিরে খেয়ে ফেলতে পারত। কিন্তু খায়নি। ভাসতে-ভাসতে এসে ঠেকেছিলাম এই দ্বীপে।"

"জারোয়ারা আপনাকে মারেনি?"

"জারোয়ারা এমনি-এমনি কাউকে মারে না। এরা অত্যন্ত সভ্য। তোমরাই এদের হিংস্র বানিয়েছ।"

"তারপর থেকে আপনি এখানে থেকে গেলেন?"

"হ্যাঁ। আমি পরাধীন ভারতবর্ষে থাকব না ঠিক করেছিলাম, তাই এখানে এদের নিয়ে স্বাধীন হয়ে থেকেছি। আমি আর বাইরের কোনও খবর রাখিনি।"

"এই আন্দামানে তো নেতাজী এসেছিলেন, কিছুদিনের জন্য স্বাধীন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, তাও জানেন না!"

"এই দ্বীপের বাইরের কোনও খবরই আমি রাখি না। ইচ্ছে করেই রাখতে চাইনি। আমি যে এখানে আছি, তা জানতে পারলেই ইংরেজ সরকার আবার আমাকে বন্দী করত। সুভাষবাবু যে কবে নেতাজী হলেন, একটু আগে পর্যন্ত তাও জানতাম না!"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "আশ্চর্য! সত্যি আশ্চর্য! কিন্তু গোটা ভারতবর্ষই তো অনেক দিন স্বাধীন হয়ে গেছে! আপনি সে খবরও পাননি?

কাকাবাবু বললেন, "উনি সে-কথাও বিশ্বাস করতে চাইছেন না। শুনুন, এই কৌশিক ভার্মা, ইনি গভর্নমেন্টের একজন বড় অফিসার। এঁকে জিজ্ঞেস করুন, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে সেই সাতচল্লিশ সালে। আপনি জওহরলাল নেহরুর নাম শুনেছিলেন তো?"

বুড়ো রাজা বললেন, "হ্যাঁ। মতিলাল নেহরুর ছেলে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়েছিল।"

"সেই জওহরলাল হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। সে-ও তিরিশ বছর আগে।"

"গান্ধী কোথায়?"

"গান্ধীজী মারা গেছেন স্বাধীনতার এক বছর পরে। আপনাদের সময়কার প্রায় কেউ-ই বেঁচে নেই। চলুন, আপনি দিল্লি চলুন, সেখানে গিয়ে সব শুনবেন!"

বুড়ো রাজা ভুরু তুলে বললেন, "কোথায় যাব? দিল্লি? কেন? আমি কোথাও যাব না—"

"সে কী, আপনি এখনও এখানে থাকতে চান?"

"নিশ্চয়ই! আমি এখানে জারোয়াদের নিয়ে পরম শান্তিতে আছি।"

"আপনি স্বাধীন দেশে একবার ঘুরে আসতেও চান না? আপনার অনেক আত্মীয়-স্বজন হয়তো এখনও বেঁচে আছে, তাদেরও দেখতে চান না একবার?"

"না।"

বুড়ো রাজা কিছুতেই তাঁর জারোয়া-রাজ্য ছেড়ে আর যেতে চান না কোথাও। কাকাবাবু আর কৌশিক ভার্মা অনেক করে বোঝাতে লাগলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনবেন না। শেষে একবার রেগে উঠে বললেন, "আপনারা যদি আমাকে জোর করে বন্দী করে নিয়ে যেতে চান, সেটা আলাদা কথা! তবুও সাবধান করে দিচ্ছি, আমাকে জোর করে নিতে গেলে সব জারোয়া একসঙ্গে মিলে বাধা দেবে। তারা প্রাণ দিয়েও আমাকে বাঁচাতে চাইবে।"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "না, না, আপনাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাব কেন? আপনি আমাদের শ্রদ্ধেয়। আপনি দেশ স্বাধীন করার জন্য এত কষ্ট করেছেন। কিন্তু আমরা ফিরে গিয়ে যখন আপনার কথা বলব, কেউ বিশ্বাস করবে না!"

সন্তু হঠাৎ বলে উঠল, "ছবি তুলে নিয়ে গেলে সবাই বিশ্বাস করবে।"

কাকাবাবু রাগ করে সন্তুর দিকে তাকালেন, সন্তু থতমত খেয়ে গেল। সে বুঝতে পারেনি, সে ভুল কথা বলে ফেলেছে।

সাদা দাড়িওয়ালা প্রীতম সিং এক পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। এবারে তিনি বললেন, "কেয়া তাজ্জব কি বাত্! আমি এতদিন জারোয়াদের সঙ্গে কথা বলেছি, কোনওদিন তারা জানতেও দেয়নি যে, তাদের একজন বাংগালী রাজা আছে। সেইজন্যই তারা বেশি ভেতরে ঢুকতে দিত না।"

বুড়ো রাজা বললেন, "সেটাই ছিল আমার হুকুম।"

কাকাবাবু হতাশভাবে বললেন, "তাহলে আপনি কিছুতেই যাবেন না?"

বুড়ো রাজা বললেন, "না।"

সন্তু কিছু না বুঝে এগিয়ে গিয়ে বুড়ো রাজার হাত ধরে বলল, "আপনি চলুন না আমাদের সঙ্গে! একবারটি গিয়ে সব দেখে শুনে আবার এখানে ফিরে আসবেন। জানেন, হাওড়া স্টেশনে মাটির তলা দিয়ে রাস্তা হয়েছে, আপনি তো সেসব দেখেননি!"

বুড়ো রাজা হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। সন্তুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ওরে, তুই আমাকে একথা বললি কেন? তোর মতন আমার একটা ছোট ভাই ছিল, জেলে আসবার আগে তাকে ঠিক এই বয়েসী দেখে এসেছি। তোকে দেখেই তার কথা মনে পড়ছে!"

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো আপনার সেই ভাই এখনও বেঁচে আছেন। আপনি গেলে তাকে দেখতে পাবেন!"

বুড়ো রাজা একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, তার দু' চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তারপর চোখের জল মুছে বললেন, "ঠিক আছে, আমি যাব! কিন্তু তার আগে তোমাদের কয়েকটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে!"

কাকাবাবু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী প্রতিজ্ঞা করতে হবে বলুন!"

বুড়ো রাজা বললেন, "তোমাদের কথা দিতে হবে, আমার এই জারোয়াদের কেউ কোনও ক্ষতি করবে না। এই দ্বীপে অন্য কেউ আসতে পাবে না। জারোয়াদের ঐ পবিত্র আগুন তোমরা নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে না। ওরা যে-রকমভাবে বাঁচতে চায়, সেইরকমভাবে থাকতে দেবে।"

কাকাবাবু তাকালেন কৌশিক ভার্মার দিকে।

কৌশিক ভার্মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "আমি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কথা দিচ্ছি, এগুলো সব মানা হবে। এগুলোই তো আমাদের নীতি।"

বুড়ো রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক আছে, তা হলে চলো, কিন্তু কয়েকদিন থেকেই আমি আবার ফিরে আসব কিন্তু!"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই। আমি নিজে সব ব্যবস্থা করে দেব।"

বাইরে প্রত্যেকটি সাহেবের হাত পিঠের দিকে মুড়ে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। সন্তু যে সাহেবটিকে গুলি করেছিল, সেও মরেনি, দুটো গুলিই লেগেছে তার কাঁধে। হেলিকপটারে কিছু ওষুধপত্র ছিল, তাই দিয়ে তাকে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সৈন্যদের পাহারায় সাহেবদের পাঠিয়ে দেওয়া হল সমুদ্রের দিকে। ওখান থেকে লঞ্চে করে নিয়ে যাওয়া হবে ওদের।

বাকিরা সবাই হেলিকপটারে যাবে।

কিন্তু বুড়ো রাজাকে হেলিকপটারে তোলার সময় সে একটা দৃশ্য হল বটে। বুড়ো রাজা জারোয়াদের ভাষায় বুঝিয়ে বললেন ওঁর চলে যাবার কথা। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি জারোয়া মাটিতে মুখ গুঁজে একটা অদ্ভুত করুণ শব্দ করতে লাগল। এই

ওদের কান্না। কান্নার সময় ওরা কারুকে মুখ দেখায় না। কয়েকটি জারোয়া মেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বুড়ো রাজাকে। তারা কিছুতেই ওঁকে যেতে দেবে না। তিনি হাত-পা নেড়ে অনেক কষ্টে ওদের বোঝাতে লাগলেন, তাঁর চোখ দিয়েও জল পড়ছে। তিনি মাটিতে মুখ-গোঁজা প্রত্যেকটি জারোয়ার গায়ে হাত দিয়ে বলতে লাগলেন, "আমি ফিরে আসব, ক'দিনের মধ্যেই ফিরে আসব!"

কৌশিক ভার্মা কাকাবাবুকে বললেন, "মানুষ মানুষকে যে এত ভালবাসতে পারে, আগে কখনও দেখিনি। এদের ভালবাসা কত আন্তরিক!"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ!"

তারপর এক সময় হেলিকপটার আকাশে উড়ল। সমস্ত জারোয়া একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে চিৎকার করতে লাগল, বুড়ো রাজাও হাত নাড়তে লাগলেন তাদের দিকে। একটু বাদেই হেলিকপটার চলে এল সমুদ্রের ওপর।

পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছতে বেশি দেরি লাগল না। দূর থেকেই দেখা যায় জেলখানাটা। ব্রিটিশ আমলের কুখ্যাত সেলুলার জেল। পোর্ট ব্লেয়ারে এখনও সেটাই সবচেয়ে উঁচু বাড়ি। আকাশ থেকে সেদিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন বুড়ো রাজা। একদিন তিনি এই জেল থেকে পালিয়েছিলেন। আজ সত্যিই সেখানে রাজার মতন ফিরে আসছেন।

পোর্ট ব্লেয়ারে থাকা হল মাত্র একদিন। এর মধ্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া হল কলকাতা আর দিল্লিতে। ঠিক হল, কলকাতায় প্রথমে তিনি তিনদিন থাকবেন। তারপর যাবেন দিল্লিতে। সেখানে যে ক'দিন তাঁর থাকতে ইচ্ছে হয় তিনি থাকবেন। তারপর যেদিন ফিরে আসতে চাইবেন, সেদিন আবার কলকাতা হয়ে ফিরবেন।

পরদিন বিশেষ বিমান ওঁদের নিয়ে এল কলকাতায়। দমদম এয়ারপোর্টে কী সাঙ্ঘাতিক ভিড়। হাজার হাজার মানুষ এসেছে জারোয়াদের রাজাকে দেখতে। আরও কত খবরের কাগজের লোক, ফটোগ্রাফার। আলোর ঝিলিক দিয়ে ফটো উঠছে ঘন ঘন। সন্তুরও ছবি উঠে যাচ্ছে খুব, কারণ বুড়ো রাজা তারই কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কিনা!

মাঝে মাঝেই ধ্বনি উঠছে, "গুণদা তালুকদার জিন্দাবাদ!"

এয়ারপোর্টে সন্তুর মা-বাবা, দুই দাদা, পাশের বাড়ির রিনি, বাবলু, পিংকুরাও এসেছে, কিন্তু সন্তু তো এক্ষুনি বাড়ি যাবে না। বুড়ো রাজার সঙ্গে এখন তাদেরও যেতে হবে রাজভবনে, সেখানে গভর্নর তাদের সম্বর্ধনা জানিয়ে মধ্যাহ্নভোজ খাওয়াবেন। লাটসাহেবের বাড়ি খাওয়া তো যে-সে কথা নয়।

লোকেরা এত ফুলের মালা দিচ্ছেন যে, তার ভারেই আরও ঝুঁকে পড়ছেন বুড়ো রাজা। এত ভিড়ের মধ্যে তাঁর কষ্ট হবে বলে কৌশিক ভার্মা তাড়াতাড়ি তাঁকে গাড়িতে তুললেন। কাকাবাবু আর সন্তুও সেই গাড়িতে।

গাড়ি এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। আবার কলকাতায় ফিরে সন্তুর খুব আনন্দ হচ্ছে। এবার যে বেঁচে ফিরে আসতে পারবে তাতেই খুব সন্দেহ ছিল।

সন্তু বুড়ো রাজাকে বলল, "জানেন তো, এই রাস্তাটার নাম ভি আই পি রোড। আপনাদের সময় তো এটা ছিল না।"

বুড়ো রাজা কোনও উত্তর দিলেন না।

কাকাবাবু বললেন, "তখন এসব জায়গাতেও জঙ্গল ছিল।"

গাড়ি চলতে লাগল, আর সন্তু নানান রকম খবর দিতে লাগল বুড়ো রাজাকে। এটা বিধান রায়ের মূর্তি, ঐ যে ঐখানে শিশু উদ্যান, এই জায়গাটার নাম কাঁকুরগাছি...

বুড়ো রাজা একটাও কথা বলছেন না।

গাড়ি মানিকতলা পেরিয়ে যখন বিবেকানন্দ রোড দিয়ে ছুটছে সেই সময় বুড়ো রাজা হঠাৎ "উঃ" শব্দ করে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন।

কৌশিক ভার্মা ও কাকাবাবু দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে বললেন, "কী হল? কী হল?"

বুড়ো রাজা উত্তর না দিয়ে 'আঃ আঃ' শব্দ করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

কৌশিক ভার্মা বললেন, "এ কী! উনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "সামনেই আমার এক বন্ধুর ডাক্তারখানা। ঐ যে ল্যাম্পপোস্টের পাশে—ওখানে গাড়ি থামান!"

কাকাবাবুর বন্ধু ডাক্তার, সামনেই তিনি বসে আছেন। সবাই মিলে ধরাধরি করে বুড়ো রাজাকে ভেতরের চেম্বারে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল।

ডাক্তারের ওষুধে একটু পরেই জ্ঞান ফিরল বুড়ো রাজার। ডাক্তারবাবু বললেন, "ওঁকে এক্ষুনি কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। হার্টের অবস্থা ভাল নয়।"

বুড়ো রাজা বললেন, "না, না—"

কাকাবাবু ঝুঁকে পড়ে বললেন, "আপনার কষ্ট হচ্ছে? হাসপাতালে গেলেই ভাল হয়ে যাবেন। এখন কলকাতায় ভাল ভাল হাসপাতাল আছে।"

বুড়ো রাজা বললেন, "না, না, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো!"

"ফিরে যাবেন? হ্যাঁ, যাবেন, কয়েকদিন পরে—"

বুড়ো রাজা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "না, এক্ষুনি। তোমাদের এখানে আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না! এখানকার বাতাস এত খারাপ, এখানে এত শব্দ, এত মানুষ, এত বাড়ি...আমার সহ্য হচ্ছে না...রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে দেখলাম মানুষ ভিক্ষে করছে, রোগা রোগা ছেলে, না না, আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো..."

কাকাবাবু কিছু বলতে গেলেন, তার আগেই দু'বার হেঁচকি তুললেন বুড়ো রাজা। অতি কষ্টে ফিসফিস করে বললেন, "আমি পারছি না। এখানে থাকতে পারছি না, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, এত ধুলো এখানকার বাতাসে, এত শব্দ..."

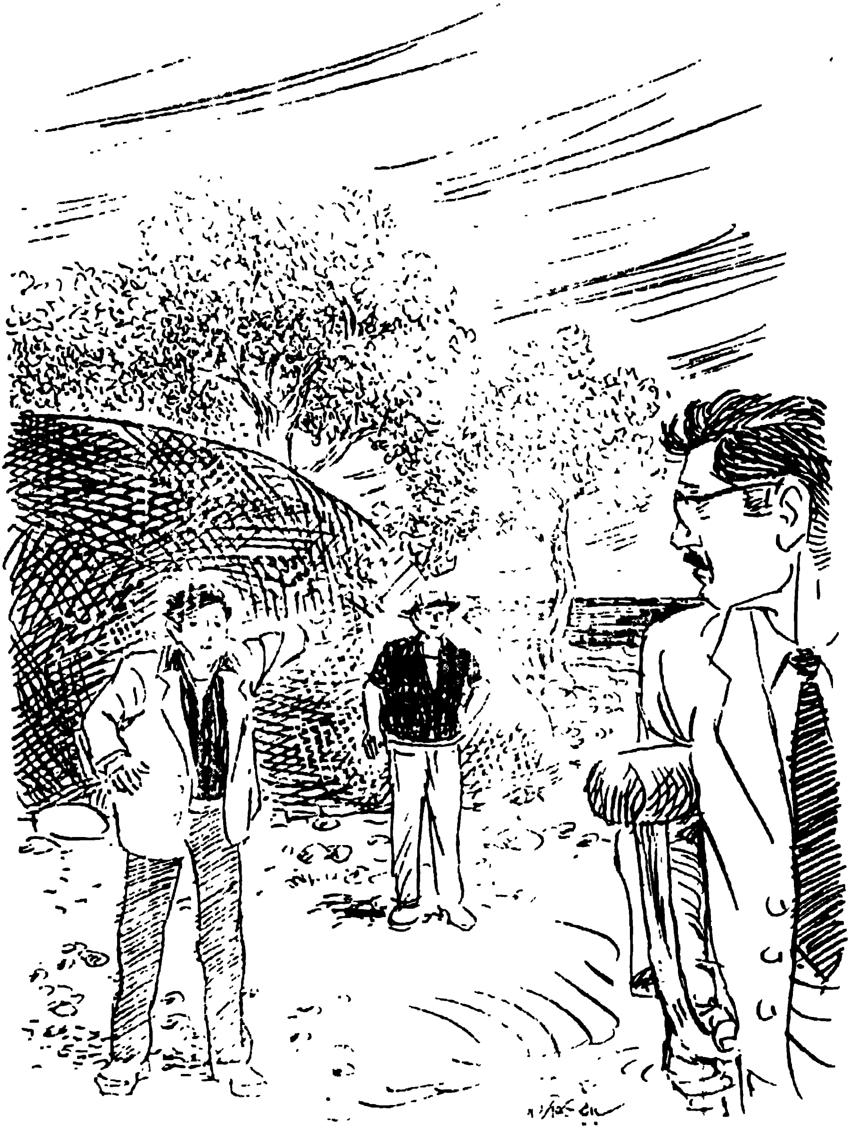
বুড়ো রাজা জোর করে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই পড়ে গেলেন। সবাই ধরাধরি করে আবার শুইয়ে দিলেন তাঁকে। বুড়ো রাজার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। খুব আস্তে আস্তে আপন মনে বলতে লাগলেন, "আমি কেন এলাম! কত ভাল জায়গায় ছিলাম আমি...সেখানে বাতাস কত টাটকা...পাখির ডাক, গাছের পাতার শব্দ, আর ঝর্নার জলের শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ নেই, সেখানে কেউ ভিক্ষে করে না, সেখানে কত শান্তি, সেই তো আমার স্বর্গ! কেন এলাম, আমাকে নিয়ে চলো। ...এক্ষুনি এক্ষুনি...আমি যাব...আঃ!"

সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সকলের মুখগুলোও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, উনি কি..."

কাকাবাবু কিছু উত্তর দিলেন না। মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। সন্তু জীবনে এই প্রথম দেখল, কাকাবাবুর চোখে জল।

সেও আর সামলাতে পারল না। শব্দ করে কেঁদে উঠল।



মিশর রহস্য

সাইকেল চালানো শেখার জন্য সন্তুকে এখন ভোরবেলা বালিগঞ্জ লেকে আসতে হয়। ওদের পাড়ার পার্কটা মেট্রো রেলের জন্য খুড়ে ফেলা হয়েছে, সেখানে এখন খেলাধুলো করার উপায় নেই।

ভোরবেলাতেই বালিগঞ্জ লেকে বেশ ভিড় থাকে। বহু বয়স্ক লোক আসেন মর্নিং ওয়াক করতে। অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরা দৌড়য়। অনেকে রোয়িং করে। কালীবাড়ির উল্টো দিকের গ্রাউন্ডটায় ফুটবলের কিক প্র্যাকটিস হয়। লেকের পেছন দিকটায় যেখানে লিলিপুল আছে, সেখানকার রাস্তাটা অনেকটা নির্জন। ঐ জায়গাতেই দু'তিনটে দল সাইকেল শেখে।

সাড়ে পাঁচটার সময় সন্তু বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। সঙ্গে থাকে রকুকু। সন্তুর নিজের সাইকেল নেই। কুনালদের বাড়িতে একটা পুরনো সাইকেল ছিল। কুনালের বাবা ডাক্তার, তাঁর চেম্বারের কম্পাউণ্ডারবাবু এই সাইকেলটা ব্যবহার করতেন। কম্পাউণ্ডারবাবু চাকরি ছেড়ে দেশে চলে গেছেন তিন-চার মাস আগে, সাইকেলটা নিয়ে যাননি। কুনাল সেই সাইকেলটা নিয়ে কিছুদিন প্যাড্‌ল করতে করতে চালানো শিখে গেছে। সেই দেখাদেখি সন্তুরও সাইকেল শেখার শখ হয়েছে।

কুনালকে ডাকতে হয় না, সে তৈরি হয়েই থাকে। কিন্তু মুশকিল হয় বাপিকে নিয়ে। বাপিদের বাড়িতে সবাই খুব দেরি করে ওঠে। ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করলেও কেউ সাড়া দেয় না। সন্তু আর কুনাল যখন রাস্তা থেকে বাপির নাম ধরে ডাকতে থাকে, তখন রকুকুও ঘেউঘেউ করতে শুরু করে দেয়।

শেষ পর্যন্ত বাপি চোখ মুছতে মুছতে দোতলার বারান্দায় এসে বলে, "এক মিনিট দাঁড়া বাথরুম থেকে আসছি।"

তারপরেও বাপি পনেরো মিনিট কাটিয়ে দেয়। লেকে পৌঁছতে-পৌঁছতে রোদ উঠে যায়।

খুব ছেলেবেলায় সন্তু ট্রাইসাইকেল চালিয়েছিল, কিন্তু দু'চাকার সাইকেল চালানো খুব শক্ত ব্যাপার। একটু-একটু ভয়ে গা-শিরশির করে। সাইকেলটায় ওঠার পর কুনাল আর বাপি তাকে দু'দিকে ধরে থেকে ঠেলতে থাকে। তারপর দু'জনে নির্দেশ দেয়, জোরে প্যাড্‌ল কর, সামনে তাকিয়ে থাক্, শরীরটা হাল্‌কা কর, এত স্টিফ হয়ে আছিস কেন?

কুনাল আর বাপি হঠাৎ একসময় তাকে ছেড়ে দিলেই সন্তুর চোখে সমস্ত পৃথিবীটাই যেন দুলতে থাকে, হাত দুটো লগ্‌বগ্ করে। সন্তু চেঁচিয়ে ওঠে, "এই, এই পড়ে যাব, ধর, ধর!"

ওরা দু'জন হাসতে-হাসতে দৌড়ে এসে আবার ধরে ফেলে।

এই রকম দু'দিন ধরে চলছে। আজ তৃতীয় দিন। আজ সন্তুর অনেকটা ভয় কেটে গেছে। সাইকেলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা আর আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে না।

বাপি আর কুনাল মাঝে-মাঝে ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আজ এখানে আরও চারটে দল এসেছে, এক দলের সঙ্গে আর-এক দলের যে-কোনও সময় ধাক্কা লেগে যেতে পারে। উল্টোদিকে অন্য কোনও দলকে দেখলেই সন্তু নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ছোটাছুটি করার পর একসময় বাপি সন্তুর পিঠে চাপড় মেরে বলল, "এইবার তুই নিজে চালা, সন্তু। এই কুনাল, ছেড়ে দে!"

সন্তুর আর হাত কাঁপল না, সে সোজা সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে গেল। দারুণ আনন্দ হচ্ছে সন্তুর, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, 'শিখে গেছি; শিখে গেছি!' চিৎকার করার বদলে সন্তু ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজাতে লাগল।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার সব বদলে গেল। আবার হাত কাঁপছে, হ্যাণ্ডেলটা এদিক-ওদিক ঘুরে যাচ্ছে, পায়ে যেন জোর কমে গেছে। সন্তুর ধারণা হল, সে একা-একা অনেকটা দূরে এসে গেছে, কুনাল আর বাপি দৌড়ে এসে তাকে ধরতে পারবে না। কী হবে? এই রে, এই রে, সাইকেলটা হেলে যাচ্ছে...

পেছন থেকে বাপি চেঁচিয়ে বলল, "ভাল হচ্ছে, চালিয়ে যা সন্তু, সামনের দিকে তাকিয়ে—"

ঠিক এই সময়ে বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে আর-একটা দল এসে পড়ল। এখন পাশ কাটাতে না-পারলেই মুখোমুখি কলিশান। সন্তু মোটে সোজা চালাতে শিখেছে, এদিক-ওদিক ঘুরতে জানে না। কুনাল বলেছিল, সাইকেলে সব সময় বাঁদিকে টার্ন নেবার চেষ্টা করবি, ডান দিকে হঠাৎ টার্ন নেওয়া ডিফিকাল্ট। কিন্তু এখানে বাঁ দিকে টার্ন নিতে গেলে যে সোজা লেকের জলে নেমে যেতে হবে।

উল্টোদিকের দলটা সন্তুর একেবারে কাছে এসে চেঁচিয়ে সাবধান করে দিল, "বাঁ দিক চেপে... বাঁ দিক চেপে!"

সন্তু আর কিছু চিন্তা না করে ডান দিকে ঘুরিয়ে দিল হ্যাণ্ডেল। পরের মুহূর্তটা সে চোখে কিছু দেখতে পেল না। কী যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল পৃথিবীতে। একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে সন্তু ছিটকে পড়ে গেল, তারপর সাইকেলটাও পড়ল তার ঘাড়ের ওপর।

কোনওরকম ব্যথা বোধ করার আগেই সন্তু ভাবল, চোখ দুটো ঠিক আছে তো? পায়ের হাড় ভেঙে গেছে?

রকুকু ছুটে আসছিল সন্তুর পেছন পেছন। সাইকেলটা পড়ে যেতে দেখে সে ভয় পেয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল।

সাইকেলটা সরিয়ে সন্তু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারল না। একজন মর্নিং ওয়াকার সাইকেলটা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "খুব লেগেছে নাকি, খোকা? আমার হাত ধরে ওঠবার চেষ্টা করো।"

ততক্ষণে কুনাল আর বাপি এসে পৌঁছে গেল সেখানে।

কুনাল বলল, "এই ওঠ, তোর কিচ্ছু হয়নি!"

বাপি বলল, "জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার/সাইকেল শেখে না কেহ না খেলে আছাড়!"

মর্নিং ওয়াকার ভদ্রলোক বললেন, "না হে, ওর বেশ ভালই লেগেছে মনে হচ্ছে, হাঁটুর কাছে রক্ত বেরোচ্ছে!"

কুনাল বলল, "আমার ওর থেকে ঢের বেশি রক্ত বেরিয়েছিল। সাইকেল শিখবে, আর একবারও রক্ত বেরুবে না?"

ভদ্রলোকটি আবার হাঁটা শুরু করে দিলেন।

কুনাল আর বাপি দু'হাত ধরে সন্তুকে টেনে তুলল। কুনাল বলল, "সাইকেলটা টাল খেয়ে গেছে শুধু, আর কিছু হয়নি ভাগ্যিস!"

সন্তু মাঝে-মাঝে ফুলপ্যান্ট পরলেও সাইকেল চালাবার জন্য পরে এসেছে শর্টস আর গেঞ্জি। তার একটা হাঁটুর নুন-ছাল উঠে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে ফোঁটা ফোঁটা। সেখানে খানিকটা জ্বালা করলেও আসল ব্যথা হচ্ছে সন্তুর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে।

এক পা চলার চেষ্টা করেই সন্তু উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল। যন্ত্রণায় প্রায় চোখে জল এসে গেল তার।

বাপি বলল, "কী রে, তুই এত সব বিপদের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার করতে যাস, আর সামান্য একটু পায়ের ব্যথায় কেঁদে ফেললি?"

সন্তু বলল, "ভীষণ লাগছে, মাটিতে পা ফেলতে পারছি না।"

কুনাল বলল, "জোর করে হাঁটার চেষ্টা কর, একটু বাদে ঠিক হয়ে যাবে!"

সন্তু বলল, "যদি ফ্র্যাকচার হয়ে থাকে?"

কুনাল বলল, "ধ্যাত, অত সহজে ফ্র্যাকচার হয় না।"

রকুকু আবার এর মধ্যে সন্তুর পা চেটে দিতে চায়। সন্তু কুনালকে বলল, "ওর গলার চেনটা বেঁধে নে।"

এর পরে আর সাইকেল চালাবার প্রশ্ন ওঠে না। কুনাল সাইকেলটা ঠিক করে নিল। বাপির কাঁধে ভর দিয়ে সন্তু হাঁটতে লাগল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তার সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে আছে, কোনও কথা বলছে না।

খানিকক্ষণ চলার পর বাপি বলল, "কী রে, তুই যে এখনও ল্যাংচাচ্ছিস? জোর করে বাঁ পাটা ফেলার চেষ্টা কর।"

সন্তু ধরা গলায় বলল, "কিছুতেই পারছি না। হাড় ভেঙে গেছে নিশ্চয়ই।"

বাপি হাসতে হাসতে বলল, "যাঃ তা হলে কী হবে? তুই তো আর কোনও অ্যাডভেঞ্চারে যেতে পারবি না। তোর কাকাবাবুর একটা পা তো, ইয়ে, মানে ডিফেকটিভ। তুইও যদি খোঁড়া হয়ে যাস, তা হলে তো তোকে আর উনি সঙ্গে নেবেন না!"

কুনাল বলল, "এই বাপি, ওরকম নিষ্ঠুরের মতন কথা বলিস না। ওর পা আবার ঠিক হয়ে যাবে।"

সন্তুর মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বাপি তো ঠিকই বলেছে। সে খোঁড়া হয়ে গেলে তো কাকাবাবুকে আর কোনও সাহায্য করতে পারবে না! তার জীবনের সব কিছু শেষ হয়ে গেল?

খানিকটা পথ পার হবার পর কুনাল জিজ্ঞেস করল, "একটা রিকশায় উঠবি, সন্তু?"

সন্তু দু'দিকে মাথা নাড়ল। বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামলে মা ভয় পেয়ে যাবেন। আগেই মাকে কিছু বলার দরকার নেই। বিমানদার দাদা ডাক্তার, তাঁকে দেখিয়ে নিতে হবে একবার।

সন্তুদের বাড়ির কাছেই বিমানদাদের বাড়ি। বিমানদা পাইলট, তিনি বাড়ি নেই, নিউ ইয়র্কে গেছেন। বিমানদার দাদাও নার্সিং হোমে চলে গেছেন জরুরি কল পেয়ে। দুপুরবেলা তিনি বাড়িতে খেতে আসেন, সেই সময়ে সন্তুকে আবার আসতে হবে।

কাছেই একটা স্টেশনারি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু, কী যেন কিনছেন। ক্রাচ না নিয়ে কাকাবাবু হাঁটতে পারেন না, তবু প্রত্যেকদিন সকালে তাঁর মর্নিং ওয়াকে বেরুনো চাই।

সন্তু প্রথমে কাকাবাবুকে দেখতে পায়নি। বাপি তার কাঁধে চাপ দিয়ে বলল, "এই সন্তু দ্যাখ..."

সন্তু মুখ ফিরিয়ে দেখল কাকাবাবু তার দিকেই চেয়ে আছেন। সন্তুকে খোঁড়াতে দেখে তিনি মিটিমিটি হাসছেন, মুখে কিছু বললেন না!

অন্য যে-কোনও বাড়ির বাবা-কাকারা তাঁদের বাড়ির ছেলেকে এইরকম অবস্থায় দেখলে দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে বলতেন, "অ্যাঁ, কী হয়েছে? কী করে পড়লি? হাড় ভেঙে গেছে?" ইত্যাদি ইত্যাদি। কাকাবাবু সন্তুকে ঐ অবস্থায় দেখে পাত্তাই দিলেন না।

এমন কী, একটু বাদে বাড়ি ফিরেও কাকাবাবু মাকে কিছুই বললেন না।

সন্তু নিজের ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। এখন দু'তিন ঘণ্টা তার পড়ার সময়, ঘর থেকে না বেরুলেও চলবে। ব্যথাটা ক্রমশই বাড়ছে, বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছটা বেশ ফুলে গেছে। একটু আয়োডেক্স মালিশ করলে হত। আয়োডেক্সের একটা টিউব ছিল যেন বাড়িতে কোথায়, কিন্তু দরকারের সময় তো সেসব কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। মায়ের কাছেও চাইতে সাহস পাচ্ছে না। সন্তু জানে, মা জানতে পারলে এক্ষুনি কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন, তারপর এক্স-রে, তারপর আরও কত কী! পায়ে প্লাস্টার করিয়ে শুইয়ে রাখবেন এক মাস। ঐ প্লাস্টার জিনিসটা সন্তু একদম পছন্দ করে না। এক মাস বিছানায় শুধু-শুধু শুয়ে থাকা...অসহ্য!

বিমানদার দাদা অবনীদা নিজে খেলাধুলো করেন। তিনি নিশ্চয়ই একটা সহজ

ব্যবস্থা করে দেবেন। মা সকালের দিকে অনেকটা সময় স্নান আর রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, সহজে টের পাবেন না।

বেলা এগারোটা আন্দাজ সন্তু বারান্দায় খটখট শব্দ পেয়ে বুঝল কাকাবাবু আসছেন তার ঘরে। পড়ার টেবিল থেকে সন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

দরজার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, বাড়িতে কারুকে কিছু বলিসনি তো? পা যদি ভেঙে গিয়ে থাকে, তা হলে কি এমনি-এমনি সারবে?"

সন্তু কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

কাকাবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে ক্রাচ দুটো নামিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, "এদিকে আয়, হাঁটবার চেষ্টা কর, দেখি কতদূর কী হয়েছে!"

কাকাবাবু গুরুজন হয়ে তার পায়ে হাত দেবেন, এটা ভেবে সন্তু আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল। কিন্তু আপত্তি জানিয়েও কোনও লাভ নেই।

সন্তু এক পায়ে লাফাতে লাফাতে চলে এল কাকাবাবুর কাছে। কাকাবাবু বসে পড়ে সন্তুর বাঁ পাটা দু' হাতে ধরলেন। সন্তুর গা শিরশির করছে। ঐখানটায় হাত দিলেই ব্যথা।

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, বেশ ফুলেছে দেখছি!"

তারপর পা'টা বেশ জোরে চেপে ধরে সন্তুর চোখে চোখ রেখে বললেন, "শোন্ যতই ব্যথা লাগুক, চ্যাঁচানো চলবে না কিন্তু। দেখি কী রকম তোর মনের জোর। মন শক্ত করেছিস তো?' এক...দুই...তিন!"

কাকাবাবু স্যাট করে সন্তুর গোড়ালিটা ঘুরিয়ে দিলেন। সন্তুর মুখখানা মস্ত বড় হাঁ হয়ে গেল, তবু সে কোনও শব্দ করল না। মনে হল যেন কাকাবাবু তার পায়ের হাড় ভেঙে দিলেন মট্ করে।

কাকাবাবু বললেন, "যা, ঠিক হয়ে গেছে, আর কিছু হবে না।"

সন্তু প্রকাণ্ড বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বলল, "ঠিক হয়ে গেছে?"

কাকাবাবু বললেন, "মট্ করে একটা শব্দ পেলি না? তাতেই তো হাড় আবার সেট হয়ে গেল। তোর গোড়ালিটা একটু ঘুরে গিয়েছিল।"

উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু বললেন, "আমি অনেককাল পাহাড়ি লোকেদের মধ্যে কাটিয়েছি তো। সেখানে তো ডাক্তার পাওয়া যায় না, ওরা এইরকমভাবে চিকিৎসা করে। আমি ওদের কাছ থেকে শিখেছি।"

সন্তুর দৃষ্টি অমনি কাকাবাবুর পায়ের দিকে চলে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "তুই ভাবছিস তো আমার পা'টা কেন এইভাবে সারাতে পারিনি? আমার পায়ের ওপর এই অ্যাত্তো বড় একটা পাথরের চাঁই এসে পড়েছিল, এখানকার হাড়গোড় একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। পা'টা যে কেটে বাদ দিতে হয়নি তাই যথেষ্ট। তুই এবারে একটু হাঁটার চেষ্টা করে দ্যাখ্ তো!"

আশ্চর্য ব্যাপার, পায়ে এখনও ব্যথা আছে যদিও, তবু সন্তু দু'পা ফেলে হাঁটতে পারছে।

কাকাবাবু বললেন, "আমার মনে হচ্ছে ঠিক হয়ে গেছে। তবু একবার বিমানের দাদার কাছে গিয়ে দেখিয়ে নিস।"

গরমের ছুটি, তাই স্কুল-কলেজ বন্ধ। সারাদিন সন্তু বাড়িতেই বসে রইল। পায়ের ব্যথা ক্রমশই কমে যাচ্ছে আর সন্তুরও মন ভাল হয়ে উঠছে। বিকেলে অবনীদার চেম্বার যাবার পর তিনি ওর পা দেখে বললেন, "কই, কিছু হয়নি তো। একটু-আধটু মচকে গেলে চিন্তার কী আছে? বাড়িতে গিয়ে মাকে বলো একটু চুন-হলুদ গরম করে ওখানটায় লাগিয়ে দিতে।"

পরদিন ভোরবেলা সন্তুর ঘরের দরজার খটখট শব্দ হল। দরজা খুলে সন্তু দেখল কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল, আজ আর সাইকেল শিখতে যাবি না?"

সন্তু আকাশ থেকে পড়ল। সাইকেল? সাইকেল শেখার চিন্তা তো সে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলেছে। ঐ অপয়া সাইকেলটার জন্যই তো কাল থেকে অত কষ্ট পেতে হল। কী হয় সাইকেল শিখে? এটা গাড়ির যুগ। আর একটু বড় হয়ে সন্তু গাড়ি চালানো শিখবে।

সন্তু বলল, "আমি আর সাইকেল শিখব না, কাকাবাবু!"

কাকাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন? সাইকেল কী দোষ করল? তুই পড়ে গেছিস, সেটা তো সাইকেলের দোষ নয়। কিছু একটা শিখতে শিখতে মাঝপথে ছেড়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়।"

সন্তু তবু গাঁইগুঁই করে বলল, "পায়ে এখনও একটু-একটু ব্যথা, যদি আবার লেগেটেগে যায়?"

কাকাবাবু বললেন, "আবার লেগে গেলে আবার সারবে। সাইকেল শেখাটা ভয় পেয়ে একবার ছেড়ে দিলে আর শেখা হবে না। যা, যা, বেরিয়ে পড়। সাইকেলটা একবার শিখে নিলে দেখবি ভবিষ্যতে কত কাজে লাগবে!"

সন্তু ভেবেছিল, আজ বেশ অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকবে। কাকাবাবুর তাড়নাতে তাকে বেরিয়ে পড়তেই হল। কুনালের বাড়ির দিকে যেতে-যেতে সে ভাবল, কাকাবাবু সাইকেল শেখার ওপর এত জোর দিচ্ছেন কেন? এবারে যেখানে যাওয়া হবে, সেখানে কি সাইকেল চালানো দরকার হবে?

সন্তুর মন বলছে, শিগগিরই কোথাও যাওয়া হবে। লম্বা, ফর্সা মতন একজন বুড়োলোক প্রায়ই আসছেন কাকাবাবুর কাছে। লোকটি ঠিক সাহেব নয়, আবার ভারতীয় বলেও মনে হয় না। লোকটি কাকাবাবুকে কোথাও নিয়ে যেতে চান। সন্তু একদিন শুনতে পেয়েছিল, বুড়ো লোকটি ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বলছেন, "ইউ কাম্... আই উইল মেক অল অ্যারেঞ্জমেন্টস্।"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "দাঁড়ান, যাওয়াটা ওয়ার্থহোয়াইল হবে কি না আগে চিন্তা করে দেখি!"

লোকটি যে কোথায় যাওয়ার কথা বলছেন, সেটা সন্তু বুঝতে পারেনি। লোকটি কি কাশ্মীরি? কিংবা কাবুলের লোক?

◀ ২ ▶

দিদির বন্ধু স্নিগ্ধাদির বর সিদ্ধার্থদা কলেজে পড়ানোর কাজ ছেড়ে ফরেন সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন। এখন বাইরে-বাইরে থাকেন। সেই যে সেবার কাশ্মীরে কণিষ্কর মুণ্ডু উদ্ধার করার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছিলেন, তারপর থেকে আর অনেকদিন সিদ্ধার্থদার সঙ্গে সন্তুর দেখাই হয়নি। সিদ্ধার্থদারা কয়েক বছর কাটালেন বেলজিয়মে, তারপর সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন কানাডায়। আবার যেন কোথাও বদলি হয়েছেন, সেই ফাঁকে বেড়াতে এসেছেন কলকাতাতে।

স্নিগ্ধাদি একদিন এসেছিলেন সন্তুদের বাড়িতে। দিদি তো এখানে নেই, দিদি এখন ভূপালে। মায়ের সঙ্গে অনেক গল্প করার পর স্নিগ্ধাদি সন্তুকে নেমন্তন্ন করলেন তাঁদের বাড়িতে।

সিদ্ধার্থদা আবার শখের ম্যাজিশিয়ান। খাওয়া-দাওয়ার পর সিদ্ধার্থদা ম্যাজিক দেখাতে লাগলেন কয়েকটা। সন্তু অনেক ম্যাজিকের বই পড়েছে, সিদ্ধার্থদার সব কটা ম্যাজিকই সে ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু ম্যাজিকের আসরে ওরকম করা উচিত নয় বলে সে চুপ করে রইল। শেষকালে একটা তাসের ম্যাজিকে সিদ্ধার্থদা একটুখানি ভুল করে ফেলায় সন্তু আর হাসি চাপতে পারল না!

সিদ্ধার্থদা বললেন, "এই, তুমি হাসলে কেন? দেখবে, তোমার জামার পকেট থেকে আমি একটা মুর্গির ডিম বার করে দেব?"

স্নিগ্ধাদি বললেন, "আহা, তোমার যা পচা-পচা ম্যাজিক, সন্তু ঠিক ধরে ফেলেছে!"

সিদ্ধার্থদা ভুরু কুঁচকে সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সন্তু মানে? দা গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারার? আমি তো ওকে চিনতেই পারিনি, অনেক বড় হয়ে গেছে!"

ম্যাজিক দেখানো বন্ধ করে সিদ্ধার্থদা সন্তুকে কাছে ডেকে নানান গল্প শুরু করে দিলেন। এক সময় তিনি বললেন, "জানো সন্তু, কানাডায় আমাদের এমব্যাসির ছেলেমেয়েদের জন্য একদিন 'সবুজ দ্বীপের রাজা' সিনেমাটা দেখানো হল। তুমি আর কাকাবাবু যে একেবারে আন্দামানে জারোয়াদের মধ্যে চলে গিয়েছিলে, আমি তো জানতুমই না! তুমি তো সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছিলে। আমি একেবারে থ্রিলড!"

সন্তু লাজুক-লাজুক মুখ করে রইল।

সিদ্ধার্থদা জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর আর কোথাও গিয়েছিলে?"

সন্তু তাদের অভিযানের কাহিনী শোনাতে লজ্জা পায়। সে বলল, "এই, আরও দু-এক জায়গায়..."

সিদ্ধার্থদা বললেন, "আমার এবার পোস্টিং কোথায় জানো তো? ইজিপ্টে। কাকাবাবুকে বলো না, সেখানে একবার চলে আসতে? সেখানেও তো কত রহস্যময় ব্যাপার আছে, পিরামিড, স্ফিংকস, মরুভূমি..."

স্নিগ্ধাদি বললেন, "হ্যাঁ, চলে এসো, বেশ মজা হবে, আমরাও থাকব।"

সন্তু বলল, "শুধু আমি যেতে চাইলেই তো হবে না। কাকাবাবু অন্য একটা কাজ নিয়ে এখন ব্যস্ত আছেন।"

কয়েকদিন আগে কাকাবাবু চলে গেছেন দিল্লিতে। সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও উচ্চবাচ্যই করেননি। যাওয়ার দিন সন্তুই নিজে থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কাকাবাবু, আমাকে নিয়ে যাবেন না?"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "না রে, তুই গিয়ে কী করবি? আমি যাচ্ছি সরকারি কাজে। প্লেনে যাব, প্লেনে আসব, কোনও অসুবিধে তো নেই!"

কিন্তু সন্তুর সন্দেহ হয়েছিল, দিল্লি থেকে কাকাবাবু আরও কোথাও যাবেন। সেই ফর্সা, লম্বা বৃদ্ধ লোকটি এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় তুলে নিতে এসেছিলেন কাকাবাবুকে। সন্তুর বেশ মন খারাপ হয়েছিল।

সন্তুর আবার মন খারাপ হয়ে গেল, যখন শুনল যে, স্নিগ্ধাদির বোন রিনিও এবারে ওঁদের সঙ্গে যাবে ইজিপ্টে। রিনি সন্তুর চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট, এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। সে দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাচ্ছে। রিনি সন্তুর আগেই ফরেন কান্ট্রিতে যাচ্ছে? সন্তু এ-পর্যন্ত বিদেশ বলতে শুধু নেপাল ঘুরে এসেছে। অবশ্য নেপালও খুব সুন্দর জায়গা। সন্তুর আবার যেতে ইচ্ছে করে।

রিনি বলল, "সিদ্ধার্থদা, ইজিপ্ট থেকে গ্রিস তো খুব দূরে নয়! আমাকে একবার গ্রিস ঘুরিয়ে আনবেন তো?"

সিদ্ধার্থদা বললেন, "হ্যাঁ, গ্রিস তো ঘুরে আসাই যায়। ইচ্ছে করলে আমরা রোমেও যেতে পারি। আমার রোম দেখা হয়নি।"

গ্রিস, রোম, এইসব নাম শুনলে সন্তুর রোমাঞ্চ হয়। আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সিজার এইসব নাম মনে পড়ে।

সন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এল।

সামনে অনেকদিন ছুটি, সন্তুর আর সময়ই কাটতে চায় না। কুনাল চলে গেছে ওর মামাবাড়ি ভাগলপুরে। বাপিও দার্জিলিং যাবে-যাবে করছে। খেলাধুলো জমছে না। বাড়িতে যত বই ছিল, সবই সন্তুর পড়া, নতুন বই আর জোগাড় করা যাচ্ছে না।

কিছু একটা করতে হবে তো। একদিন দুপুরবেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সন্তু ঠিক করল, সে একা-একাই এবার থেকে এক-একটা রহস্য সমাধানের চেষ্টা করবে। কাকাবাবুর যদিও অনেকের সঙ্গেই চেনাশুনো, তবু কাকাবাবুও তো বিশেষ কারুর সাহায্য নিতে চান না।

ক'দিন ধরেই কাগজে একটা খবর বেরুচ্ছে। তিলজলায় একটা পুকুরে এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি ছেলে ডুবে গেছে। কিন্তু তাদের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেউ জলে ডুবে গেলে কিছুক্ষণ বাদে তার মৃতদেহটা ভেসে উঠবেই। পুকুরটা বেশি বড় নয়। অথচ পোর্ট কমিশনার্সের পেশাদার ডুবুরিরাও কয়েক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করে ছেলে দুটির কোনও চিহ্ন দেখতে পায়নি।

ছেলেদুটিকে ডুবে যেতে অনেকেই দেখেছে। ঘটনা দুটিই ঘটেছে বিকেলবেলা। গরমের দিনে এই সময় অনেকেই ওই পুকুরে স্নান করতে আসে। ওই ছেলেদুটি জলে নামল, আর উঠল না, তা হলে ওরা গেল কোথায়? অনেকে বলছে, ওই পুকুরের তলায় নিশ্চয়ই গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে। অনেক কালের পুরনো পুকুর, সেই নবাবি আমলের। পেশাদার ডুবুরিরা অবশ্য কোনও সুড়ঙ্গের কথা বলেনি। এতদিন ঐ পুকুরে অনেকেই স্নান করছে, কারুর কিছু হয়নি, হঠাৎ এক সপ্তাহের মধ্যেই দুটি ছেলে অদৃশ্য হয়ে গেল কী করে?

সন্তু মনে-মনে এই কেসটা টেক আপ করে নিল।

তিলজলা জায়গাটা কোথায়? সন্তু কোনওদিন ঐ নামের জায়গায় যায়নি, তার চেনা কেউ ওখানে থাকেও না। তিলজলা কী করে খুঁজে পাওয়া যায়? কুনাল ওর সাইকেলটা সন্তুর কাছে রেখে গেছে। ইচ্ছে করলে সন্তু এখন সাইকেলে কলকাতার যে-কোনও অঞ্চলে চলে যেতে পারে।

রাস্তার মোড়ে একটা বই-পত্রপত্রিকার স্টল আছে। সেই স্টলের মালিক গুপিদা বেশ ভালমানুষ ধরনের। সন্তু ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় থেকেই এই স্টল থেকে ম্যাগাজিন, কমিক্‌স, গল্পের বই কেনে। গুপিদা তাকে চেনেন।

সন্তু সেই স্টল থেকে কলকাতার একটা ম্যাপ কিনে পাশের দেয়ালে মেলে ধরল। কিন্তু তাতেও সে তিলজলা খুঁজে পায় না। কী ব্যাপার, তা হলে কি তিলজলা কলকাতার মধ্যে নয়, বাইরে কোথাও?

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "গুপিদা, তিলজলা জায়গাটার নাম খুঁজে পাচ্ছি না কেন?"

গুপিদা বললেন, "পাচ্ছ না? পিকনিক গার্ডেনস দ্যাখো, তার পাশেই পাবে।"

সন্তু অবাক। পিকনিকের জন্য বাগান, সেখানে সবাই পিকনিকের জন্য যায়? সন্তু তো এরকম কোনও জায়গার নামই শোনেনি।

গুপিদা ওর হাত থেকে ম্যাপটা নিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "এই দ্যাখো, ভবানীপুর, এই হাজরা মোড়, এই হল বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, তারপর

এই বণ্ডেল রোড ধরে সোজা গেলে রেল-লাইনের লেভেল ক্রসিং পাবে, তার ওপারে...।

বেলা এখন চারটে। সঙ্গে আর কারুকে নিলে হত। বাপিকে ডাকবে? কিন্তু বাপির এইসব ব্যাপারে কোনও উৎসাহ নেই। থাক, সন্তু একাই যাবে। সাইকেলটা না নিয়ে যাওয়াই ভাল। লোকের চোখে পড়ে যাবে। সন্তু হাঁটতে শুরু করে দিল।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেল সহজেই। লোককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল বণ্ডেল রোড কোন্‌টা। কতদিনই সন্তু একলা-একলা রাস্তা দিয়ে হাঁটে। কিন্তু আজকে একেবারে অন্যরকম লাগছে। আজ সন্তু এমন একটা কাজ নিয়ে যাচ্ছে, যার কথা পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। সন্তুর কি মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে? রাস্তার প্রায় সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে কেন?

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে অন্য দিকে চলে এল সন্তু। যেন কলকাতা নয়, যেন অন্য একটা নতুন জায়গায় বেড়াতে এসেছে সে। যদিও জায়গাটাতে নতুনত্ব কিছু নেই, ভাঙা, ঘিঞ্জি রাস্তা, বাস আর সাইকেল-রিকশা চলছে।

খানিকদূর এগোবার পর আর-একটা সমস্যা মাথায় এল সন্তুর। কোন্ পুকুরে ছেলেদুটো ডুবে গিয়েছিল, তা কী করে বোঝা যাবে? তিলজলাতে কি একটাই পুকুর আছে? পিকনিক গার্ডেনস তার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে? কত বড় বাগান? সেখানেও নিশ্চয়ই পুকুর থাকবে। ঘটনাটা কি সেখানেই ঘটেছিল?

সন্তু একটা সাইকেল-রিকশা ডেকে উঠে পড়ল।

চালক জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবেন?"

সন্তু বলল, "পিকনিক গার্ডেনে।"

সাইকেল-রিকশার চালক একটু বিরক্তভাবে বলল, "অ্যাঁ? এটাই তো পিকনিক গার্ডেন।"

সন্তু রাস্তার চারপাশে বাড়িগুলোর দিকে তাকাল। কোনও বাগান তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পুকুর কোথায়?

সন্তুর মনে হল, ইনভেস্টিগেটর হতে গেলে আগে সব রাস্তা-টাস্তাগুলো ভাল করে চেনা দরকার। এবার থেকে সে নিয়মিত কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এখানে একটা পুকুর আছে?"

চালক বলল, "একটা কেন, অনেক গণ্ডা পুকুর আছে। কোথায় যাবেন সেটা বলুন না। ঠিকানা কী?"

সন্তু বলল, "ঠিকানাটা মনে নেই, আমার পিসিমার বাড়ি, কাছেই একটা পুকুর আছে... ঐ যে যে-পুকুরে দুটো ছেলে ডুবে গেছে..."

চালক আর বাক্যব্যয় না করে প্যাড্‌ল ঘোরাল।

একটু বাদেই বড় রাস্তা ছেড়ে সাইকেল-রিকশাটা ঢুকল একটা মাঝারি রাস্তায়। কয়েকবার ডান-দিক বাঁ-দিক ঘুরে সেটা এসে থামল একটা পুকুরের সামনে।

চালক জিজ্ঞেস করল, "এবার চেনা লাগছে?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, ঐ তো ঐ কোণের বাড়িটা!"

ভাড়া পেয়ে সাইকেল-রিকশার চালক চলে গেল উল্টো দিকে। কোনও কারণ নেই, তবু সন্তুর বুকটা এত টিপটিপ করছে। এই সেই পুকুর, যার মধ্যে রহস্যময় কিছু আছে, যে দুটো ছেলেকে টেনে নিয়েছে, আর ফিরিয়ে দেয়নি।

পুকুরটা বেশ বড়ই। কালো রঙের জল। মাঝখানটায় কিছু কচুরিপানা রয়েছে, তাতে সুন্দর হালকা-নীল রঙের ফুলও ফুটেছে। পুকুরটার তিনদিকেই বাড়ি, একটা দিক ফাঁকা। সেখানে খানিকটা ঝোপঝাড়ের মতন হয়ে আছে, তারপর খানিকটা দূরে একটা কারখানা।

সন্তু ভেবেছিল যে, এখানে অনেক লোকজন দেখতে পাবে। পুলিশ, দমকল, খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফার...। কিন্তু কেউই নেই। খবরের কাগজ পড়লে মনে হয়, এই জায়গাটা বুঝি ভিড়ে-ভিড়াক্কার হয়ে গমগম করছে! একটা লোকও স্নান করছে না পুকুরে। রাস্তা দিয়ে দু'চারজন লোক যাচ্ছে, কিন্তু কারুর কোনও কৌতূহল আছে বলেও মনে হয় না।

পুকুরটার জলের দিকে তাকিয়ে মিনিট পাঁচেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সন্তু। কাকাবাবু হলে কী করে এই রহস্যটার সমাধান করতেন? খবরের কাগজ পড়লে মনে হয়, ডুবুরিরা কিছু খুঁজে পায়নি বলে পুলিশ হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ছেলেদুটো তো জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না!

যে-জায়গায় কোনও ঘটনা ঘটে, সে-জায়গাটা কাকাবাবু নিজের চোখে দেখতে যান সব সময়। খবরের কাগজ পড়েই তো তিনি সুন্দরবনের নদীতে খালি জাহাজটা দেখতে গিয়েছিলেন। এখানে এসে কি কাকাবাবু জলে নেমে পড়তেন? পায়ের জখমের জন্য কাকাবাবুর সাঁতার দিতে অসুবিধে হয়। তাহলে? কাকাবাবু নিশ্চয়ই সন্তুকে বলতেন জলে নামতে।

সন্তু ভাল সাঁতার জানে। কিন্তু অচেনা জায়গায় এই রকম একটা পুকুর, কালো মিশমিশে জল, এখানে নামার কথা ভাবতেই সন্তুর ভয়-ভয় করছে। কাকাবাবু সঙ্গে থাকলে কক্ষনো ভয় করে না, খোঁড়া পা নিয়ে কাকাবাবু নিজে কত সাংঘাতিক বিপদের দিকে এগিয়ে যান, শুধু মনের জোরে।

একটা লোকও এই পুকুরের জলের ধারেকাছে নেই। সবাই ভয় পেয়েছে? একটা পুকুরের জলে ভয়ংকর কী থাকতে পারে? খবরের কাগজে লিখেছে, ডুবুরিরা জল তোলপাড় করে কিছুই দেখতে পায়নি। কোনও গোপন সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা কোনও অদ্ভুত জন্তু লুকিয়ে আছে?

শুধু-শুধু জলের দিকে তাকিয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। ফিরে যাবে? কিছুই

করা গেল না? প্রথম কেস হাতে নিয়েই সন্তু হেরে যাবে? যদিও কেউ জানে না, তবু সন্তুর লজ্জা লাগছে।

পুকুরটার চারপাশটা অন্তত একবার ঘুরে দেখা দরকার। রাস্তার ঠিক উল্টো দিকটায় যেখানে ঝোপঝাড় রয়েছে, সেখানে কি কোনও ঘাট আছে? ছেলে দুটো ডুব-সাঁতারে ওপারে গিয়ে ঐ ঝোপের মধ্যে যদি লুকিয়ে থাকে, তাহলে অনেকেই ভাবতে পারে ওরা ডুবে গিয়ে আর ওঠেনি। মজা করার জন্য ছেলেদুটো এরকম করতেও পারে।

সন্তু পুকুরের পাড় ধরে হাঁটতে লাগল। তিনদিকে তিনটে ঘাট আছে, তার মধ্যে একটা ঘাট বেশ বড়, থাক-থাক্ ইঁটের সিঁড়ি, দু'পাশে বসবার জায়গা।

যে-দিকটায় ঝোপঝাড়, সেই দিকটা বেশ নোংরা। বোধহয় কারখানার লোকেরা তাদের আবর্জনা এই দিকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে। ভাঙা কাচ, চায়ের খুরি, ময়লা ন্যাকড়া ছড়িয়ে আছে অনেক। অনেক বড়-বড় ঘাস গজিয়ে গেছে এখানে। একটা বা দুটো ছেলে ইচ্ছে করলে অনায়াসেই এই ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে।

এই জায়গাটার মাটি থসথসে, কাদা-কাদা। চার-পাঁচদিন আগেও যদি কেউ এ-দিকটায় এসে থাকে তাহলে তার পায়ের চিহ্ন এখনও পাওয়া যাবে। একটা বেশ বড় গর্তও রয়েছে, কেউ মাটি কেটে নিয়ে গেছে। সন্তু এদিক-ওদিক তীক্ষ্ণ নজর রেখে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ সে দেখতে পেল, এক জায়গায় একটা হলদে রঙের জামা পড়ে আছে। জামাটা দেখে খুব পুরনো বলে মনে হয় না। সন্তুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এখানে একটা জামা এল কী করে?

জামাটার খানিকটা রয়েছে ঝোপের মধ্যে, খানিকটা জলে ডুবে আছে। সন্তু পা টিপে-টিপে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে জামাটা তুলতে যেতেই এক কাণ্ড হল।

পায়ের তলার নরম মাটি ধসে গিয়ে সন্তু হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল জলে। ভাল সাঁতারু হয়েও সে ভয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। তার মনে হল, কুমিরের চেয়েও সাংঘাতিক কোনও জন্তু এক্ষুনি তাকে কামড়ে দেবে!

সে-রকম কিছুই হল না। প্রথম পড়ার ঝোঁকে সন্তু চলে গেল অনেকখানি জলের মধ্যে। পুকুরটা খুব খাড়া আর পিছল, পা রাখা যায় না। ডুবজল থেকে উঠে আসবার পর দাঁড়াবার চেষ্টা করেও তার পা হড়কে যেতে লাগল বারবার। তারপর সে সাঁতরে পারের কাছে এসে এক গোছা ঘাস মুঠো করে ধরল, অমনি সেখানকার মাটিও খসে পড়ল।

কয়েকবার এরকম চেষ্টা করার পর সন্তু উঠে এল ওপরে। জামা প্যান্ট একেবারে জবজবে ভিজে, জুতো কাদায় মাখামাখি। মাথায় শ্যাওলা জড়িয়ে গেছে। জামার পকেটে দু'খানা দু'টাকার নোট ছিল, সে দুটি বুঝি গেছে একেবারে।

একটা গোলমাল শুনে সন্তু মুখ তুলে তাকাল। পুকুরের ওপারে রাস্তার ধারে

একদল লোক জমেছে, সবাই সন্তুকেই দেখছে আর কী যেন বলাবলি করছে। তারপর তারা দৌড়ে আসতে লাগল এদিকে।

তারা কাছাকাছি আসতেই সন্তু শুনতে পেল, কয়েকজন চেঁচিয়ে বলছে, 'মরা ছেলে ফিরে এসেছে! মরা ছেলে ফিরে এসেছে! সুড়ঙ্গ দিয়ে পাতালপুরীতে চলে গিয়েছিল!'

এ-কথা শুনে সন্তুর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। এই রে, এরা কি ভেবেছে, জলে-ডোবা দু'জন ছেলের মধ্যে সে একজন? তিন-চার দিন পর কেউ জলের তলা থেকে ফিরে আসতে পারে? এ কি রূপকথা নাকি?

লোকগুলো সন্তুকে ঘিরে এমন চ্যাঁচামেচি করতে লাগল যে, সন্তু কোনও কথাই বলতে পারল না। অনেকেরই ধারণা, সন্তু ডুবে যাওয়া ছেলেদের একজন। কয়েকজন অবশ্য সন্দেহ প্রকাশ করল যে, এর পায়ে জুতো রয়েছে কেন? জুতো পরে তো কেউ সাঁতার কাটতে নামে না। তাদের বিশেষ কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। একজন বেশ গলা চড়িয়ে বলল, "আমিই তো প্রথম দেখেছি, মাঝপুকুরে ভুশ করে জল ঠেলে উঠল, তারপর সাঁতরে-সাঁতরে এই দিকে চলে এল।"

ক্রমশই বেশি ভিড় জমছে। মজা দেখবার জন্য পাড়ার ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ির বউরাও ছুটে আসছে। কেউ বলল, 'ওর মুখ শুকিয়ে গেছে, ওকে দুধ খাওয়াও!' কেউ বলল, 'পুলিশে খবর দাও!' কেউ বলল, 'খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফারকে ডাকো।'

একজন বয়স্কমতন ভারিক্কি চেহারার লোক সন্তুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই যে খোকা, তুমি সন্ধেবেলা এখানে কী করছিলে? কোথা থেকে এলে?"

সন্তু উত্তর দিতে পারল না।

লোকটি বলল, "মিস্টিরিয়াস ব্যাপার। তিন দিন ধরে এই পুকুরের জল কেউ ছোঁয় না, অথচ একটা ছেলে জল থেকে উঠে এল?"

সন্তু এবারে কোনওক্রমে বলে উঠল, "আমি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম!"

বয়স্ক লোকটি বিকট গলায় হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়াল অনেক দূর। সন্তুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। পাতালপুরীতে সন্তু কী দেখেছে, তা বলবার জন্য খোঁচাতে লাগল অনেকে। এর মধ্যে এসে পড়ল পুলিশ। সন্তুকে নিয়ে চলল থানায়।

সন্তু এসেছিল গোয়েন্দাগিরি করতে, তাকে থানায় যেতে হল চোরের মতন।

থানায় বড়বাবু ভিড় হটিয়ে একা সন্তুকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। বড়বাবুর গায়ের রঙ খুব ফর্সা, মাথায় অল্প-অল্প টাক, দেখলে মনে হয় সিনেমার পুলিশ। তিনি ভুরু নাচিয়ে বললেন, "নাও, লেট মি হিয়ার ইওর সং! তুমি জামা-প্যান্ট-জুতো পরে পুকুরে ডুব দিয়েছিলে কেন?"

সন্তু বলল, "বলছি, আগে এক গেলাস জল খাব!"

সন্তুর গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ। কত দুর্গম জায়গায় কত রকম বিপদ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে সে। কিন্তু আজ কলকাতা শহরের মধ্যেই সে যে বিপদে পড়েছে, তার সঙ্গে আগের কোনও কিছুরই তুলনা হয় না। লোকগুলো যদি তাকে মারতে শুরু করত? থানায় এসে সে অনেক নিরাপদ বোধ করছে।

জল খাবার পর সন্তু মুখ তুলতেই বড়বাবু বললেন, "নাও, মাই বয়, আমি সত্যি কথা শুনতে চাই, নাথিং বাট দা ট্রুথ..."

বড়বাবুর কথার মাঝখানেই সন্তু বলল, "আপনি স্পেশাল আই. জি. মিঃ আর. ভট্টাচার্য কিংবা ডি. আই. জি. ক্রাইম মিঃ বি. সাহাকে একবার ফোন করবেন?"

কথা বলতে-বলতে থানার বড়বাবুর মুখখানা হাঁ হয়ে গেল। তিনি ভুরু নাচাতে ভুলে গেলেন।

সেই রকম অবস্থা প্রায় এক মিনিট থেমে থেকে তিনি বললেন, "কাদের নাম বললে? স্পেশাল আই. জি. কিংবা ডি. আই. জি? এঁদের ফোন করব কেন?"

সন্তু বলল, "ওঁরা দু'জনেই আমার কাকাবাবুকে চেনেন। আমাকেও চেনেন। পুলিশ কমিশনারও একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।"

বড়বাবু হাঁক দিলেন, "বিকাশ! বিকাশ!"

আর-একজন পুলিশ অফিসার উঁকি মারতেই বড়বাবু বললেন, "ওহে, বিকাশ, এ ছেলেটি যে বড়-বড় কথা বলে! লম্বা-লম্বা পুলিশ অফিসারদের নাম করছে।"

সন্তু বলল, "আপনারা হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না! আমার পরিচয়টা জানলে আপনাদের সুবিধে হবে। সেইজন্য আমি ওঁদের ফোন করতে বলছি।"

বিকাশ নামের কালো, লম্বা চেহারার পুলিশ অফিসারটি বলল, "তোমার গল্পটা কী আগে শুনি?"

সন্তু বলল, "ঐ পুকুরটায় নাকি দুটো ছেলে ডুবে গেছে, তাদের আর পাওয়া যায়নি, সেইজন্য আমি পুকুরটা দেখতে এসেছিলুম।"

"তারপর জামা-জুতো পরে জলে নেমে গেলে?"

"ইচ্ছে করে নামিনি। পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম।"

বড়বাবু বললেন, "তা তো হতেই পারে। পা পিছলে কি কেউ জলে পড়ে যেতে পারে না?"

বিকাশ বলল, "স্যার, বাইরে অনেক লোক ভিড় জমিয়ে আছে। হৈ-হল্লা করছে। তারা এত সহজ গল্প বিশ্বাস করবে না!"

বড়বাবু রেগে উঠে বললেন, "তাদের জন্যে কি রোমহর্ষক গল্প বানাতে হবে? মহা মুশকিল! এ-ছেলেটি বড় বড় পুলিশ অফিসারদের নাম করছে, যদি সত্যিই তাঁদের সঙ্গে চেনা থাকে? ফোন করো! ফোন করো! ওহে খোকা, কী নাম তোমার?"

সন্তু বলল, "আমার কাকার নাম রাজা রায়চৌধুরী। তাঁর নাম বলুন। আমাকে সন্তু নামে উনি চিনবেন।"

ফোনে ঐ দু'জনের মধ্যে একজনকে পাওয়া গেল। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বড়বাবুর মুখের চেহারাটাই বদলে যেতে লাগল। চোখ দুটো হল গোল-গোল আর ভুরুদুটো উঠে গেল অনেকখানি।

তিনি বলতে লাগলেন, "অ্যাঁ? কী বলছেন স্যার? বিখ্যাত? অ্যাডভেঞ্চার করে? ওদের নিয়ে বই লেখা হয়েছে? না স্যার, আমি বই-টই বিশেষ পড়ি না, বই পড়ার সময় পাব কখন! হ্যাঁ। ছেলেটি আমার সামনেই বসে আছে...আপনাকে দেব, কথা বলবেন?"

স্পেশাল আই. জি. সাহেব টেলিফোনে হাসতে-হাসতে বললেন, "কী হে সন্তু, তিলজলার পুকুরে ডুব দিতে গিয়েছিলে কেন? ওখানে কি গুপ্তধন আছে নাকি?"

সন্তু লাজুকভাবে বলল, "না, মানে এমনিই। পুকুরের ধার দিয়ে হাঁটছিলুম, হঠাৎ পা পিছলে..."

"হঠাৎ ঐ পুকুরটার ধার দিয়েই বা হাঁটতে গেলে কেন? তুমি কি একা-একাই গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছ নাকি?"

"না, এমনিই বেড়াতে এসেছিলুম এদিকে..."

এরপর বড়বাবু থেকে শুরু করে থানার সমস্ত লোক দারুণ খাতির করতে লাগল সন্তুকে। বাইরের ভিড় হটিয়ে দেওয়া হল। সন্দেশ-রসগোল্লা-শিঙাড়া এসে গেল সন্তুর জন্য। সন্তু খেতে চায় না, তবু ওঁরা ছাড়বেন না।

তারপর পুলিশের গাড়ি সন্তুকে পৌঁছে দিয়ে এল তাদের বাড়ির কাছাকাছি।

সন্তুর মনটা তবু খুব খারাপ হয়ে রইল। লজ্জাও করছে খুব! প্রথমবারেই এরকম ব্যর্থতা। ছি ছি ছি!

বাড়িতে পৌঁছেই সন্তু দেখল একজন অপরিচিত লোক বসে আছেন তাদের বসবার ঘরে। বাবা তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন।

ভিজে জামা-কাপড় যাতে কেউ দেখতে না পায় তাই সন্তু পাশের বারান্দা দিয়ে সুট করে উঠে যাচ্ছিল ওপরে, পায়ের আওয়াজ পেয়ে বাবা হাঁক দিয়ে বললেন, "কে রে? সন্তু নাকি? এদিকে আয়...শুনে যা!"

"আসছি", বলেই সন্তু এক দৌড়ে চলে গেল ওপরে। তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট বদলে আবার নীচে নেমে এল।

বাবা বললেন, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ? এই ভদ্রলোক তোর জন্য কখন থেকে বসে আছেন! দ্যাখ, রাজা তোর নামে চিঠি পাঠিয়েছে।"

সন্তু তাড়াতাড়ি কাকাবাবুর চিঠিটা নিয়ে খুলল। চিঠিটা এসেছে দিল্লি থেকে। কাকাবাবু লিখেছেন :

স্নেহের সন্তু,

একটা কাজের জন্য দিল্লি এসেছিলাম। দু' চারদিনের মধ্যেই ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরশু থেকে খুব জ্বরে পড়ে গেছি। বেশ কাবু করে দিয়েছে। কাজটা শেষ না করে ফিরে যেতে চাই না। ভেবেছিলাম এবার তোর সাহায্যের কোনও দরকার হবে না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, তোকে সঙ্গে আনাই উচিত ছিল। দিন দশেকের জন্য কলকাতা ছেড়ে এলে কি তোর পড়াশুনোর ক্ষতি হবে? দাদা আর বৌদিকে জিজ্ঞেস করবি। যদি কোনও অসুবিধে না থাকে, তাহলে আগামীকালই চলে আসতে হবে। যে ভদ্দরলোকের হাতে চিঠি পাঠাচ্ছি, তিনিই প্লেনের টিকিট পৌঁছে দেবেন। দিল্লি এয়ারপোর্টে তোকে রিসিভ করার জন্য লোক থাকবে। দাদাকেও আলাদা চিঠি দিলাম। ইতি—

কাকাবাবু

পুনশ্চ : তোর একটা পাসপোর্ট করানো হয়েছিল, মনে আছে? সেটা সঙ্গে নিয়ে আসবি।

চিঠিটা পড়তে পড়তেই সন্তু আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। এতক্ষণের মনখারাপ আর লজ্জা এক নিমেষে কোথাও উধাও হয়ে গেল।

বাবার দিকে তাকাতেই বাবা বললেন, "হ্যাঁ, চলে যা! অসুখে পড়েছে, একা-একা আছে! কী অসুখ সে-কথাও লেখেনি!"

আগন্তুকটি বললেন, "আমি তাহলে টিকিটের ব্যবস্থা করে রাখছি। কাল বিকেলের ফ্লাইটে..."

ওপরে এসে সন্তু কাকাবাবুর চিঠিখানা যে কতবার পড়ল তার ঠিক নেই। অতি সাধারণ চিঠি, তবু দুটো জিনিস বোঝা গেল না। কাকাবাবু কোন্ কাজে দিল্লি গেছেন? আর পাসপোর্ট নেবার কথা লিখলেন কেন? দিল্লি যেতে তো পাসপোর্ট লাগে না।

◀ ৩ ▶

প্লেনে চড়া সন্তুর পক্ষে নতুন কিছু নয়, তবে আগে কখনও সে একা কোথাও যায়নি। এয়ারবাস-ভর্তি লোক, একজনও সন্তুর চেনা নয়। বেশ কয়েকজন বিদেশিও রয়েছে।

সময় কাটাবার জন্য সন্তু একটা বই এনেছে সঙ্গে, কিন্তু বই পড়ায় মন বসছে না। সে যাত্রীদের লক্ষ করছে। বিমানটা আকাশে ওড়ার খানিক পরেই অনেকে সিট বেল্ট খুলে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। কারুর কারুর ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় প্লেনে চড়া তাঁদের কাছে একেবারে জলভাত। মিনিবাসে চেপে রোজ অফিসে যাবার মতন প্লেনে চেপে রোজ দিল্লি বা বোম্বে যান।

কয়েকদিন আগেই শ্রীনগরে একটা প্লেন হাইজ্যাকিং হয়েছে। এয়ারপোর্টে বাবা

এসেছিলেন সন্তুকে পৌঁছে দিতে, তিনি বারবার ঐ কথা বলছিলেন। বাবা ভয় পাচ্ছিলেন, হঠাৎ যদি প্লেনটা হাইজ্যাকিং হয়ে কোনও বিদেশে চলে যায়, তাহলে সন্তু একা-একা কী করবে!

সন্তুর কিন্তু হাইজ্যাকিং সম্পর্কে মোটেই ভয় নেই। বরং মনে-মনে একটু ইচ্ছে আছে, সেরকম একটা কিছু হলে মন্দ হয় না! এখন সে যাত্রীদের মুখ দেখে বোঝবার চেষ্টা করছে, এদের মধ্যে কেউ কেউ কি হাইজ্যাকার হতে পারে? বাথ রুমের কাছে তিনটে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের মধ্যে দু'জনের মুখে দাড়ি, একজন পরে আছে একটা চামড়ার কোট। ওরা যে-কোনও মুহূর্তে রিভলভার বার করতে পারে। চোখের দৃষ্টিও বেশ সন্দেহজনক!

আধঘণ্টার মধ্যেও কিছুই হল না। সন্তু জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগল। পাতলা-পাতলা মেঘ ছাড়া আর কিছুই দেখবার নেই। মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছি ভাবলেই মনটা কী রকম যেন হালকা লাগে।

সন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ মাইক্রোফোনে কিছু একটা ঘোষণা হতেই সে দারুণ চমকে উঠল। তাহলে কি এবারে শুরু হল নাটক?

না, সেসব কিছু না। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে সবাইকে সিটবেল্ট বেঁধে নিজের নিজের জায়গায় বসতে। বাইরে ঝড় হচ্ছে।

সন্তু মুখ ফিরিয়ে সেই সন্দেহজনক চরিত্রের তিনটি ছেলেকে দেখতে পেল না! জানলা দিয়ে তাকালেও বাইরে ঝড় বোঝা যায় না।

শেষ পর্যন্ত প্লেন হাইজ্যাকিংও হল না, ঝড়ের জন্য কিছু বিপদও ঘটল না। বিমানটি নিরাপদে এসে পৌঁছল দিল্লিতে।

প্লেন থেকে নেমে সন্তু লাউঞ্জে এসে দাঁড়াবার একটু পরেই পাইলটের মতন পোশাক-পরা একজন লোক এসে বলল, "এসো আমার সঙ্গে।"

সন্তু একটু অবাক হল। লোকটিকে সে চেনে না। লোকটি তার নামও জিজ্ঞেস করল না। কিন্তু লোকটি এমন জোর দিয়ে বলল কথাটা যে, অমান্য করা যায় না। সন্তু চলল তার পিছু-পিছু।

লোকটি একেবারে এয়ারপোর্টের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সন্তু বলল, "আমার সুটকেস? সেটা নিতে হবে যে!"

লোকটি বলল, "হবে। সব ব্যবস্থা হবে।"

বাইরে আর-একজন লোককে আঙুলের ইশারায় ডেকে সেই পাইলটের মতন পোশাক-পরা লোকটি বলল, "একে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসাও, আমি ওর সুটকেসটা পাঠিয়ে দিচ্ছি!"

সন্তু এবারে বলল, "দাঁড়ান, আপনারা কার কাছ থেকে এসেছেন? আমার নাম কি আপনারা জানেন?"

প্রথম লোকটি এবারে মুখ ঘুরিয়ে চার দিকটা দেখে নিয়ে বলল, "নাম-টাম

বলার দরকার নেই। তোমাকে তোমার কাকাবাবুর কথামতন পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। চট করে গাড়িতে গিয়ে বসে পড়ো।”

কাকাবাবুর কথা শুনে সন্তু আর আপত্তি করল না। দ্বিতীয় লোকটির সঙ্গে গিয়ে একটা ফিয়াট গাড়িতে উঠে বসল। একটুক্ষণের মধ্যেই সুটকেসটা দিয়ে গেল একজন, গাড়িটা স্টার্ট নিল।

অনেকদিন আগে কাশ্মীর যাওয়ার পথে সন্তুরা দিল্লিতে নেমেছিল একদিনের জন্য। সেবারে দিল্লি ভাল করে দেখা হয়নি। দিল্লিতে কত কী দেখার আছে। কিন্তু এখন রাত হয়ে গেছে, রাস্তার দু'পাশে বিশেষ কিছু চোখে পড়ছে না।

গাড়িতে যে লোকটি সঙ্গে চলেছে, সে একটাও কথা বলেনি সন্তুর সঙ্গে। বাঙালি কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না।

সন্তু নিজে থেকে যেচে কথা বলতে পারে না অপরিচিত লোকের সঙ্গে। সে-ও চুপ করে রইল। কিন্তু একটু যেন অস্বাভাবিক লাগছে। সে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে না পৌঁছতেই যেন তাড়াহুড়া করে নিয়ে আসা হল তাকে। পাইলটের মতন পোশাক পরা লোকটা কী করে চিনল সন্তুকে? সে কেন বলল, কোনও নাম বলার দরকার নেই?

অনেক রাস্তা ঘুরে, একটা আলো-ঝলমলে পাড়ার মধ্যে একটা পাঁচতলা বাড়ির সামনে থামল গাড়িটা। গাড়ির চালক নিজে না নেমে বলল, “আপ উতরিয়ে!”

সন্তু গাড়ি থেকে নামতেই গাড়িটা ভোঁ করে চলে গেল। সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, “আরে, আমার সুটকেস!”

বাড়ির ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে বলল, “আপ অন্দর আইয়ে!”

সন্তু বলল, “হামারা সুটকেস লেগে ভাগ গিয়া!”

লোকটি হেসে বলল, “ফিকর্‌ মাত কিজিয়ে, সুটকেস পৌঁছে জায়গা!”

লোকটির হাসির মধ্যে যথেষ্ট ভরসা আছে। তাই সন্তু আর কিছু না বলে চলে এল ওর সঙ্গে। লিফ্‌টে পাঁচতলায় পৌঁছে লোকটি একটা ঘরের বন্ধ দরজার টোকা মারল।

দরজা যিনি খুললেন, তাঁকে দেখে সন্তুর মুখটা খুশিতে ভরে গেল। যাক, তা হলে ঠিক জায়গাতেই আনা হয়েছে। আর সুটকেসের জন্য চিন্তা করতে হবে না।

ছিপছিপে লম্বা লোকটির নাম নরেন্দ্র ভার্মা। দিল্লিতে সি. বি. আই-এর একজন বড়কর্তা। কাকাবাবুর অনেক দিনের বন্ধু। সন্তুকেও ইনি ভালই চেনেন। এই তো গত বছরেই ত্রিপুরায় ইনি এসেছিলেন কাকাবাবুকে সাহায্য করতে। নরেন্দ্র ভার্মা কলকাতায় লেখাপড়া করেছেন বলে বাংলা মোটামুটি ভালই জানেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “এসো সনটু! কেমুন আছ? রাস্তায় গোলমাল হয়নি তো কিছু টায়ার্ড?”

সন্তু মাথা নেড়ে বলল, "না, একটুও টায়ার্ড নই। আপনি ভাল আছেন তো?"

নরেন্দ্র ভার্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, "ভাল কী করে থাকব? তোমার আংকল্ দিল্লিতে এসে এমুন ঝোন্‌ঝাট বাধাল, অথচ আমি কিছুই জানি না! আমাকে আগে কোনও খ্‌বরই দেয়নি! এসব কী বেপার বলো তো?"

সন্তু আকাশ থেকে পড়ল। সে তো কিছুই জানে না।

ঘরের চার দিকে চোখ বুলিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু কোথায়?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এখানে নেই। সেইফ জায়গায় আছে। আচ্ছা সন্টু, তুমি বলো তো, আ ক্যাট হ্যাজ নাইন লাইভ্‌স। তোমার এই কাকাবাবুর কখানা জীবন?"

"কেন, কী হয়েছে আবার?"

"আরে ভাই, ডেলহিতে আসবার আগে আমাকে একটা চিট্‌ঠি দিল না, এখানে এসে ভি খবর দিল না। আমি খবর পেলাম মার্ডার অ্যাটেম্‌ট হবার পর?"

"অ্যাঁ? মার্ডার অ্যাটেম্‌ট? কার ওপর?"

"তোমার কাকাবাবুর ওপর! আবার কার ওপর? কেন, তোমাকে চিট্‌ঠি লেখেননি?"

"চিঠিতে তো লিখেছেন, ওঁর জ্বর হয়েছে!"

"হাঁ হাঁ, তা তো লিখবেনই। আসল কথা লিখলে তোমার মা-বাবা বহোত দুশ্চিন্তা করতেন তো! এবারে বড় রকম ইনজুরি হয়েছে, খুব জোর বেঁচে গেছেন!"

"আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে চাই।"

"তা হবে না। তোমার কাকাবাবুই বলেছেন, তোমাকে সাবধানে রাখতে। কারা মারল তা তো বোঝা গেল না। তোমার কাকাবাবুর অনেক এনিমি, তবে কে হঠাৎ দিল্লিতে এসে মারতে যাবে? রায়চৌধুরী আমাকে বলল, তোমাকেও সাবধানে রাখতে। তোমার ওপর অ্যাটেম্‌ট হতে পারে। রায়চৌধুরীর ওপর ভি ফিন্ অ্যাটাক হতে পারে...।"

সন্তুর কাঁধে হাত রেখে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "বেশি চিন্তা কোরো না। এখন ভাল আছেন কাকাবাবু। এবারে বলো তো, কী কেস নিয়ে এসেছেন দিল্লিতে?"

সন্তু বলল, "আপনি জানেন না, আমি জানব কী করে? আমায় তো কিছুই বলেননি।"

"গর্ভনমেন্টের কোনও কেস হলে আমি ঠিকই জানতুম। সে সব কিছু না। শুনলাম কী, একজন আরবের সঙ্গে তোমার কাকাবাবুর খুব দোস্তি হয়েছে।"

"আরব?"

"হ্যাঁ। মিড্‌ল ইস্টের কোনও দেশের লোক। লোকটাকে আমি দেখিনি এখনও। রায়চৌধুরীও কিছু ভাঙছে না আমার কাছে। বলছে, ই সব তোমাদের গভর্নমেন্টের কিছু বেপার নয়।"

"কলকাতাতেও কাকাবাবুর কাছে একজন লোককে আসতে দেখেছি। যাকে দেখে সাহেবও মনে হয় না। ভারতীয়ও মনে হয় না।"

"প্রোবাব্‌লি দ্যাট ইজ আওয়ার ম্যান। লোকটাকে ধরতে হবে। কোন্ চক্করে ফাঁসিয়ে দিয়েছে তোমার কাকাবাবুকে।"

সন্তুর ভুরু কুঁচকে গেছে। দিল্লিতে এসে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না, এটা সে চিন্তাই করতে পারেনি।

সে জিজ্ঞাসা করল, "নরেন্দ্রকাকা, আমি কি এখানেই থাকব নাকি?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "না, একঘণ্টা বাদ তোমাকে আর এক গেস্টহাউসে নিয়ে যাওয়া হবে। দেখতে হবে কি, তোমায় কেউ ফলো করছে কি না। অন্য গেস্টহাউসে তোমার সুটকেস পেয়ে যাবে।"

"কাকাবাবুর সঙ্গে একবার টেলিফোনে কথা বলা যায় না?"

"আজ অসুবিধে আছে। কাল হবে। আজ রাতটা ঘুমোও।"

ঘণ্টাখানেক বাদে সন্তুকে আবার আর একটি গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল অন্য একটি বাড়িতে। এটা একটা মস্ত বড় গেস্টহাউস। অনেক লোকজন। নরেন্দ্র ভার্মা নিজে সন্তুকে দিয়ে গেলো একটি ঘরে। সেখানে আগে থেকেই তার সুটকেস রাখা আছে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার রাতের খাবার এই ঘরেই এসে যাবে। আর কিছু লাগলে বেল বাজিয়ে ডাকবে বেয়ারাকে। পয়সার চিন্তা কোরো না। আর, আজ রাতটা একলা বাইরে যেও না!"

নরেন্দ্র ভার্মা চলে যাবার পর সন্তু বিছানার ওপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। একটা অচেনা জায়গায় সে একদম একা। কাকাবাবু চিঠি পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন, অথচ কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

গতকাল প্রায় এই সময় সন্তু তিলজলার কাছে একটা থানায় বসেছিল, আর আজ সে দিল্লিতে একটা গেস্টহাউসে। আগামীকাল আবার কী হবে কেউ বলতে পারে না।

রাত্তিরটা এমনিই কেটে গেল। ভাল ঘুম হয়নি সন্তুর, সারা রাত প্রায় বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে। ভোরের আলো ফুটতেই সে বেরিয়ে এল বাইরে।

এখনও অনেকেই জাগেনি। বাড়িটার সামনের বাগানে অনেক রকম ফুল। গেটের বাইরে খুব চওড়া একটা রাস্তা। খুব সুন্দর একটা সকাল, কিন্তু সন্তুর মনটা খারাপ হয়ে আছে।

সন্তু বড় রাস্তাটায় খানিকটা হেঁটে বেড়াল। বেশি দূর গেল না। দিল্লির রাস্তা সে কিছুই চেনে না।

নরেন্দ্র ভার্মা এলেন ন'টা বাজার খানিকটা পরে। সন্তু তখন নিজের ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। এখানে ব্রেকফাস্টে অনেক কিছু দেয়, ফলের রস, কর্নফ্লেকস, দুধ আর কলা, টোস্ট আর ওমলেট, আর একটা সন্দেশ।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "কী সন্তু, ইউ আর ইন ওয়ান পিস? কেউ তোমাকে গুলি করেনি কিংবা কিডন্যাপ করার চেষ্টাও করেনি?"

সন্তু বলল, "কেউ আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "চলো, তৈয়ার হয়ে নাও। রাজা তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

সন্তুর তৈরি হয়ে নিতে পাঁচ মিনিটও লাগল না।

দিনের আলোয় দিল্লি শহরটাকে ভালভাবে দেখল সন্তু। রাস্তাগুলো যেমন বড় বড়, তেমনি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। দু'পাশে বড়-বড় বাড়ি। দিল্লির নাম শুনলেই সন্তুর মনে পড়ে লালকেল্লা আর কুতুব মিনারের কথা। কিন্তু সে-দুটো দেখা যাচ্ছে না। তবে একটা প্রকাণ্ড, গোলমতন বাড়ি দেখে সন্তু চিনতে পারল। ছবিতে অনেকবার দেখেছে, ওটাই পার্লামেন্ট ভবন।

নরেন্দ্র ভার্মার গাড়ি এসে থামল একটা নার্সিং হোমের সামনে। তিনতলার একটা ক্যাবিনের দরজা খুলতেই কাকাবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

সন্তু দেখল, কাকাবাবুর পেট আর বাঁ হাত জড়িয়ে মস্ত বড় ব্যাণ্ডেজ। মুখে কিন্তু বেশ হাশিখুশি ভাব। ক্যাবিনটা বেশ বড়, হোটেলের সুইটের মতন। সামনের দিকে বসবার জায়গা, দুটি সোফা ও দুটি চেয়ার রয়েছে, পেছন দিকে খাট আর একটা ছোট টেবিল। কাকাবাবু বসে আছেন একটা সোফায়, অন্যটিতে বসে আছেন একজন লম্বামতন লোক। সন্তু চিনতে পারল, এই লোকটিকেই কলকাতায় তাদের বাড়িতে কয়েকদিন আসতে দেখেছে। এঁরা দু'জনে মনোযোগ দিয়ে কী যেন আলোচনা করছিলেন। সন্তুদের দেখে থেমে গেলেন।

কাকাবাবু সন্তুকে ডেকে বললেন, "আয় সন্তু, কাল রাত্তিরে তোর একা থাকতে খারাপ লাগেনি তো?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "দু'জন গার্ড পোস্টেড ছিল ওর ঘরের দিকে নজর রাখার জন্য, সন্তু তা টেরই পায়নি।"

সন্তু বেশ অবাক হল। সত্যি সে কিছু বুঝতে পারেনি তো!

কাকাবাবু বললেন, "আর কিছু হবে না। আমাকে কোনও উটকো ডাকাত মারতে এসেছিল বোঝা যাচ্ছে। এটা কোনও দলের কাজ নয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "উট্কো? উট্কো কথাটার মানে কী আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "এই, সাধারণ একটা কেউ।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমাকে গুলি করে পালাল, ঘর থেকে কিছু জিনিসপত্র নিল না, এ কি সাধারণ ডাকাত?"

অপরিচিত লোকটি মাথা নিচু করে বসেছিলেন। এবারে মুখ তুলে বললেন, "আই ফিল গিল্টি!"

কাকাবাবু ইংরিজিতে বললেন, "না, না, আপনার কোনও দায়িত্ব নেই। আমি তো নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি!"

তারপর সন্তুদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন... এঁর নামটা মস্ত বড়, সবটা বললে মনে থাকবে না, সবাই এঁকে আল মামুন বলে ডাকে। ইনি একজন ব্যবসায়ী।"

ভদ্রলোক সন্তুর দিকে মাথা নাড়িয়ে বললেন, "গুড মর্নিং, হাউ ডু ইউ ডু?"

তারপরই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আই মাস্ট গো! মিস্টার রায়চৌধুরী, আই উইল গেট ইন টাচ উইথ ইউ!"

বেশ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন। স্পষ্ট মনে হল, ওঁর মুখে যেন একটা ভয়ের ছাপ।

নরেন্দ্র ভার্মা কাকাবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি করলেন, তারপর তিনিও বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই অমনভাবে তাকাচ্ছিস কেন? এই ব্যাণ্ডেজটা দেখতেই এত বড়, আসলে বিশেষ কিছু হয়নি। পাঁজরা ঘেঁষে একটা গুলি চলে গেছে, কিন্তু পাঁজরা-টাজরা ভাঙেনি কিছু। ব্যাটারা কেন যে এরকম এলোপাথাড়ি গুলি চালায়! টিপ করতেই শেখেনি!"

সন্তু একদৃষ্টিতে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। পেটে গুলি লেগেছে, তা নিয়েও কাকাবাবু ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে পারেন!

নরেন্দ্র ভার্মা তক্ষুনি ফিরে এসে বললেন, "আমার লোক লাগিয়ে দিয়েছি, তোমার পাখি কোন্ বাসায় থাকে তা ঠিক জেনে আসবে।"

কাকাবাবু হাসলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এবারে সব খুলে বলো তো রাজা! তুমি আমার ওপরেও ধোঁকা চালাচ্ছ? আমাদের না জানিয়ে ও লোকটার সঙ্গে তোমার কিসের মামলা?"

কাকাবাবু সে-রকমই হাসতে হাসতে বললেন, "আরে সেরকম কিছু না। এর মধ্যে কোনও ক্রাইম বা ষড়যন্ত্র বা বড় ধরনের রহস্যের ব্যাপার নেই। ওই লোকটা একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল, তাই আমি কৌতূহলী হয়ে এসেছি দিল্লিতে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বলল, "ক্রাইম কিছু নেই? তবে গুলিটা চালাল কে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা অবশ্য আলাদা ব্যাপার। আমি যেজন্য দিল্লিতে এসেছি তার সঙ্গে এর হয়তো কোনও সম্পর্ক নেই। আবার থাকতেও পারে। আচ্ছা, আমি সব বুঝিয়ে বলছি, সুস্থির হয়ে বোসো।"

সন্তুর দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুই জানিস, হিয়েরোগ্লিফিক্স কাকে বলে?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ!"

কাকাবাবু আর নরেন্দ্র ভার্মা দু'জনেই অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালেন।

কাকাবাবু বললেন, "অ্যাঁ? তুই জানিস? বল তো কাকে বলে?"

সন্তু বলল, "হিয়েরোগ্লিফিক্‌স হচ্ছে একরকম ছবির ভাষা। মিশরের পিরামিডে কিংবা অন্য-সব স্মৃতিস্তম্ভে ছবি এঁকে এঁকে অনেক কথা লেখা হত!"

"অনেকটাই ঠিক বলেছিস। এ তুই কোথা থেকে শিখলি?"

"একটা কমিক্‌সে পড়েছি।"

"তা হলে তো কমিক্‌সগুলো যত খারাপ ভাবতুম তত খারাপ নয়!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তুমি যে শব্দটা বললে, আমি নিজেই তো তার মানে জানতুম না।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে তুমিও কমিক্‌স পড়তে শুরু করে দাও! আচ্ছা, এবার তাহলে ঘটনাটা গোড়া থেকে বলি। এই যে আল মামুন নামে ভদ্রলোককে দেখলে, ইনি কলকাতায় গিয়ে আমার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেছিলেন। একটা ব্যাপারে আমার সাহায্য চান। উনি কয়েকটা লম্বা-লম্বা হলদে কাগজ নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে লাল রঙের অনেক ছোট-ছোট ছবি আঁকা। দেখলে মনে হয়, যে এঁকেছে, তার আঁকার হাত খুবই কাঁচা, এবং খুব সম্ভবত একজন বুড়ো লোক। আল মামুন বলেছেন, ঐ ছবিগুলো এঁকেছেন তাঁর এক আত্মীয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সেই ছবিগুলো, ঐ যে কী নাম বললে, সেই ভাষায় লেখা?"

সন্তু বলল, "হিয়েরোগ্লিফিক্‌স!"

কাকাবাবু হাহা করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "কয়েক হাজার বছর আগে লুপ্ত হয়ে গেছে এই ভাষা। এখন কি আর এই ভাষায় কেউ লেখে? লিখলেও বুঝতে হবে সে-লোকটি পাগল।"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "ছবিগুলো তোমার কাছে নিয়ে যাবার মানে কী? তুমি কি ঐ ভাষায় একজন এক্সপার্ট?"

কাকাবাবু বললেন, "তা বলতে পারো। এক সময় আমি ঐ নিয়ে চর্চা করেছি। তোমার মনে নেই, নরেন্দ্র, বছর দশেক আগে আমি টানা ছ' মাস ইজিপ্টে ছিলাম? মিশরের সব হিয়েরোগ্লিফিক্‌সের পাঠ আজও উদ্ধার করা যায়নি। অনেকেই চেষ্টা করেছেন। আমি কিছু-কিছু পড়তে পারি। এ সম্পর্কে আমার লেখা কয়েকটা প্রবন্ধও বিদেশি কাগজে বেরিয়েছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা জানতে চাইলেন, "ঐ আল মামুন কোন্ দেশের লোক?"

"ইজিপশিয়ান। ব্যবসা সূত্রে প্রায়ই আসতে হয় এদেশে। এখান থেকে উনি চা, সেলাইকল, সাইকেল, এইসব জিনিস নিয়ে যান নিজের দেশে।"

"তা একজন ব্যবসায়ীর এরকম ইতিহাসে উৎসাহ?"

"সেটাও একটা মজার ব্যাপার। ঐ ভদ্রলোক প্রাচীন মিশরের ইতিহাস সম্পর্কে

কিছুই জানেন না। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ছবিগুলো বোধহয় ইজিপ্টের কোনও পিরামিডের দেয়াল থেকে কপি করা। কিন্তু তা-ও নয়। আল মামুন কোনও দিন পিরামিড চোখেও দেখেননি!”

“অ্যাঁ? ইজিপ্টের লোক অথচ পিরামিড দেখেনি!”

“এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? ভারতবর্ষে সব লোক কি তাজমহল দেখেছে? হিমালয়ই বা দেখেছে ক'জন? আল মামুন দূর থেকে হয়তো একটা দুটো পিরামিড দেখে থাকতে পারেন। কিন্তু ভেতরে কখনও যাননি। উনি বলছেন যে, এই দিল্লিতেই ওঁর এক আত্মীয় থাকেন, ছবিগুলো তিনি এঁকেছেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বিরক্ত হয়ে বললেন, “ধেত্! কী তুমি সব ছবি-টবির কথা বলছ, কোন্ বুড়ো কী এঁকেছে, তাতে আমি কোনও আগ্রহ পাচ্ছি না!”

কাকাবাবু বললেন, “সেইজন্যেই তো তোমাকে আগে এসব বলতে চাইনি।”

“কিন্তু এর সঙ্গে তোমাকে মার্ডার করার সম্পর্ক কী? মানে বলছি, কী তোমাকে হঠাৎ কেউ মারতে এল কেন?”

“সম্পর্ক একটাই থাকতে পারে। আল মামুন ঐ ছবিগুলোর অর্থ করে দেওয়ার জন্য আমাকে এক লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিলেন।”

নরেন্দ্র ভার্মা হু-ই-ই করে শিস দিয়ে উঠে বললেন, “এক লাখ টাকা? কয়েকটা ছবি পড়ে দেবার জন্য? কী আছে ঐ ছবির মধ্যে? তুমি মানে বুঝেছিলে?”

“আগে আর-একটা ব্যাপার শোনো। আল মামুনের ওই যে আত্মীয়, তাঁর নাম মুফ্‌তি মহম্মদ। তিনি খুব ধার্মিক ব্যক্তি, তাঁর অনেক শিষ্য আছে। তাঁর বয়েস নাকি সাতানব্বই, শরীর বেশ শক্তসমর্থ। শুধু গত বছর থেকে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেছে। একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারেন না। তাঁকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে দিল্লিতে।”

“সাতানব্বই বছর বয়েস? তার আবার চিকিৎসা?”

“এটা দেখা যায় যে, সন্ন্যাসী-ফকিররা অনেক বাঁচেন। তাঁদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। সাধক মুফ্‌তি মহম্মদের শুধু কথা বন্ধ হয়ে গেছে।”

“সাতানব্বই বছর বয়সে তিনি ছবি আঁকছেন?”

“আল মামুনের মুখে যা শুনেছি, উনি লিখতে জানেন না। আগে কখনও ছবিও আঁকেননি। মুসলমান সাধকেরা কেউ ছবি আঁকেন না। ইনি ছবি এঁকেছেন ঘুমের ঘোরে।”

“অ্যাঁ? কী গাঁজাখুরি গল্প শুরু করলে রাজা?”

“আর-একটু ধৈর্য করে শোনো, নরেন্দ্র! আমি যা শুনেছি, তা-ই বলছি। ধর্মীয় গুরু বলে মুফ্‌তি মহম্মদকে হাসপাতালে রাখা হয়নি, রাখা হয়েছে আলাদা একটা বাড়িতে। এক-একদিন মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে উঠে বসে ঐ ছবিগুলো আঁকছেন।”

“হলদে কাগজে, লাল কালিতে? ঘুমের মধ্যে তিনি সে-সব পেলেন কোথায়?”

"লাল কালি নয়, লাল পেন্সিল। উনি যে ঘরে থাকেন, তার পাশের ঘরের টেবিলে অনেক রকম কাগজ আর পেন্সিল থাকে। সেটা আল মামুনের অফিস-ঘর। মুফতি মহম্মদ সাহেব ঘুমের মধ্যেই পাশের ঘরে উঠে এসে, বেছে বেছে হলদে কাগজ আর লাল পেন্সিলে ছবিগুলো আঁকছেন। ছবিগুলো যে হিয়েরোগ্লিফিক্সেরই মতন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিছু কিছু পরিষ্কার অর্থ পাওয়া যায়।"

"কী মানে বুঝলে?"

"সেটা এখন বলা যাবেনা। খুব গোপন ব্যাপার। সাধক মুফতি মহম্মদের অনেক শিষ্য এই দিল্লিতেই আছেন। আল মামুন তাঁদের কিছু জানাতে চান না। গুরুদেব কী লিখছেন সেটা তিনি নিজে আগে জেনে নিতে চান।"

"সেইজন্য দিতে চান এক লাখ টাকা? উনি কি ভাবছেন, এটাই গুরুর বিষয়-সম্পত্তির উইল?"

"গুরুর উপদেশও অনেকের কাছে খুব মূল্যবান।"

"তুমি তবে এক লাখ টাকা পেয়ে গেছ, আর টাকার লোভেই দুশমন তোমাকে গুলি করতে এসেছিল?"

"সেই টাকা পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। ঐ কাগজে কী লেখা হয়েছে, তা আমি আল মামুনকে বলিনি এখনও!"

"বলোনি? ওকেও বলোনি কেন?"

কাকাবাবু মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এক লাখ টাকা দিতে চায়, তবু ওকে তুমি দু'চারটা ছবির মানে বলে দাওনি?"

কাকাবাবু বললেন, "না। ওকে কিছু বলিনি, তার কারণ আমি আল মামুনের কোনও কথা বিশ্বাস করিনি।"

সন্তু এতক্ষণ প্রায় দম বন্ধ করে শুনছিল, এবারে সে একটা বড় নিশ্বাস ফেলল। টাকার লোভে কাকাবাবু কোনও কাজ করবেন, তা সে বিশ্বাসই করতে পারে না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "ওই ছবির ভাষা থেকে আমি বুঝেছি, তা এখনকার কোনও ব্যাপারই নয়। অন্তত সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার একটা ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। তাও শেষ হয়নি। আমি পেয়েছি মাত্র চারখানা হলদে কাগজ। এর পরে যেন আরও আছে। সেইজন্য আমি আল মামুনকে বলেছিলুম, আমি গুরু মুফতি মহম্মদকে নিজের চোখে দেখতে চাই। সেইজন্যই আমার দিল্লি আসা।"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "দেখা হয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "না। সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। এতদিন দিল্লি এসে বসে রইলুম, তবু আল মামুন সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন না। কখনও বলেন যে, ওঁর গুরুর মেজাজ ভাল না থাকলে বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে চান না। আবার কখনও বলেন যে, অন্য শিষ্যরা সব সময় ঘিরে থাকে, সেইজন্য সুযোগ

হচ্ছে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার ঐ আল মামুন কোথায় থাকে আমি আজই জেনে যাচ্ছি। আমি ওকে ফলো করার জন্য লোক লাগিয়ে দিয়েছি। এবারে বলো, তোমার ওপর যে-লোকটা গুলি চালাতে এসেছিল, সে লোকটা কেমন? সেও কি পরদেশি? তার মুখ তুমি নজর করেছিলে?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, মুখ দেখেছি, কিন্তু একপাশ থেকে। আমার ধারণা সে একটা ভাড়াটে খুনি। কেউ তাকে টাকা দিয়ে বলেছে আমাকে সাবাড় করে দিতে। দ্যাখো, আমার ওপর অনেকের রাগ আছে। কত পুরনো শত্রু আছে। তাদেরই কেউ দিল্লিতে আমায় চিনতে পেরে খতম করে দিতে চেয়েছে। ও ঘটনায় গুরুত্ব দেবার কিছু নেই!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তুমি কী বলছ, রাজা?" একটা লোক তোমাকে খতম করে দিতে এসেছিল, আর তাতে কোনও গুরুত্ব নেই? তাজ্জব! লোকটা যদি আবার আসে? শুনেছ সন্টু, তোমার কাকাবাবু কেমুন ছেলেমানুষের মতন কথা বলেন!"

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, "আরে ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে তো কোনও কাজই করা যায় না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "লোকটা কি রাত্তিরবেলা ঘরের মধ্যে এসে গুলি করেছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "তখন রাত বেশি না, এগারোটা হবে বড়জোর। হোটেলের ঘরে বসে আমি পড়াশুনো করছিলাম। ঘরের পাশেই একটা ছোট বারান্দা, তার দরজাটা খোলা। একটা শব্দ হতেই চোখ তুলে দেখি যে, বাইরে থেকে বারান্দায় একটা লোক লাফিয়ে উঠে এল। তার হাতে রিভলভার। আমারও বালিশের তলায় রিভলভার থাকে, তুই জানিস। কিন্তু আমি বসে ছিলাম বালিশটা থেকে বেশ দূরে। হাত বাড়িয়ে সেটা নেবার সময় পেলাম না। লোকটা এসেই কোনওরকম কথাবার্তা না বলে রিভলভার তুলল আমার কপাল লক্ষ করে। যদি টিপ করে গুলি চালাত, তা হলে আমি সেই মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতাম। তখন বাঁচার একটাই উপায়। আমি প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে বললুম, "ব্লাডি ফুল! লুক বিহাইণ্ড!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "কপালের সামনে রিভলভারের নল দেখেও তুমি চিৎকার করতে পারলে? তোমার নার্ভ আছে বটে!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আগেও অনেকবার এই রকম চেঁচিয়ে সুফল পেয়েছি। হঠাৎ খুব জোরে শব্দ হলে পাকা-পাকা শিকারিদেরও টিপ নষ্ট হয়ে যায়। এখানেও তাই হল। আমার ধমক শুনে লোকটার হাত কেঁপে গেল একটু, তার গুলি লাগল আমার পাঁজরায়। আমি সাঙ্ঘাতিক আহত হবার ভান করে ঝাঁপিয়ে পড়লুম বিছানায়। সঙ্গে-সঙ্গে বালিশের তলা থেকে রিভলভার বার করে এনেছি। লোকটাকে আমি তখন গুলি করতে পারতুম। কিন্তু আমি দেখতে চাইলুম লোকটা এর পর কী করে! কোনও জিনিসপত্তর নিতে চায় কি না। লোকটা কিন্তু আর কিছু

করল না। সে ভাবল বোধহয় যে, একটা গুলি চালিয়েই তার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আবার টপ করে বারান্দা ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “হাঁ, ভাড়াটে খুনি বলেই মালুম হচ্ছে। দিল্লিতে এরকম অনেক আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “আমার সন্দেহ হচ্ছে, যে ওকে ভাড়া করেছিল, সে ওকে পুরো টাকা দেয়নি। এত কাঁচা কাজের জন্য ওর পাঁচ টাকার বেশি পাওয়া উচিত নয়।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “লোকটা সাকসেসফুল হয়নি বলে তোমার আফসোস হচ্ছে মনে হচ্ছে!”

কাকাবাবু আবার জোরে হেসে উঠলেন। নরেন্দ্র ভার্মাও হাসতে লাগলেন।

এই সময় বাইরের রাস্তায় একটা হৈচৈ আর দুমদাম শব্দ হতে লাগল। সন্তু চলে এল জানলার কাছে।

কী যেন একটা কাণ্ড হয়েছে রাস্তায়। লোকজন ছোটাছুটি করছে। একটা বাসে আগুন লেগে গেছে।

নরেন্দ্র ভার্মা উঠে এসে উঁকি দিয়ে বললেন, “ওঃ! এমন কিছু নয়। বাস বোধহয় একটা লোক চাপা দিয়েছে, তাই পাবলিক রেগে গিয়ে বাসটাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! এসব তোমাদের ক্যালকাটাতে আগে হত, এখন আমদানি হয়ে গেছে দিল্লিতেও!”

◀ ৪ ▶

সেদিন দিল্লি শহরের অনেক রাস্তাতেই খুব গণ্ডগোল, মারামারি চলল। পরের দিন কারা যেন ডেকে বসল হরতাল। বাস, ট্যাক্সি, অটো রিকশা সব বন্ধ। সকালের দিকে কয়েকটা প্রাইভেট গাড়ি বেরুলেও লোকেরা বন্ধ করে দিল ইট-পাটকেল মেরে। দিল্লির চওড়া-চওড়া রাস্তাগুলো একেবারে ফাঁকা।

এত বড় একটা ব্যস্ত শহরকে দিনের বেলা একেবারে শুনশান দেখলে কেমন অদ্ভুত লাগে!

আগের রাত্তিরে সন্তু ফিরে এসেছিল গেস্ট হাউসে। সকাল থেকে সে ছটফট করছে। কী করে সেই নার্সিংহোমে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাবে? গাড়ি বন্ধ বলে নরেনকাকাও আসতে পারবেন না। সন্তু যে রাস্তা চেনে না। না হলে সন্তু হেঁটেই চলে যেতে পারত।

বেলা এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর সন্তু আর থাকতে পারল না, বেরিয়ে পড়ল। সন্তু জানে, হরতালের দিন রাস্তা দিয়ে হাঁটলে কেউ কিছু বলে না। কয়েকটা সাইকেলও চলছে।

বেশিদূর যেতে হল না, একটু পরেই একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল সন্তুর পাশে। ড্রাইভারের পাশ থেকে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "উঠে পড়ো সন্টু! একেলা কোথা যাচ্ছিলে?"

একটু বাদেই ওরা পৌঁছে গেল নার্সিং হোমে।

কাকাবাবু খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে ছিলেন। ওদের দেখেই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "এসেছ? আমি ভাবছিলাম যে কী করে আসবে! শোনো নরেন্দ্র, রফি মার্গ কোথায়? এখান থেকে হেঁটে যাওয়া যায়?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রফি মার্গ? সে তো এখান থেকে অনেক দূর। এটা চিত্তরঞ্জন পার্ক আর রফি মার্গ সেই কনট প্লেসের কাছে। হেঁটে যাওয়া অসম্ভব!"

কাকাবাবু বললেন, "নেপোলিয়ন কী বলেছিলেন জানো না? অসম্ভব বলে কিছু নেই তাঁর ডিক্‌শনারিতে।"

"সেটা নেপোলিয়নের বেলা সত্যি হতে পারে। কিন্তু সকলের পক্ষে নয়। কী ব্যাপার, তুমি রফি মার্গ পর্যন্ত হেঁটে যেতে চাও নাকি?"

"হ্যাঁ। আর দেরি করে লাভ নেই। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।"

কাকাবাবু উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন, নরেন্দ্র ভার্মা বাধা দিয়ে বললেন, "আরে, ঠারো, ঠারো! হঠাৎ রফি মার্গ হেঁটে যেতে হবে কেন সেটা শুনি!"

কাকাবাবু বললেন, "আল মামুন ফোন করেছিলএকটু আগে।"

"তোমার এ-ঘরে তো ফোন নেই?"

"দোতলায় আছে। সেখানে নেমে গিয়ে আমি ফোন ধরেছি।"

"এখনও তোমার ব্যান্ডেজ বাঁধা, এই অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্যায় করেছ। যাই হোক, তারপর কী বলল, টেলিফোনে?"

"গুরু মুফ্‌তি মহম্মদ আবার ঘোরের মাথায় ছবি আঁকতে শুরু করেছেন। আজ আর ওখানে কোনও লোকজন নেই। আমরা এখন গেলে দেখতে পারি।"

"এই যে শুনেছিলুম উনি মাঝরাতে ছবি আঁকেন?"

"মাঝরাতেই যে আঁকবেন, তার কোনও মানে নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে আঁকতে শুরু করেন। শুনলুম যে, উনি কাল সারারাত ঘুমোননি, বিছানার ওপর ঠায় বসেছিলেন, ঘুমিয়েছেন সকাল আটটায়। চলো, চলো, আর দেরি করে লাভ নেই।"

"শোনো রাজা, নেপোলিয়ন যাই-ই বলুন, তোমার পক্ষে এখন যাওয়া অসম্ভব। ডাক্তার তোমাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই বারণ করেছেন। আর তুমি ক্রাচ নিয়ে অতদূর যেতে চাও?"

"আরে ডাক্তারদের কথা সব সময় মানলে চলে না। আমি ভাল আছি বেশ। অনায়াসে যেতে পারব!"

"পাগলামি কোরো না, রাজা। আমাদের মতন লোকেরই হেঁটে যেতে তিন-

চার ঘণ্টা লাগবে। আর তুমি ক্রাচ নিয়ে কতক্ষণে পৌঁছবে? পুলিশের গাড়িটা ছেড়ে দিলাম... ঠিক আছে টেলিফোনে আর-একটা গাড়ি আনাচ্ছি, সেই গাড়িতে যাব।"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু, তা চলবে না। সে-কথা আগেই ভেবেছিলাম। আল মামুনকে আমি বলেছিলাম, আজ তো গাড়িঘোড়া চলছে না, যেতে গেলে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে। আল মামুন তীব্র আপত্তি করে বলেছে, না পুলিশের গাড়িতে যাওয়া কিছুতেই চলবে না। ও-বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি থামলেই সকলের চোখে পড়ে যাব। মুফ্‌তি মহম্মদের মতন সম্মানিত মানুষের কাছে পুলিশ এসেছে, এ-কথা জানলে তার শিষ্যরা চটে যাবে খুব!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তাও একটা কথা বটে। পরদেশি নাগরিক, ঝটাক্‌সে ওদের কাছে পুলিশের গাড়ি যাওয়া ঠিক নয়। তা হলে কী উপায়?"

"হেঁটেই যেতে হবে। শুধু-শুধু দেরি করছ কেন?"

"রাজা, তুমি বুঝতে পারছ না, ক্র্যাচ নিয়ে হেঁটে পৌঁছতে তোমার কম সে কম চার ঘণ্টা লেগে যাবে। ততক্ষণ কি তোমার ঐ বুঢ়াবাবা বসে বসে ছবি আঁকবেন?"

কাকাবাবু এবারে ব্যাপারটা বুঝলেন। মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। এ তো আর পাহাড়ে ওঠা নয়, শুধু-শুধু একটা শহরে চার-পাঁচ ঘণ্টা হাঁটার কোনও মানে হয় না!

একটু চুপ করে থেকে কাকাবাবু বললেন, "আর একটা উপায় আছে, কোনও ডাক্তারের গাড়ি যেতে পারে, তাই না? ডাক্তারের গাড়ি কিংবা হাসপাতালের গাড়ি নিশ্চয়ই আটকাবে না?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ, তা হতে পারে। দেখি কোনও ডাক্তারের গাড়ি জোগাড় করা যায় কি না।"

সন্তু বলল, "সাইকেলেও যাওয়া যায়। আমি দেখলুম রাস্তায় সাইকেল চলছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছিস! তা হলে দেখলি তো সাইকেল শেখারও উপকারিতা আছে। এক-এক সময় কত কাজে লাগে। ডাক্তারের গাড়ি যদি করা না যায়, তাহলে তুই আর নরেন্দ্র সাইকেলে চলে যেতে পারবি। পায়ের জন্য আমি তো আজকাল আর সাইকেল চালাতে পারি না।"

নরেন্দ্র ভার্মা নীচে থেকে ঘুরে এসে বললেন, "এখন তো একটাও ডাক্তারের গাড়ি নেই। তবে একটা অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান একটু বাদেই ফিরবে।"

কাকাবাবু অস্থিরভাবে বললেন, "একটু বাদে মানে কতক্ষণ বাদে? দ্যাখো, না হয় দুটো সাইকেলই জোগাড় করো।"

শেষ পর্যন্ত তাই-ই করতে হল। নানান জায়গায় টেলিফোন করেও কোনও ডাক্তারের গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেল না। সবাই বলেছে, আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার মধ্যে আসতে পারে। কাকাবাবু অত দেরি করতে রাজি নন। নার্সিং হোমের

দরোয়ানদের কাছ থেকে দুটো সাইকেল জোগাড় হল, তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা।

এ রকম ফাঁকা রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে আরাম। হরতালের দিন কলকাতার রাস্তায় ছেলেরা ফুটবল খেলে, কিন্তু দিল্লিতে সে-রকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাস্তায় মানুষজন খুব কম।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সেই কলেজ-জীবনের পর আর সাইকেল চালাইনি। তোমার কাকাবাবুর পাল্লায় পড়ে কত কী যে করতে হয় আমাকে! অবশ্য, খারাপ লাগছে না। আচ্ছা সন্টু, একটা সত্যি কথা বলবে?"

"হ্যাঁ, বলুন।"

"একটা বুড়া সাধু কী সব ছবি আঁকছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি কোনও মানে আছে? আমরা কি বুনোহাঁস তাড়া করছি না?"

"সব ব্যাপারটা আমি এখনও বুঝতে পারছি না, নরেনকাকা!"

"চলো, গিয়ে দেখা যাক!"

সাইকেলে রফি মার্গ পৌঁছতেই এক ঘণ্টার বেশি লেগে গেল। নরেন্দ্র ভার্মা দিল্লির সব রাস্তা খুব ভাল চেনেন, তাই ঠিকানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না।

এই রাস্তার সব বাড়িই অফিসবাড়ি বলে মনে হয়। তারই মধ্যে একটি ছোট, হলদে রঙের দোতলা বাড়ি। ছোট হলেও বাড়িটি দেখতে খুব সুন্দর, সামনে অনেকখানি ফুলের বাগান।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এই রাস্তা দিয়ে কতবার গেছি, কিন্তু এ-বাড়িতে যে ইজিপশিয়ানরা থাকে, কোনও দিন জানতেই পারিনি। দিল্লিতে যে কত কিসিমের মানুষ থাকে!"

গেটের সামনে একজন দরোয়ান বসে আছে। তার কাছে আল মামুনের নাম করতেই সে দোতলায় উঠে যেতে বলল।

সারা বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ, কোনও মানুষ আছে বলে মনেই হয় না। দোতলাতেও সিঁড়ির মুখে কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট। ওরা সেখানে এসে দাঁড়াতেই আল মামুন একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওদের কোনও রকম শব্দ করতে নিষেধ করলেন। তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়ার ইজ মিঃ রায়চৌধুরী?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "গাড়ি জোগাড় করা যায়নি বলে তিনি আসতে পারেননি!"

আল মামুনের মুখে একটা হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "আপনাদের তো ডাকিনি। আপনাদের দিয়ে কোনও কাজ হবে না। আপনারা ফিরে যান।"

এই কথা বলে আল মামুন পেছন ফিরতেই নরেন্দ্র ভার্মা গেটের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আল মামুনের একটা হাত চেপে ধরলেন। তারপর খুব আস্তে অথচ দৃঢ়

গলায় বললেন, "আমি ভারত সরকারের প্রতিনিধি। মিঃ রায়চৌধুরী আমাকে আর তাঁর ভাইপোকে পাঠিয়েছেন এখানে কী ঘটছে, তা দেখে গিয়ে রিপোর্ট করবার জন্য। এই হরতালের দিনেও আমরা কষ্ট করে এমনি-এমনি ফিরে যাবার জন্য আসিনি। গেট খুলুন।"

নরেন্দ্র ভার্মা এমনিতে হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু এক-এক সময় তাঁর মুখখানা এমন কঠিন হয়ে যায় যে, দেখলে ভয় লাগে।

আল মামুন আর দ্বিরুক্তি না করে গেট খুলে দিলেন। তারপর বললেন, "জুতো খুলে ফেলুন!"

খালি পায়ে একটা টানা বারান্দা পেরিয়ে এসে ওরা ঢুকল একটা মাঝারি সাইজের ঘরে। সে-ঘরে খাট-বিছানা পাতা, কিন্তু বিছানাতে কেউ নেই। বিছানার ঠিক পাশেই অন্য একটা ঘরে যাওয়ার দরজা।

আল মামুন ওদের ইশারা করলেন সেই দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে।

অন্য ঘরটিতে রয়েছে একটা টেবিল আর কয়েকখানা চেয়ার। একটা চেয়ারে বসে আছেন একজন খুবই লম্বা মানুষ, পরনে একটা কালো রঙের আলখাল্লা। তাঁর মাথার চুল ধপধপে সাদা উলের মতন, আর মুখভর্তি সাদা দাড়ি পাতলা তুলোর মতন। হাতে একটা লাল ফেল্ট পেন, টেবিলের ওপর একটা বড় হলদে কাগজে তিনি ছবি আঁকছেন।

সত্যি, দেখলে মনে হয় যেন তিনি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আঁকছেন। চোখ দুটি প্রায় বোজা, হাতের কলমটা দিয়ে একটা দাগ কেটে থেমে যাচ্ছেন, তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার একটা দাগ কাটছেন।

সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা প্রায় নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল এই দৃশ্য। একজন সাতানব্বই বছরের বৃদ্ধ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে ছবি আঁকছেন, এ যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

মুফতি মহম্মদ একবার হঠাৎ এই দরজার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটো খোলা, তবু তিনি ওদের দেখতে পেলেন কি না বোঝা গেল না। একটুও বিরক্ত হলেন না। বরং তাঁর মুখে যেন একটা পবিত্র ভাব ফুটে আছে। দেখলেই ভক্তি জাগে।

আবার মুখ ফিরিয়ে ছবি আঁকতে মন দিলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা সন্তুকে চোখের ইঙ্গিতে বললেন, "এবার চলো!"

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে খানিকটা আসতেই সিঁড়িতে ঠক্ ঠক্ শব্দ উঠল।

আল মামুন ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। সিঁড়ির মুখের কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট তিনি ভুল করে খোলা রেখে এসেছিলেন। তিনি গেট পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই ভেতরে ঢুকে এলেন ক্রাচ বগলে নিয়ে একজন মানুষ।

নরেন্দ্র ভার্মা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "আনডনটেড রাজা রায়চৌধুরী! তাঁকে কেউ পেছনে ফেলে রেখে আসতে পারে না!"

কাকাবাবু হাসিমুখে বললেন, "তোমরা চলে আসার পরেই একটা অ্যামবুলেন্স পেয়ে গেলাম।"

তারপর তিনি আল মামুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "খবর কী? এখনও ছবি আঁকছেন?"

ওরা তিনজনই এক সঙ্গে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "চলো। আমি একটু দেখি। ওঁর সঙ্গে আমার কথা বলা খুব দরকার।"

আল মামুন সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, "নো নো নো, দ্যাট ইজ আউট অব কোয়েশ্চেন। ওঁকে এই অবস্থায় কিছুতেই ডিসটার্ব করা যাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কথা বলাটা অত্যন্ত জরুরি। আপনারা বুঝতে পারছেন না, কারুর সঙ্গে কথা বলার জন্যই উনি ওই ছবিগুলো আঁকছেন?"

আল মামুন বললেন, "কী করে কথা বলবেন আপনি? ওঁর গলার আওয়াজ নষ্ট হয়ে গেছে, উনি কোনও উত্তর দিতে পারবেন না। আপনার ইংরিজি প্রশ্নও উনি বুঝবেন না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমিও সেই কথা ভাবছিলুম। রাজা, উনি তোমার প্রশ্ন বুঝবেন কী করে? আল মামুন যদি বুঝিয়ে দেন, তা হলেই বা উনি কী করে উত্তর দেবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "উনি যে ভাষা বোঝেন, সেই ভাষাতেই আমি প্রশ্ন করব।"

জামার পকেট থেকে কাকাবাবু একটা ভাঁজ-করা কাগজ বার করলেন। তারপর দেখালেন সেটা খুলে। তাতেও কতকগুলো ছোট-ছোট ছবি আঁকা।

কাকাবাবু বললেন, "এই ছবির ভাষা তোমরা কেউ বুঝবে না, উনি হয়তো বুঝতে পারেন।"

কাকাবাবুকে নিয়ে আসা হল সেই ঘরে। সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে। আল মামুন কাকাবাবুকে নিয়ে ঢুকলেন পাশের ঘরে।

কাকাবাবুর ক্রাচের শব্দ পেয়ে চোখ তুলে তাকালেন মুফতি মহম্মদ। আল মামুন খুব বিনীতভাবে কিছু বললেন তাঁকে। খুব সম্ভবত কাকাবাবুর পরিচয় দিলেন।

কাকাবাবু কপালের কাছে হাত ছুঁইয়ে বললেন, "আদাব।"

তারপর তাঁর ছবি-আঁকা কাগজটা ছড়িয়ে দিলেন টেবিলের ওপর।

মুফতি মহম্মদ এখন নিশ্চয়ই জেগে উঠেছেন পুরোপুরি। কেননা, সেই কাগজটা দেখেই তাঁর মুখে দারুণ অবাক ভাব ফুটে উঠল। একবার কাগজটার দিকে, আর একবার কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন তিনি।

তারপর হাতছানি দিয়ে কাকাবাবুকে কাছে ডাকলেন। কাকাবাবু তাঁর পাশে গিয়ে

দাঁড়াতেই তাঁর লম্বা ডান হাত রাখলেন কাকাবাবুর মাথায়, নিজে চোখ বুজে রইলেন একটুক্ষণ। ঠিক যেন তিনি কাকাবাবুকে আশীর্বাদ করছেন ভারতীয়দের প্রথায়।

একটু পরে হাতটা সরিয়ে নিয়ে লাল কলমটা তুলে ছবি আঁকতে শুরু করলেন।

কিন্তু তাঁর হাত যেন চলছেই না। খুব অলসভাবে দাগ কাটছেন, বোঝা যায় তাঁর হাত কেঁপে যাচ্ছে। একটুখানি এঁকেই তিনি তাকাচ্ছেন কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু ঘাড় নাড়ছেন।

মাত্র তিনটি ছবি কোনওক্রমে আঁকার পরেই তাঁর হাত থেকে কলমটা খসে পড়ে গেল মাটিতে। মুখখানা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর, তারপর একেবারে নুয়ে টেবিলের ওপর পড়ে যাবার আগেই কাকাবাবু আর আল মামুন দু'দিক থেকে ধরে ফেললেন তাঁকে।

◀ ৫ ▶

কাকাবাবু আর সন্তুকে কড়া পুলিশ পাহারায় রাখা হয়েছে একটা সরকারি গেস্ট হাউসে। এর মধ্যে দু'বার হামলা হয়ে গেছে কাকাবাবুর ওপর। কাকাবাবুর বন্ধুরা সবাই বলছেন ওঁকে কলকাতায় ফিরে যেতে। এখানে থাকলে ওঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু কাকাবাবু সে-কথা কিছুতেই শুনবেন না।

সাধক মুফ্‌তি মহম্মদ সেদিন সেই চেয়ারে বসেই মৃত্যু বরণ করেছেন। শেষ সময়ে তাঁর মুখে কোনও যন্ত্রণার ছাপ ছিল না, বরং ফুটে উঠেছিল অপূর্ব সুন্দর হাসি। যেন তিনি খুব তৃপ্তির সঙ্গে এই জীবন শেষ করে চলে গেলেন।

সাধক মুফ্‌তি মহম্মদের অনেক শিষ্য এই দিল্লিতেই আছে। এই শিষ্যদের আবার দুটি দল। এক দলের নেতা আল মামুন, আর অন্য দলটির নেতা হানি আলকাদি নামে একজন। শিষ্যদের ধারণা, সাধক মুফ্‌তি মহম্মদের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি তাঁর শেষ উইল ছবি দিয়ে লিখে গেছেন। শুধু রাজা রায়চৌধুরীই সেই ছবির মানে জেনেছে। রাজা রায়চৌধুরী বাইরের লোক সে কেন এই গোপন কথা জানবে? আল মামুন কেন রাজা রায়চৌধুরীকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল? দ্বিতীয় দলের নেতা হানি আলকাদি অভিযোগ করেছে যে, আল মামুন নিজে নেতা হবার মতলবে সেই উইলের কথা অন্য কারুকে জানতে দিচ্ছে না।

কিন্তু মজা হচ্ছে এই, আল মামুনও রেগে গেছে কাকাবাবুর ওপর। বৃদ্ধ মুফ্‌তি মহম্মদের আঁকা ঐ ছবিগুলোর যে কী মানে, তা কাকাবাবু আল মামুনকেও বলেননি।

এমন কী, নরেন্দ্র ভার্মা বারবার জিজ্ঞেস করলেও কাকাবাবু মুচকি হেসে বলেছেন, "ধরে নাও, ঐ ছবিগুলোর কোনও মানে নেই। আমি অবশ্য একরকম মানে করেছি, সেটা ভুলও হতে পারে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তুমি কী মানে বুঝেছ, সেটাই শুনি!"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, সেটাও বলা যাবে না। মুফ্‌তি মহম্মদ নিষেধ করে গেছেন।"

"অ্যাঁ! উনি কখন নিষেধ করলেন তোমায়? আমরা তো কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলুম!"

"কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি সব বোঝা যায়? দেখলে না, আমি মুফ্‌তি মহম্মদকে লিখে কিছু প্রশ্ন জানালুম। উনিও ছবি এঁকে তার উত্তর দিলেন।"

"তুমি কী প্রশ্ন করেছিলে?"

"আমি একটা মানে উল্লেখ করে জানতে চেয়েছিলুম, আপনি কি এটাই বোঝাতে চাইছেন? উনি তার উত্তরে 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই লিখলেন না। উনি লিখলেন, তুমি আগে নিজে যাচাই করে দেখো, তার আগে কারুকে কিছু বোলো না।"

"যাচাই করে দেখো, মানে? অন্য কোনও পণ্ডিতের পরামর্শ নেবে? না, তাও তো পারবে না। অন্য কারুকে বলাই তো নিষেধ।"

"এটা যাচাই করার জন্য আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। ইজিপ্টে!"

সন্তু বলে উঠল, "পিরামিডের দেশে?"

কাকাবাবু চোখ দিয়ে হেসে বললেন, "মনে হচ্ছে তোর এবারে বিদেশ ঘোরা হয়ে যাবে, সন্তু!"

সন্তুর মনে পড়ে গেল রিনির কথা। সিদ্ধার্থদাদের সঙ্গে রিনি কায়রো বেড়াতে গেছে। তখন সে-কথা শুনে সন্তুর হিংসে হয়েছিল। এবারে সে-ই কায়রোতে পৌঁছে রিনিদের চমকে দেবে। কাকাবাবু এইজন্যই পাসপোর্ট আনতে বলেছিলেন?

নরেন্দ্র ভার্মা চিন্তিতভাবে বললেন, "রাজা, এখন ইজিপ্টে গেলে তুমি যে একেবারে বাঘের মুখে গিয়ে পড়বে! এখানেই তুমি দু'তিনবার বিপদে পড়েছিলে। দিল্লিতে যে এত ইজিপশিয়ান থাকে জানা ছিল না। ওখান থেকে আমাদের দেশে অনেকে পড়া-লিখা করতে আসে। বিজনেসের জন্যও আসে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, ঐ যে হানি আলকাদি নামের লোকটা, ওর অনেক গোঁড়া সাপোর্টার আছে। ওর পার্টি একবার একটা প্লেন হাইজ্যাক করেছিল। মুফ্‌তি মহম্মদের সিক্রেট তুমি যদি আগে ওদের কাছে ফাঁস না করো, তা হলে ওরা তোমাকে ছাড়বে না!"

কাকাবাবু বললেন, "বাঘের মুখে গিয়ে পড়তেই তো আমার ইচ্ছে করে। তুমি কি ভাবছ, পুলিশ-পাহারায় আমি এখানে বসে থাকব?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তোমাকে এখন ইজিপ্ট পাঠাতে রাজি হবে না। ও দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের বেশ ভাল সম্পর্ক আছে, তুমি গিয়ে যদি এখন একটা গণ্ডগোল পাকাও..."

কাকাবাবু তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "কিছু গণ্ডগোল পাকাব না। আমাকে গভর্নমেন্টেরও পাঠাবার দরকার নেই। আমি নিজেই যাব। তুমি বরং একটু সাহায্য করো, নরেন্দ্র। আজকের মধ্যেই আমাদের দু'জনের ভিসা জোগাড় করে দাও।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমি এখনও বলছি, তোমাদের ওখানে যাওয়া উচিত নয়।"

কাকাবাবু এবারে হেসে ফেলে বললেন, "তোমার হিংসে হচ্ছে বুঝি, নরেন্দ্র? আমরা বেশ ইজিপ্টে মজা করতে যাচ্ছি, তোমার যাওয়া হবে না। কিন্তু তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি না!"

"মজা? তুমি ইজিপ্টে মজা করতে যাচ্ছ? হানি আলকাদিকে আমি যতটা চিনেছি, সে একটা দুর্দান্ত টাইপের লোক!"

"আরে, দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকদের খুব সহজে বাগ মানানো যায়। যাদের বাইরে থেকে নরম-সরম মনে হয়, তাদেরই মনের আসল চেহারাটা বোঝা শক্ত। দেখো না ওখানে কত মজা হয়। ফিরে এসে তোমাকে সব গল্প শোনাব।"

কাকাবাবু উঠে গিয়ে তাঁর হাতব্যাগ খুলে রিভলভারটা বার করলেন। সেটা নরেন্দ্র ভার্মার কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এটা তোমার কাছে জমা রইল। বিদেশে যাচ্ছি, সঙ্গে আর্মস নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা চোখ কপালে তুলে বললেন, "হানি আলকাদির দলবল তোমার ওপর সাঙ্ঘাতিক রেগে আছে জেনেও তুমি কোনও হাতিয়ার ছাড়া অত দূরের দেশে যাবে?"

কাকাবাবু নিজের মাথায় আঙুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে ইয়ার্কির সুরে বললেন, "কাঁধের ওপর যে জিনিসটা রয়েছে, তার থেকে আর কোনও অস্ত্র কি বড় হতে পারে?"

নরেন্দ্র ভার্মা এমন একটা মুখের ভাব করলেন, যেন তিনি বলতে চান, আঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না!

সন্ধেবেলা নরেন্দ্র ভার্মা চলে যাবার পর কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "শোন, এখানে খুব সাবধানে থাকবি। একা বাইরে বেরুবি না। ওরা যদি তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথাও আটকে রাখে, তা হলে আমার ওপর চাপ দেওয়া সহজ হবে।"

সন্তু মুখে 'আচ্ছা' বললেও তলার ঠোঁটটা এমনভাবে কাঁপাল যাতে বেশ একটু গর্ব-গর্ব ভাব ফুটে উঠল।

সেটা লক্ষ করে কাকাবাবু বললেন, "বুঝেছি, তুই মনে মনে ভাবছিস তো, তোকে কে আটকে রাখবে! তুই ঠিক পালাতে পারবি, তাই না? তাতেই তো আমার বেশি চিন্তা। তোর মতন বয়েসি একটা ছেলেকে সহজে মারে না, কিন্তু তুই পালাবার চেষ্টা করলে নির্ঘাত গুলিটুলি ছুঁড়বে। এর আগে তুই যতবার পালাবার চেষ্টা করেছিস, ততবার বেশি বিপদে পড়েছিস, মনে নেই?"

সন্তু বলল, "প্রত্যেকবার নয়। সেবারে ত্রিপুরায় যে আমি পালিয়েছিলুম, আর আমায় কেউ ধরতে পারেনি!"

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে। মানলুম। কিন্তু এবারে দিল্লিতে আর

কায়রোতে গিয়ে সব সময় আমার সঙ্গে থাকবি। একা-একা গোয়েন্দাগিরি করার চেষ্টা করবি না।”

সন্তুর মনে পড়ল, সে একা তিলজলায় রহস্যসন্ধান করতে গিয়ে কী কেলেঙ্কারিই না হয়েছিল। ভাগ্যিস কাকাবাবু সে-কথা জানেন না।

অবশ্য সন্তু তখনই ঠিক করল, তা বলে সে দমে যাবে না। ভবিষ্যতে আবার সে ঐ রকম চেষ্টা করবে। সে একা-একা একটা রহস্যের সমাধান করে কাকাবাবুকে তাক্ লাগিয়ে দেবে।

পরদিন কাকাবাবু টেলিফোনেই অনেক কাজ সেরে ফেললেন। তার পরের দিনই তাঁদের ইজিপ্ট যাত্রা। নরেন্দ্র ভার্মা গোমড়া মুখে ওঁদের পৌঁছে দিতে এলেন এয়ারপোর্টে। ওরা ভেতরে ঢোকার আগের মুহূর্তে নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, “কী রাজা, এখনও কি মনে হচ্ছে তোমরা ওখানে মজা করতে যাচ্ছ?”

কাকাবাবু চোখ টিপে বললেন, “হ্যাঁ, দারুণ মজা হবে। ইশ, তুমি যেতে পারলে না!”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “আমি খোঁজ পেয়েছি হানি আলকাদিও আজ সকালে অন্য একটা প্লেনে ইজিপ্ট চলে গেছে। নিশ্চয়ই এমব্যাসি থেকে খবর পেয়েছে যে, তুমি ইজিপ্টের ভিসা নিয়েছ!”

কাকাবাবু সে খবর শুনে একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন, “তা তো যাবেই। নইলে মজা জমবে কেন? আল মামুন যায়নি? সে তো রাগ করে আমার সঙ্গে আর দেখাই করে না!”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “তার খবর জানি না।”

কাকাবাবু বললেন, “যাবে, সেও নিশ্চয়ই যাবে। আচ্ছা নরেন্দ্র, ফিরে এসে সব গল্প হবে।”

এই তো ক’দিন আগেই সন্তু প্লেনে চেপে কলকাতা থেকে এসেছে দিল্লিতে। সেই প্লেনটা ছিল এয়ারবাস আর এটা বোয়িং। একটা শিহরন জাগছে সন্তুর বুকের মধ্যে। বিদেশ, বিদেশ! পিরামিডের দেশ। ক্লিওপেট্রার দেশ।

প্লেন আকাশে ওড়বার পরেই সন্তু সিটবেল্ট খুলে উঠে দাঁড়াল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায় যাচ্ছিস?”

সন্তু মুখ খুলে কিছু বলার আগেই কাকাবাবু বললেন, “ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাথরুমে যাবার কথা বলবি তো? শুধু-শুধু মিথ্যে কথা বলতে হবে না। পুরো প্লেনটা ঘুরে দেখার ইচ্ছে হয়েছে দেখে আয়। চলন্ত প্লেনে তো আর তোকে কেউ কিডন্যাপ করবে না! এক যদি প্লেনটা কেউ হাইজ্যাক করে! তা যদি করেই, তা হলে আর কী করা যাবে!”

সন্তুর আসল উদ্দেশ্য হল যাত্রীদের মুখগুলো ভাল করে দেখা। চেনা কেউ আছে কি না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আল মামুনও এই প্লেনে রয়েছে। প্রথম থেকেই ঐ

লোকটিকে সন্তু ঠিক পছন্দ করতে পারেনি। লোকটির সব সময় কী রকম যেন গোপন-গোপন ভাব। মনের কথা খুলে বলে না। আল মামুন প্রথমেই কাকাবাবুকে এক লক্ষ টাকার লোভ দেখিয়েছিল।

মুফ্‌তি মহম্মদ মরে যাবার পর আল মামুন খুব একটা দুঃখ পেয়েছেন এমন মনে হয়নি। তিনি কাকাবাবুকে বলেছিলেন যে, কাকাবাবু যদি সব ছবিগুলোর ভাষা শুধু আল মামুনকেই জানিয়ে দেন, তা হলে তিনি পাঁচ লক্ষ টাকা দেবেন।

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "তা কী করে হবে? আপনার গুরুই যে বলতে বারণ করেছেন!"

না, প্লেনের যাত্রীদের মধ্যে একজনও চেনা মানুষ দেখতে পেল না সন্তু। কয়েকজন ভারতীয় যাত্রী রয়েছে, কিন্তু তারা কেউ বাংলায় কথা বলছে না।

তখনও সন্তু জানে না যে, তার জন্য একটা দারুণ বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

খাবার দিচ্ছে দেখে সন্তু এল নিজের জায়গায়। টেবিলটা খুলে পেতে নিল।

খেতে খেতে কাকাবাবু বললেন, "তুই হিয়েরোগ্লিফিক্‌সের মানে বলে আমায় চমকে দিয়েছিলি। পিরামিডগুলো কেন তৈরি হয়েছিল তাও তুই জানিস নিশ্চয়ই?"

সন্তু বলল, "রাজা-রানিদের সমাধি দেবার জন্য। ভেতরে অনেক জিনিসপত্তর রাখা থাকত, রাজা-রানিরা ভাবতেন যে, তাঁরা আবার বেঁচে উঠবেন!

"সবচেয়ে পুরনো পিরামিড কতদিন আগে তৈরি হয়েছে বল তো?"

"সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে!"

"এটা আন্দাজে বললি, তাই না?"

ধরা পড়ে গিয়ে সন্তু লাজুকভাবে হাসল।

কাকাবাবু বললেন, "খুব পুরনো পিরামিডগুলো খ্রিস্টপূর্ব ২৬৮৬ থেকে ২১৬০ বছরের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। তা হলে বলা যেতে পারে মোটামুটি সাড়ে চার হাজার বছর আগে। যাই হোক, পিরামিড তো অনেকগুলোই আছে। এর মধ্যে গিজার পিরামিড খুব বিখ্যাত। আর একটা আছে খুফু। এটা বিরাট লম্বা। এখন তো পৃথিবীতে মস্ত-মস্ত বাড়ি তৈরি হয়েছে। এক সময় নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং ছিল সবচেয়ে বড় বাড়ি, তারপর..."

"এখন শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার সবচেয়ে বড়!"

"হুঁ, তাও জানিস দেখছি। কিন্তু ঐ খুফুর পিরামিড এখনও ঐ সব বড়-বড় বাড়ির সঙ্গে উচ্চতায় পাল্লা দিতে পারে। এবারে তোকে একটা ভূতের গল্প বলি শোন্! পিরামিডগুলোর আশেপাশে আরও অনেক গোপন সমাধিস্থান আছে মাটির নীচে। বাইরের থেকে সেগুলো বোঝাই যায় না। সাহেবরা একটা-একটা করে সেগুলো আবিষ্কার করেছে। সম্রাট খুফুর মায়ের নাম ছিল হেটেফেরিস। তাঁর সমাধিস্থানের কথা অনেকে জানতই না। একজন সাহেব সেটি আবিষ্কার করেন। সেখানে কোনও পিরামিড নেই, মাটির নীচে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ছিল সেই সমাধি।

মমিগুলো যে কফিনের মধ্যে রাখে, তাকে বলে সারকোফেগাস। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, প্রথম যিনি সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে নামলেন, তিনি সেখানে অনেক কিছু দেখতে পেলেও সারকোফেগাসের মধ্যে রানি হেটেফেরিসের মমি দেখতে পেলেন না।"

"কেউ মমিটা চুরি করে নিয়ে গেছে!"

"হ্যাঁ, পিরামিড থেকে অনেক মমি চুরি গেছে বটে, কিন্তু রানি হেটেফেরিসের সমাধিস্থানে তো কেউ আগে ঢোকেনি। তাছাড়া, রাজা-রানিদের সমাধিস্থানে অনেক দামি দামি জিনিস থকত। যেমন সোনার খাট, সোনার জুতো, মণিমুক্তো-বসানো পানপাত্র, আরও অনেক কিছু। প্রথম যিনি সেই সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেন, সেই চার্লস ব্রকওয়ে অনেক মূল্যবান জিনিস দেখতে পেয়েছিলেন, শুধু মমিটাই ছিল না। চোরেরা আর-কিছু নিল না, শুধু মমিটাই নিল? চোরেরা তো মমি নেয় বিক্রি করবার জন্যই!"

"তারপর?"

"এর এক বছর তিন মাস বাদে একদল পুরাতত্ত্ববিদ আবার ঐ সুড়ঙ্গে নামেন। তাঁরা কিন্তু সারকোফেগাসের মধ্যে রানি হেটেফেরিসের মমি দেখতে পান। তাঁরা সেই মমির ছবিও তুলেছিলেন। মিশর সরকরের অনুমতি ছাড়া মমি সারানো যায় না। তাই তাঁরা সেদিন আর কিছু করেননি। ওপরে পাহারা বসিয়ে রেখেছিলেন। পরদিন আবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল সারকোফেগাসের মধ্যে মমি নেই! আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাই নিয়ে সে-সময় অনেক হৈচৈ হয়েছিল, পৃথিবীর বহু কাগজে খবরটা ছাপা হয়েছিল, এই নিয়ে বইও লেখা হয়েছে। চার্লস ব্রকওয়ে অবশ্য দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলটির বক্তব্য একটুও বিশ্বাস করেননি।"

আরও কিছু শোনবার জন্য সন্তু কাকাবাবুর মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে আছে দেখে কাকাবাবু বললেন, "তোকে এমনি একটা রহস্যকাহিনী শোনালুম। আমরা যে কাজে যাচ্ছি তার সঙ্গে রানি হেটেফেরিসের সমাধির খুব একটা সম্পর্ক নেই।"

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। এঁটো প্লেট সরিয়ে নিয়ে গেল এয়ার-হস্টেসরা। তার একটু পরে একজন এয়ার-হস্টেস সন্তুর কাছে এসে ইংরিজিতে বলল, "তোমার নাম তো সন্তু, তাই না? প্লিজ কাম উইথ মি! তোমাকে আর-একবার সিকিউরিটি চেক করা হবে।"

সন্তু দারুণ অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। এয়ার-হস্টেসটি কাকাবাবুকে বলল, "আই অ্যাম সরি স্যার, এই ছেলেটি সন্দেহজনকভাবে সারা প্লেন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেইজন্য ক্যাপ্টেন বললেন, ওকে একবার সার্চ করে দেখতে হবে! আমি ওকে একটু নিয়ে যাচ্ছি!"

কাকাবাবু বললেন, "গো অ্যাহেড!"

সন্তু একই সঙ্গে আশ্চর্য হল, রেগে গেল, আবার বেশ মজাও পেল। এরা তাকে হাইজ্যাকার ভাবছে নাকি? সঙ্গে একটা খেলনা পিস্তল থাকলেও এদের বেশ

ভয় দেখানো যেত।

এয়ার-হস্টেসটি সন্তুকে নিয়ে এল ককপিটে। সেখানকার দরজা খুলে ভেতরে ঢোকা মাত্র একজন বলে উঠল, "হ্যান্ডস আপ!"

তারপর হেসে উঠল হো হো করে!

সন্তুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "বিমানদা!"

সন্তুদের পাড়ার যে বিমান পাইলট, সে-ই এই প্লেনের ক্যাপটেন। এরকম যোগাযোগ যে ঘটতে পারে, তা সন্তুর একবারও মনে হয়নি।

এয়ার-হস্টেস আর কো-পাইলটরা হাসছে সন্তুর ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা দেখে। এয়ার-হস্টেসটি বলল, "আমি যখন গিয়ে বললুম যে, ওকে সার্চ করা হবে, তখন এই ইয়াং জেন্টলম্যানটির মুখ একেবারে ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। পকেটে সত্যি বোমা-পিস্তল কিছু আছে নাকি?"

বিমান অন্য সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল সন্তুর। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবুও দেখলুম রয়েছেন। তোরা কোথায় যাচ্ছিস?"

সন্তু বলল, "ইজিপ্টে।"

বিমান বলল, "ইজিপ্টে? সেখানে তোরা কোন্ ব্যাপারে যাচ্ছিস? নিশ্চয়ই বেড়াতে নয়?"

সন্তু এবার একটু ভারিক্কি ভাব করে বলল, "সেটা এখন বলা যাবে না!"

বিমান অন্যদের বলল, "জানো, এই যাঁকে কাকাবাবু বলছি, তিনি একজন ফ্যানটাসটিক পার্সন। পৃথিবীতে যে-সব মিস্ট্রি অন্য কেউ সল্‌ভ করতে পারে না, সেগুলো তিনি সল্‌ভ করার চেষ্টা করেন। যেমন ওঁর জ্ঞান, তেমনি সাহস!"

কো-পাইলট মিঃ কোহলি বললেন, "তাহলে আমরা সবাই তাঁকে একবার দেখতে চাই।"

বিমান বলল, "আর একটা মজা করা যাক। সন্তুকে আমরা এখানে আটকে রাখি, তা হলে কাকাবাবু নিশ্চয়ই এক সময়ে এখানে ছুটে আসবেন।"

ককপিটে বসে অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। প্লেনটা মেঘের রাজ্য দিয়ে যাচ্ছে বটে তবু মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে নীচের পৃথিবী। বিমান সন্তুকে বোঝাতে লাগল আকাশের মানচিত্র।

এক ঘণ্টা কেটে গেল, তবু কাকাবাবু সন্তুর কোনও খোঁজ করলেন না। বিমান বলল, "চল রে, সন্তু আমিই কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

দূর থেকে দেখা গেল কাকাবাবু বুকের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ওরা কাছে যাবার পর কাকাবাবুকে ডাকতে হল না, তিনি মুখ তুলে, একটুও অবাক না হয়ে, স্বাভাবিক গলায় বললেন, "কী খবর, বিমান?"

বিমান জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি জানতেন আমি এই প্লেনে থাকব?"

কাকাবাবু বললেন, "না, তা জানতুম না! তবে জানাটা শক্ত কিছু নয়। সন্তুকে

নিয়ে যাবার পরই মনে পড়ল, প্লেন টেক অফ করার পর ঘোষণা করা হয়েছিল, ক্যাপটেন ব্যানার্জি এবং তাঁর ক্রু-রা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে। তখন দুই আর দুইয়ে চার করে নিলুম!"

বিমান একটু হতাশ হয়ে বলল, "কাকাবাবু, আপনি কখনও চমকে যান না, বা অবাক হন না?"

কাকাবাবু বললেন, "কেন হব না? পৃথিবীতে অবাক হবার মতন ঘটনাই তো বেশি। তবে এত সামান্য ব্যাপারে ব্যস্ত হই না।"

"কাকাবাবু, মিশরে কী ব্যাপারে যাচ্ছেন, জানতে পারি?"

"অতি সামান্য ব্যাপার!"

"তার মানে এখন বলবেন না! ইশ্, আমাকে রিলিজ করছে আথেন্সে। যদি কায়রোতে নামতে পারতুম! দেখি যদি ম্যানেজ করে চলে আসতে পারি। কায়রোতে আপনারা কোথায় উঠবেন?"

"উঠব তো ওয়েসিস হোটেলে। কিন্তু কায়রোতে আমরা দু' একদিনের বেশি থাকব না। মেমফিসে চলে যাব! সেখানে কোথায় উঠব তার ঠিক নেই।"

সন্তু বলল, "বিমানদা, তুমি সিদ্ধার্থদাকে চেনো তো? স্নিগ্ধাদির বর? ওরা এখন কায়রোতে আছেন। তুমি ইন্ডিয়ান এমব্যাসিতে খোঁজ কোরো! সিদ্ধার্থদা ফার্স্ট সেক্রেটারি..."

কাকাবাবু একটু ভর্ৎসনার চোখে তাকালেন সন্তুর দিকে।

◀ ৬ ▶

এয়ারপোর্টে যে সিদ্ধার্থ, স্নিগ্ধা, রিনি সবাই উপস্থিত থাকবে এটা অবশ্য সন্তুও জানত না। কাকাবাবু তো আশাই করেননি। এটা নরেন ভার্মার কীর্তি, তিনি কায়রোর ইন্ডিয়ন এমব্যাসিতে টেলেক্স পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেটা দেখে সিদ্ধার্থ নিজেই এসেছে।

কায়রোতে প্লেনটা এক ঘণ্টা থামে। বিমানও নেমে এসে একবার এদের সকলের সঙ্গে দেখা করে চলে গেল।

রিনি সন্তুকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, সন্তু, কলকাতায় যখন দেখা হল, তখন তো একবারও বললি না যে, তোরা এখানে আসবি?"

সন্তু গম্ভীরভাবে বলল, "আমরা কখন যে কোথায় যাব, তার তো কোনও ঠিক থাকে না। আজ কায়রোতে এসেছি, পরশুই হয়তো আবার মস্কো চলে যাব!"

রিনি ঠোঁট উল্টে বলল, "ইশ্, আর চাল মারিস না! আমরা-আমরা করছিস কেন রে? তুই তো কাকাবাবুর বাহন! উনি ভাল করে হাঁটতে পারেন না, তাই তোকে সঙ্গে আনেন।"

কলকাতায় থাকতে রিনি কায়রো বেড়াতে আসছে শুনে সন্তুর ঈর্ষা হয়েছিল। এখন তার মনে হল, এইসব অবোধ মেয়ের সঙ্গে কথা বলার কোনও মানেই হয় না! সে মুখটা ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

সন্তুকে আরও রাগাবার জন্য রিনি বলল, "তুই সেই গল্পটা জানিস না? চাষের খেতে একটা গোরুর শিং-এ একটা মশা বসেছিল। একজন লোক সেই মশাটাকে জিজ্ঞেস করল, ওহে মশা, তুমি এখানে কী করছ? মশা বলল, আমরা হাল চাষ করছি! তুই হচ্ছিস সেই মশা! হি-হি-হি-হি!"

বেশ রাগ হয়ে গেলেও সন্তুর মনে হল, রিনি এই ধরনের কথা বলছে কেন? ও কি তিলজলার সেই কেলেঙ্কারির ব্যাপারটা জেনে গেছে?

সন্তু রিনির কাছ থেকে সরে গিয়ে কাকাবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

সিদ্ধার্থদা কাকাবাবুর সুটকেসটা তুলে নিয়ে বললেন, "চলুন কাকাবাবু, বাড়িতে গিয়ে সব গল্প শুনব। আমার বাড়িটা খুব সুন্দর জায়গায়, আপনার পছন্দ হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাড়ি? না, সেখানে তো আমরা যাচ্ছি না!"

সিদ্ধার্থদা নিরাশ হয়ে বললেন, "সে কী? আমার বাড়িতে যাবেন না? কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "কিছু মনে কোরো না। আমি হোটেল বুক করেই এসেছি। আমি যে ব্যাপারে এসেছি, তাতে তোমার জড়িয়ে না পড়াই ভাল। তুমি তো সরকারি কাজ করো!"

তারপর তিনি সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "সন্তু, তুই গিয়ে ওদের সঙ্গে থাকতে পারিস। বিদেশে এসে কোনও চেনা লোকের কাছে তোর থাকতে ভাল লাগবে।"

সন্তু মুখের এমন ভাব করল যেন সে প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষত রিনি ওরকম কথা বলার পর সে আর রিনির সঙ্গে একটা মিনিটও কাটাতে চায় না।

স্নিগ্ধাদি অনুযোগের সুরে বলল, "কাকাবাবু, আপনি যাবেন না? আমি আপনাদের জন্য চিংড়ির মালাইকারি রান্না করে রেখেছি। কত কষ্টে জোগাড় করলুম চিংড়ি..."

কাকাবাবু এবারে হালকা গলায় বললেন, "তুমি কী করে জানলে ঐ জিনিসটা আমার সবচেয়ে ফেভারিট? ঠিক আছে, সন্ধেবেলা গিয়ে খেয়ে আসব। কিন্তু উঠতে হবে হোটেলেই।"

ওয়েসিস হোটেলটি বিশেষ বড় নয়। শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরের দিকে। গরমকাল বলে এই সময়ে টুরিস্টদের ভিড় নেই, হোটেল প্রায় ফাঁকা। সিদ্ধার্থ, স্নিগ্ধা আর রিনি সন্তুদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে একটু পরে বিদায় নিয়ে চলে গেল। কথা হল যে, সন্ধেবেলা সিদ্ধার্থ আবার এসে ওদের নিয়ে যাবে বাড়িতে।

কাকাবাবু ঘর থেকেই দু'তিনটে টেলিফোন করলেন। তারপর তিনি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে সন্তুকে বললেন, "তুই চান-টান করে নে। আজ দুপুরে আমরা ঘরেই খেয়ে নেব। দুপুরে যা চড়া রোদ ওঠে, বাইরে বেরুনোই যায় না।"

গরমে সন্তুর গা চ্যাটচ্যাট করছিল, সে ঢুকে গেল বাথরুমে। সেখানকার জানলা দিয়ে দেখল, রাস্তা দিয়ে ট্রলি বাস চলছে। এটাই যা নতুনত্ব, নইলে কায়রো শহরটাকে বিদেশ বিদেশ মনে হয় না, ভারতবর্ষের যে-কোনও বড় শহরেরই মতন। ইজিপ্ট দেশটা যদিও আফ্রিকার মধ্যে, কিন্তু এখানে কোনও মানুষ নেই। বর্তমান ইজিপ্টের অধিবাসীরা জাতিতে আরব।

স্নান সেরে বেরিয়ে এসে সন্তু দেখল, কাকাবাবু তাঁর নোটবুকে কী সব লিখছেন। সন্তু চুল আঁচড়াতে শুরু করতেই দরজায় ঠক ঠক শব্দ হল। কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকালেন।

সন্তু দরজা খুলতেই একজন মাঝারি চেহারার লোক জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ রাজ্জা রায়চৌধারি হিয়ার?"

কাকাবাবু বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "মান্টো? কাম ইন! কাম ইন!"

লম্বা লোকটি প্রায় ছুটে এসে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন। একেবারে দৃঢ় আলিঙ্গন। তারপর কোলাকুলির ভঙ্গি করে তিনি সরে দাঁড়ালেন।

এই গরমেও ভদ্রলোক একটা আলখাল্লার মতন পোশাক পরে আছেন। মাথায় ফেজ টুপি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। দাড়ি-গোঁপ কামানো।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন আলি সাদাত মান্টো, কায়রো মিউজিয়ামের কিউরেটর, আমার পুরনো বন্ধু।"

মান্টো ইংরিজিতে বললেন, "রায়চৌধারি, তুমি যে এই সময় কায়রোতে এসেছ, তা শুনে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি প্রথমে। তুমি কী কাণ্ড করেছ? জানো, এখানকার সব কাগজে তোমার কথা বেরিয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? তা হলে বেশ বিখ্যাত হয়ে গেছি বলো! কী লিখেছে কাগজে আমার সম্পর্কে?"

মান্টো একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললেন, "খুব গুরুতর অভিযোগ। এখানকার এক বিখ্যাত নেতা মুফ্‌তি মহম্মদ চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন দিল্লিতে। সেখানে তিনি কয়েকদিন আগে হঠাৎ মারা যান। শেষ মুহূর্তে তিনি যে উইল করে যান, তুমি নাকি সেটা চুরি করেছ।"

কাকাবাবু অট্টহাসি করে উঠে বললেন, "ওরে বাবা রে, একেবারে চোর বানিয়ে দিয়েছে?"

মান্টোর মুখ গম্ভীর। তিনি বললেন, "হাসির ব্যাপার নয়, রায়চৌধারি! এখানে হানি আলকাদি নামে একজন জঙ্গি নেতা আছে। সে দাবি জানিয়েছে যে, ভারত সরকারের ওপর চাপ দিয়ে তোমাকে এখানে ধরে আনাতে হবে। আর তুমি নিজেই এখানে চলে এসেছ? তোমার কতটা বিপদ তা বুঝতে পারছ না?"

কাকাবাবু তবু হাল্‌কা চালে বললেন, "উইল যদি আমি চুরি করেই থাকি, তা

হলে ভারতবর্ষে বসে থেকে লাভ কী? মুফ্‌তি মহম্মদের বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু তো এদেশেই। তাই না?"

"রায়চৌধারি, তুমি গুরুত্ব বুঝতে পারছ না। হানি আলকাদি অতি সাঙ্ঘাতিক লোক। তার দলের ছেলেরা খুব গোঁড়া, নেতার হুকুমে তারা যা খুশি করতে পারে।"

"মান্টো, তুমি বিশ্বাস করো যে, আমি কারুর উইল চুরি করতে পারি?"

"না, না, না, আমি সে-কথা ভাবব কেন? তোমাকে তো আমি চিনি! তা ছাড়া মুফ্‌তি মহম্মদের উইল নিয়ে তুমি কী করবে? আসলে কী হয়েছে বলো তো?"

"তার আগে তুমি আমার দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দাও! মুফ্‌তি মহম্মদ লেখাপড়া জানতেন না, একথা ঠিক তো?"

"হ্যাঁ, তা ঠিক। উনি কোনওদিন স্কুল-কলেজে যাননি, পড়তে বা লিখতে জানতেন না। তবে জ্ঞানী লোক ছিলেন।"

"উইল লেখার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। অনেকদিন ধরে ওঁর গলার আওয়াজও একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাহলে উইল তৈরি হল কী করে?"

"তাও তো বটে?"

"এ সম্পর্কে তোমাদের কাগজে কিছু লেখেনি?"

"না, কিছু লেখেনি। তবে হানি আলকাদি অভিযোগ করেছে যে, আল মামুন নামে একজন ব্যবসায়ী তোমার সঙ্গো মুফ্‌তি মহম্মদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর তুমি ঐ কাণ্ড করেছ!"

"মান্টো, তোমাকে আমি আসল ঘটনাটা পরে বলব। তার আগে তুমি মফ্‌তি মহম্মদ সম্পর্কে কী জানো আমাদের বলো তো। তুমি কি ওঁকে চিনতে?"

"হ্যাঁ, ইজিপ্টে তাঁকে কে না চেনে। ওঁর বয়েস হয়েছিল একশো বছর।"

"আমি শুনেছি সাতানব্বই।"

"তা হতে পারে। ওঁর জীবনটা বড় বিচিত্র। খুব গরিবঘরের সন্তান ছিলেন। ওঁর যখন সাত বছর বয়েস, তখন ওঁর বাবা আর মা দু'জনেই মারা যান। সাত বছর বয়েস থেকে উনি রাস্তায় ভিক্ষে করতেন। একটু বড় হয়ে ওঠার পর শুরু করেন কুলিগিরি। তারপর তিনি হলেন বিদেশি ভ্রমণকারীদের গাইড। ইংরেজ আর ফরাসিরা যখন বিভিন্ন পিরামিডে ঢুকে ভেতরের জিনিসপত্র আবিষ্কার করতে শুরু করেন, সেই সময়ে তিনি অনেক অভিযানে ওদের সঙ্গো গিয়েছিলেন। লেখাপড়া না শিখলেও উনি ভাঙা ভাঙা ইংরিজি আর ফরাসি বলতে পারতেন। আর ওঁর গানের গলাও নাকি ছিল খুব সুন্দর। এই সময় ওঁর অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। কিন্তু উনি ওখানেই থেমে থাকলেন না। গাইডের কাজ ছেড়ে দিয়ে উনি যোগ দিলেন একটা বিপ্লবী দলে। তখন ইজিপ্টের রাজা ছিলেন ফারুক। তুমি তো জানো, রাজা ফারুককে সরিয়ে দেবার জন্য এখানকার বিপ্লবীরা কত মরিয়া হয়ে উঠেছিল। মুফ্‌তি মহম্মদ হয়ে উঠলেন একটা প্রধান বিপ্লবী দলের নেতা।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "সন্তু, তুই রাজা ফারুকের নাম শুনেছিস? রাজত্ব হারাবার পর এই ফারুক বলেছিলেন, এরপর পৃথিবীতে আর মোটে পাঁচজন রাজা থাকবে। তাসের চারটে রাজা আর ইংল্যাণ্ডের রাজা! হ্যাঁ, মান্টো তারপর বলো!"

মান্টো বললেন, "রাজা ফারুককে যে রাজত্ব ছেড়ে পালাতে হয়, তার পেছনে মুফ্‌তি মহম্মদের দলের অনেকটা হাত ছিল। রাজা ফারুকের পর এলেন জেনারেল নেগুইব। অনেকে তখন দাবি তুলেছিল যে, মুফ্‌তি মহম্মদেরই উচিত এ দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়া। মুফ্‌তি মহম্মদ নিজে তা কিছুতেই হতে চাননি, তিনি বলতেন যে, তিনি এক সময় রাস্তায় ভিক্ষে করতেন, রাস্তাতেই তাঁর স্থান। এর পর জেনারেল নাসের যখন প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন মুফ্‌তি মহম্মদ ঘোষণা করলেন যে, নাসেরই সুযোগ্য ব্যক্তি, আর বিপ্লব আন্দোলন চালাবার দরকার নেই। রাতারাতি তিনি সব কিছু ছেড়ে ফকিরের পোশাক পরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। তারপর আর কোনওদিন তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি। মানুষকে সৎপথে চলার উপদেশ দিতেন, নিজেও খুব সাধারণভাবে দিন কাটাতেন। দেশের মানুষ তাঁকে একজন সর্বত্যাগী মহাপুরুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করত।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের দেশের শ্রীঅরবিন্দের মতন। উনিও আগে বিপ্লবী ছিলেন, পরে সাধক হয়ে যান। মুফ্‌তি মহম্মদ কি কোনও আশ্রম করেছিলেন বা ওঁর অনেক বিষয়সম্পত্তি ছিল?"

মান্টো বললেন, "না, না, সেসব কিছু না। ওঁর অনেক ভক্তশিষ্য ছিল বটে। কিন্তু উনি নিজেকে বলতেন ফকির। ওঁর নিজস্ব কোনও সম্পত্তিই ছিল না।"

"তা হলে একজন ফকিরের উইল নিয়ে এত মাথা-ফাটাফাটি কেন? ফকিরের আবার উইল কী? অথচ আল মামুন সেই উইলের জন্যই আমাকে পাঁচ লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল। হানি আলকাদি আমার মুণ্ডু চাইছে। এটা তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার!"

"তার কারণ আছে, রায়চৌধারি! মুফ্‌তি মহম্মদ এক সময় একটা বড় বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। হঠাৎ সেই দল ভেঙে দেন। একটা বিপ্লবী দল চালাতে গেলে প্রচুর টাকা আর অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার রাখতে হয়। মুফ্‌তি মহম্মদের দলেও সেরকম টাকা আর অস্ত্র ছিল। অনেকেরই প্রশ্ন, সেগুলো কোথায় গেল? তিনি নিজে কিছুই ভোগ করেননি। এখনও কয়েকটা বিপ্লবী দল এদেশে আছে, তুমি জানো নিশ্চয়ই। এই তো সেদিন এই রকম একটা দলের লোকেরা প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে খুন করেছে। আমি তোমাকে চুপিচুপি বলছি, আমার ধারণা, ঐ হানি আলকাদির দলের লোকেরাই এই খুনটা করেছে। তাহলেই বুঝতে পারছ, ওরা কত সাঙ্ঘাতিক!"

"তুমি চিন্তা কোরো না, মান্টো। হানি আলকাদি আমাকে এখন খুন করবে না, যদি তার একটুও বুদ্ধি থাকে!"

"তুমি এত নিশ্চিত হতে পারছ কী করে জানি না। আচ্ছা, এবার বলো তো,

মুফ্‌তি মহম্মদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী? তুমি তাঁর উইল চুরি করেছ, এরকম কথা উঠছে কেন?"

"তুমি বললে, মুফ্‌তি মহম্মদ লেখাপড়া জানতেন না। তুমি কি জানো, তিনি হিয়েরোগ্লিফিক্‌স ভাষা জানতেন?"

মান্টো যেন হতবাক হয়ে গেলেন কথাটা শুনে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কাকাবাবুর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "আমি নিজেই তো ঐ ছবির ভাষার পাঠোদ্ধার করতে পারি না। তবে, আমি তোমার কথা একেবারে অবিশ্বাস করতে পারছি না। মনে পড়ছে যেন, বছর চল্লিশেক আগে মুফ্‌তি মহম্মদ একটা পিরামিডের ভেতরের লিপির মানে এক সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন। তখন অবশ্য অনেকে ভেবেছিল, উনি আন্দাজে বলেছেন। উনি তা হলে ঐ ভাষার উইল রচনা করে গেছেন?"

"না। মুফ্‌তি মহম্মদ কোনও উইল করে যাননি। অন্তত আমি সে রকম কিছু জানি না। মৃত্যুর আগে উনি ওঁর শেষ একটা ইচ্ছে কাগজে ছবি এঁকে বুঝিয়ে যাচ্ছিলেন। সেটা আমি খানিকটা ধরতে পারি। ওঁর সেই শেষ ইচ্ছেটা এতই অদ্ভুত যে, আমি বেশ অবাক হয়েছিলুম। তাতে টাকা পয়সার কোনও ব্যাপারই নেই। আমি ছবি এঁকে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, আমি যা বুঝেছি তা সঠিক কি না। উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, তারপর ছবি এঁকে জানালেন যে, আমি আগে নিজে যাচাই না করে যেন কাবুকে না বলি!"

"যাচাই করা মানে? কী যাচাই করবে?"

"সেটা যাচাই না করে তো বলা যাবে না। যাক, সে-সব পরে জানতে পারবে। এখন অন্য কথা বলা যাক। তোমার বাড়ির খবর কী? বৌদি কেমন আছেন! তোমার ছেলে-মেয়ে ক'টি হল?"

দু'একটা সাধারণ কথার পর মান্টো আবার বললেন, "রাজজা রায়চৌধারি, আমি তোমার সম্পর্কে সত্যি চিন্তিত। হানি আলকাদি তোমার ওপর রেগে আছে, আর তুমি এরই মধ্যে কায়রো এসে পড়েছে! যদি টের পেয়ে যায়..."

কাকাবাবু বললেন, "আবার ওই কথা! ছাড়ো তো! শোনো, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলুম...রানি হেটেফেরিস-এর মমি কি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেছে?"

মান্টো চমকে উঠলেন। তারপর তাঁর চোখে শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "তুমি এটাও জানো! রানি হেটেফেরিসের মমি তার সারকোফেগাসের মধ্যে এক-একবার দেখা গেছে, আবার উধাও হয়ে গেছে। সবাই বলত সেটা অলৌকিক ব্যাপার। বছর তিরিশেক ধরে অবশ্য সেই মমি আর দেখতে পাওয়া যায়নি। হঠাৎ তুমি এই প্রশ্ন করলে?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "এমনিই। প্লেনে আসবার সময় সন্তুকে ঐ গল্পটা

বলছিলুম কি না। তাই ভাবলুম, ও নিশ্চয়ই শেষটা শুনতে চাইবে। তিরিশ বছর ধরে রানির মমি আর দেখতে পাওয়া যায়নি?"

মান্টো কিছু উত্তর দেবার আগেই দরজায় ঠকঠক শব্দ হল। একজন কেউ বলল, "রুম সার্ভিস। ইয়োর লাঞ্চ ইজ রেডি স্যার!"

সন্তু দরজা খুলতেই হোটেলের বেয়ারার বদলে তিনজন সশস্ত্র লোক তাকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে এল। একজন দাঁড়াল দরজায় পিঠ দিয়ে। অন্য দু'জন লম্বাটে ধরনের রিভলভার তুলে ধরল ওদের দিকে।

মিউজিয়ামের কিউরেটার মান্টোর মুখখানা ভয়ে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। দিনদুপুরে হোটেলের কামরার মধ্যে যে এরকম গাণ্ডামি চলতে পারে, তা তিনি যেন কল্পনাই করেননি কোনওদিন। এরা এসেছে যখন, নিশ্চয়ই খুন করে ফেলবে! এদের তিনজনেরই গায়ে খাকি জামা, একজনের গলায় একটা স্কার্ফ বাঁধা।

দরজায় ঠেস দেওয়া দলপতি ধরনের চেহারার লোকটি মান্টোকে বলল, "ইউ কিপ কোয়ায়েট। উই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ!"

কাকাবাবু একটুও বিচলিত না হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি হানি আলকাদির লোক? সে কোথায়?"

গলায় স্কার্ফ-বাঁধা লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "আমরা এখানে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে আসিনি। হুকুম করতে এসেছি। প্রফেসার, পায়ে জুতো পরে নাও, আমরা তোমাকে নিয়ে যাব!"

কাকাবাবু বললেন, "প্রফেসার? কে প্রফেসার? আমি তো প্রফেসার নই। তোমরা ভুল জায়গায় এসেছ!"

লোকটি পকেট থেকে একটা ফোটো বার করে দেখিয়ে বলল, "না। আমাদের ভুল হয়নি। নাউ, গেট গোয়িং!"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, পাকা কাজ! শোনো, আমাকে ওরকমভাবে হুকুম দেওয়া যায় না। আমার এখন এখান থেকে যাবার ইচ্ছে নেই। হানি আলকাদির সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই, তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো, আমরা একটা জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব!"

একজন লোক রুক্ষভাবে কাকাবাবুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "আরে ল্যাংড়া, চল্ শিগগির!"

কাকাবাবুর চোয়াল কঠিন হয়ে গেল। চোখে জ্বলে উঠল আগুন। তিনি মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন লোক তিনটিকে। তারপর তীব্র গলায় বললেন, "দিল্লিতে আমার ওপর তিনবার অ্যাটেম্‌ট হয়েছিল, এখানেও দিনের বেলা গুণ্ডামি করতে এসেছ। তোমরা ভেবেছ কী? আমাকে চেনো না তোমরা!"

দু'হাতের ক্রাচ দুটো তুলে তিনি বিদ্যুৎ-গতিতে মারলেন দু'জন লোকের হাতে। তাদের হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়ে গেল, দু'জনেই যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে

উঠল। মান্টো ভয়ের চোটে মাটিতে বসে পড়লেন। সন্তু একটা রিভলভার তুলে নেবার চেষ্টা করতেই দরজায় ঠেস-দেওয়া তৃতীয় লোকটি শান্ত গলায় বলল, "স্টপ দ্যাট ফানি বিজনেস। আই উইল শুট টু কিল!"

কাকাবাবু সেই লোকটির একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, "করো তো গুলি, দেখি তোমার কত সাহস! আমায় গুলি করলে তোমার নিজের মাথা বাঁচবে? হানি আলকাদি আমাকে জ্যান্ত অবস্থায় চায়। আমাকে মেরে ফেললে সে কিছুই আর জানতে পারবে না!"

তৃতীয় লোকটি বলল, "হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, তোমাকে জ্যান্ত অবস্থাতেই নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তুমি যদি যেতে অস্বীকার করো তা হলে তোমার পায়ে গুলি করে তোমার আর একটা পা'ও খোঁড়া করে দিতে কোনও অসুবিধে নেই। তুমি তাই চাও?"

মাটিতে বসে থাকা অবস্থায় মান্টো বললেন, "রায়চৌধারি, প্লিজ মাথা গরম কোরো না! ওরা যা বলে তাই-ই করো। ওদের কথা মেনে নাও!"

তৃতীয় লোকটি বলল, "প্রফেসার, তুমি ভালভাবে চলে এসো আমাদের সঙ্গে। তোমার কোনও ক্ষতি করা হবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা ভদ্রভাবে আমাকে আগে অনুরোধ করলেই পারতে। ঘরে ঢুকে গুণ্ডার মতন রিভলভার ওঁচালে কেন? তোমরা গুণ্ডা না বিপ্লবী? তোমাদের দেশে আমি অতিথি হয়ে এসেছি, হানি আলকাদির উচিত ছিল নিজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করা।"

তৃতীয় লোকটি অনুচ্চ গলায় হেসে উঠে বলল, "তুমি সত্যি একজন অদ্ভুত লোক, তা স্বীকার করছি। হানি আলকাদির নাম শুনলেই সবাই ভয় পায়, আর তুমি তাকে ধমকাচ্ছ!"

কাকাবাবু বললেন, "তাকে আমার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। আমি একজন ভারতীয় নাগরিক, আমার গায়ে হাত তুললে এ-দেশের সরকার হানি আলকাদিকে ছাড়বে না।"

"এখন কথা কাটাকাটি করার সময় নেই। তুমি এক্ষুনি চলো আমাদের সঙ্গে।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "কোনও ভয় নেই, সন্তু। আমি আজ রাত্তিরের মধ্যে যদি না ফিরি, তা হলে তোকে খবর পাঠাব। যদি কোনও খবর না পাস, তা হলে সিদ্ধার্থকে বলবি এখানকার হোম ডিপার্টমেন্টে খবর দিতে।"

মান্টোকে বললেন, "আমার জন্য কিছু চিন্তা কোরো না, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে!"

তৃতীয় লোকটি সন্তুদের বলল, "আমরা এখান থেকে চলে যাবার দশ মিনিটের মধ্যে ঘর থেকে বেরুবে না। পুলিশে খবর দিয়ে কোনও লাভ নেই। তোমার আংকেলের খবর আমরা যথাসময়ে জানিয়ে দেব!"

ওরা বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিল।

মান্টো উঠে এসে সন্তুকে ধরে বললেন, "বাপ রে বাপ! তিন তিনটে রিভলভার। আমি আগে কক্ষনো এরকম দেখিনি। যদি একটা থেকে গুলি ফশকে বেরিয়ে আসত! তোমার আংকল কী সাংঘাতিক লোক! আমার এখনও পা কাঁপছে!"

কাকাবাবু যে ক্রাচ দিয়ে দুটো রিভলভারধারীকে হঠাৎ অমন মারতে শুরু করবেন, তা সন্তু এক মুহূর্ত আগেও বুঝতে পারেনি। কাকাবাবুর অমন রুদ্র মূর্তি সে দেখেনি কখনও আগে। এখনও তার বুক ধড়াস ধড়াস করছে।

এরই মধ্যে সন্তু ভাবল, এখন কী করা যায়? কাকাবাবুকে নিয়ে ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামছে, টেলিফোন তুলে হোটেলের রিসেপশানিস্টকে সে-কথাটা জানিয়ে দিলে হয় না?

সন্তু সে-কথা মান্টোসাহেবকে বলতেই তিনি সন্তুর হাত চেপে ধরে বললেন, "খবর্দার, ওরকম কিছু করতে যেও না! ওরা যা বলে গেল, তা-ই শুনতে হবে। তুমি জানো না ওরা কত নিষ্ঠুর। ঘরে ঢুকেই কেন যে ওরা গুলি চালাতে শুরু করল না, তাতেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। সেটাই ওদের স্টাইল। ওরা কারুকে কোনও কথা বলার সুযোগ দেয় না!"

সন্তুর গলা শুকিয়ে গেছে। সে জলের বোতল নিয়ে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে নিল।

তারপর খানিকটা চাঙ্গা হয়ে বলল, "কাকাবাবু জানতেন, ওরা গুলি করবে না। বুঝলেন না, সব জিনিসটাই রয়েছে কাকাবাবুর মাথার মধ্যে। উনি নিজে থেকে না বললে কেউ ওঁর কাছ থেকে জোর করে কথা বার করতে পারবে না!"

মান্টো বিরক্তভাবে বললেন, "হুঁঃ! কী যে ঝঞ্ঝাট! এসো, বিছানায় বসে থাকি, দশ মিনিট কাটুক। দিনের বেলা হোটেলের ঘর থেকে একজনকে ধরে নিয়ে গেল? ছি, ছি, ছি, কী যে হয়ে গেল দেশটা! দশ মিনিট বাদে আমাদের এই ঘর থেকে কে বার করবে? যদি কেউ এসে দরজা খুলে না দেয়?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মিঃ মান্টো, আপনি হানি আলকাদিকে নিজের চোখে দেখেছেন কখনও?"

"না। দেখিনি, দেখতেও চাই না! তবে কাগজে ছবি দেখেছি অবশ্য!"

"আমার ভয় হচ্ছে। কাকাবাবুকে কেউ হুকুমের সুরে কথা বললে উনি কিছুতেই তা শুনতে চান না। সেইজন্য ওরা রাগের মাথায় যদি কাকাবাবুকে কিছু করে বসে!"

"তোমার কাকাবাবুর উচিত ছিল এরকম কাজের ভার না নেওয়া! মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছে কী ছিল, তা যাচাই করে দেখা ওঁর কী দরকার! আচ্ছা, ইয়াংম্যান, তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানো মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছে কী ছিল? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।"

সন্তু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "কাকাবাবু আমাকে কিছু বলেননি। তবে

আমি অনেকটা আন্দাজ করেছি। কিন্তু মাফ করবেন, আমার আন্দাজটাও আমি আপনাকে এখন জানাতে পারব না!”

◀ ৭ ▶

কাকাবাবু ইজিপ্টে আগে এসেছিলেন, কায়রো শহর এবং কাছাকাছি অনেকগুলো জায়গা তাঁর বেশ চেনা। এরা তাঁর চোখ বাঁধেনি। হোটেলের বাইরে এসে একটা জিপগাড়িতে তুলেছে। পাশে কেউ রিভলভার উঁচিয়ে নেই। এরা বুঝেছে যে, এই মানুষটিকে অযথা ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ হবে না।

কায়রো শহর থেকে পাঁচ-ছ'মাইল দূরেই তিনটি পিরামিড পাশাপাশি। কাছেই জগৎ-বিখ্যাত স্ফিংকস। এখন টুরিস্ট সিজন না হলেও স্ফিংকসের সামনে মোটামুটি ভিড় আছে। এই দুপুর-রোদের মধ্যেও। সেখানে রয়েছে অনেক উটওয়ালা আর ক্যামেরাম্যান। এরা টুরিস্টদের একেবারে কান ঝালাপালা করে দেয়।

কাকাবাবু লক্ষ করলেন, গাড়িটা এই জায়গার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল মেমফিসের দিকে। আগেকার তুলনায় এই রাস্তায় অনেক বেশি বাড়িঘর তৈরি হয়ে গেছে। মধ্যে-মধ্যে দু'একটা উঁচু-উঁচু সরকারি বাড়ি। আগে এ-রাস্তায় অনেক খেজুরগাছ ছিল, এখন আর চোখে পড়ে না।

মেমফিস বেশি দূর নয়। কায়রো থেকে দশ-বারো মাইল। সড়ক-পথে খানিকটা যাবার পরেই শুরু হয়ে যায় মরুভূমি। গাড়িটা কিন্তু মেমফিসের দিকে গেল না, ধুধু মরুভূমির মধ্যে ছুটতে শুরু করল।

কাকাবাবু ভাবলেন, আগেকার দিনে আরবসর্দাররা মরুভূমির মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে থাকত দলবল নিয়ে। এখন আরবরা অনেক বড়লোক হয়ে গেছে, তারা এয়ার--কন্ডিশান্ড বাড়িতে থাকে। হানি আলকাদি কি এখনও পুরনো কায়দা বজায় রেখেছে? নইলে এই মরুভূমির মধ্যে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়! গাড়ির কোনও লোক একটিও কথা বলছে না। কাকাবাবুও তাদের কিছু জিজ্ঞেস করলেন না!

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর দূরে দেখা গেল ভাঙা দেওয়াল-ঘেরা একটা প্রাচীন প্রাসাদ। তার অনেক ঘরই ভেঙে পড়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় সেখানে মানুষজন থাকে না। কিন্তু কাছে এলে দেখা যায়, একটা উঁচু পাঁচিলের আড়ালে দুটো উট বাঁধা আছে আর তিনখানা স্টেশান ওয়াগন।

জিপটা থামবার পর অন্যরা কিছু বলবার আগেই কাকাবাবু নিজেই নেমে পড়লেন। ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন চারদিকটা।

একজন কাকাবাবুকে বলল, “ফলো মি!”

খানিকটা ধ্বংসস্তূপ পার হবার পর ওরা এসে পৌঁছল একটা বেশ পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন পাথরের ঘরে। সেখানে খাট-বিছানা পাতা আছে। রয়েছে একটা ছোট টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের আলমারি, সেটা বন্ধ।

সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল, সে কাকাবাবুকে বলল, "তুমি এইখানে বিশ্রাম নাও! তোমার কি খিদে পেয়েছে? তা হলে খাবার পাঠিয়ে দিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি বিশ্রাম নিতে চাই না, আমার জন্য খাবার পাঠাবার দরকার নেই। আমি এক্ষুনি হানি আলকাদির সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

লোকটি বলল, "অল ইন গুড টাইম। ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এখন বিশ্রাম নাও কিছুক্ষণ। আশা করি তুমি এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে না। এই মরুভূমির বালির ওপর দিয়ে তোমার ওই ক্রাচ নিয়ে তুমি এক মাইলও যেতে পারবে না!"

লোকটা দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কাকাবাবু চোখ বুজে, কপালটা কুঁচকে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকটা একটা নিষ্ঠুর সত্যি কথা বলে গেছে। একটা পা অকেজো বলে এখন আর চলাফেরার স্বাধীনতা নেই তাঁর। যে কাজের জন্য তিনি এসেছেন, তার জন্য দু'খানা জোরালো পা থাকা খুবই দরকারি। অনেকদিন বাদে তিনি ভাঙা পা'খানার জন্য দুঃখ বোধ করলেন।

একটু বাদে কাকাবাবু শুয়ে পড়লেন খাটে। দুপুরে খাওয়া হয়নি, তাঁর বেশ খিদে পাচ্ছে, কিন্তু এদের এখানে তিনি খেতে চান না। ভেতরে ভেতরে তাঁর এখনও খুব রাগ জমে রয়েছে। একবার রাগ হলে সহজে কাটতে চায় না।

শুয়ে পড়বার পর তিনি দেখলেন বালিশের পাশে দু'খানি বই। কৌতূহলের বশে তিনি প্রথমে একটি বই তুলে নিলেন। সেটি কমপ্লিট ওয়ার্কস অব শেক্সপিয়ার। কাকাবাবু দারুণ অবাক হলেন। এই মরুভূমির মধ্যে, একটা প্রায় ভগ্নস্তূপের মধ্যে শেক্সপিয়ারের কবিতা! অন্য বইটি দেখে আরও অবাক হলেন। সেটাও ইংরেজি কবিতা, 'সং অফারিংগ্স' বাই স্যার আর. এন. টেগোর!

কাকাবাবু বিহ্বলভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বইটা হাতে নিয়ে পাতা ওল্টালেন। বইখানি এমনি-এমনি এখানে পড়ে নেই। কেউ একজন মন দিয়ে পড়েছে। অনেক কবিতার লাইনের তলায় লাল কালির দাগ দেওয়া!

প্রায় আধ ঘণ্টা বই দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করবার পর একটা শব্দ শুনে কাকাবাবু মুখ তুলে তাকালেন।

দেওয়াল-আলমারিটার পাল্লা খুলে গেছে। সেটা আসলে একটা দরজা। তার পাশ দিয়ে নেমে গেছে মাটির নিচে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে একজন লোক দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে।

লোকটিকে দেখে প্রথমেই কাকাবাবুর মনে হল সিনেমার নায়ক। অপূর্ব সুন্দর তার চেহারা। অন্তত ছ'ফুট লম্বা, চমৎকার স্বাস্থ্য, গৌর বর্ণ, টিকোলো নাক, মাথার চুল আধ কোঁকড়ানো। মুখে সরু দাড়ি। সে পরে আছে একটা ব্লু জিন্স আর ফিকে হলদে টি শার্ট। সেই শার্টে একটা সিংহের মুখ আঁকা। তার কোমরে

একটা বুলেটের বেল্ট, আর দু'পাশে দুটো রিভলভার। সে-দুটোর বাঁট আবার সাদা। লোকটির বয়েস তিরিশ-বত্রিশের বেশি নয়।

লোকটিকে দেখে কাকাবাবুর হাসি পেয়ে গেল।

লোকটি অর্ধেক ঠোঁট ফাঁক করে হেসে নিখুঁত উচ্চারণে ইংরিজিতে বলল, "হ্যালো, মিঃ রায়চৌধুরী, গুড আফটারনুন। আশা করি তোমার এখানে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি?"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে বললেন, "তুমিই হানি আলকাদি?"

লোকটি সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে 'হ্যাঁ' বলল। তারপর মেঝেতে নেমে এসে বলল, "ঘরের মধ্যে এখনও গরম, বাইরে কিন্তু চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। চলো আমরা বাইরে গিয়ে বসি। তোমাকে আমরা ফাইনেস্ট ইন্ডিয়ান টি খাওয়াব। সেই সঙ্গে ফিশ কাবাব! তোমরা বেঙ্গালিরা তো ফিশ ভালবাসো!"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব প্লেজানট্রিস বন্ধ করো। আগে আমি তোমার কাছ থেকে কয়েকটা এক্সপ্লানেশান চাই। তুমি আমাকে এখানে ধরে আনিয়েছ কেন? আমি ভারতীয় নাগরিক, আমাকে বন্দী করার কী অধিকার আছে তোমার?"

হানি আলকাদি খুব অবাক হবার ভান করে বলল, "ধরে এনেছি? মোটেই না! তোমার কি হাত বাঁধা আছে? তোমাকে আমি নেমন্তন্ন করে এনেছি। তুমিই তো শুনলুম আমার দু'জন লোককে হাতে এমন মেরেছ যে, এক বেচারির কব্জি মুচকে গেছে!"

কাকাবাবু স্থির দৃষ্টিতে হানি আলকাদির চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তোমাদের দেশে বুঝি রিভলভার উঁচিয়ে নেমন্তন্ন করাই প্রথা? আমি আগেও এখানে এসেছি, অনেক নেমন্তন্ন খেয়েছি, কোনওদিন তো এরকম দেখিনি?"

হানি আলকাদি লজ্জিত ভাব করে বলল, "আরে ছি ছি ছি, হোয়াট আ শেম! আমার লোকেরা এরকম বাড়াবাড়ি করে ফেলে! আমি মোটেও সেরকম নির্দেশ দিইনি। অবশ্য তোমার সব কথা শুনেটুনে ওরা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। মিঃ রায়চৌধুরী, আমি সত্যি বলছি, আমরা এখানে অনেকেই ভারতীয়দের খুব পছন্দ করি। আমি তোমাদের রবীন্দ্রনাথ টেগোরের খুব ভক্ত। সবাই আমাকে বিপ্লবী বলে জানে, কিন্তু আমি একজন কবিও বটে। ছদ্মনামে আমার দুটো কবিতার বই বেরিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "রবীন্দ্রনাথের কোনও ভক্ত কোমরে দুটো পিস্তল ঝুলিয়ে রাখে, এটা দেখা আমার পক্ষে একটা নতুন অভিজ্ঞতা বটে। যাক গে যাক, আমি তোমার কাছে জানতে চাই..."

হানি আলকাদি এগিয়ে এসে কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো তুলে ধরে বলল, "তুমি বড্ড রেগে আছ। এই নাও, বাইরে চলো, আকাশটা কী সুন্দর হয়ে আছে এখন, দেখলে তোমার মন ভাল হয়ে যাবে!"

অগত্যা কাকাবাবু বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেখানকার ফাঁকা চত্বরে একটা টেবিল ও দুটি চেয়ার পাতা হয়েছে। কিছু লোকজন সেখানে খাবারদাবার আর চায়ের পট সাজিয়ে দিচ্ছে। আকাশটার একপ্রান্তে টকটকে লাল। তার পরের দিকটার মেঘে অনেক রঙের খেলা। বড় অপূর্ব দৃশ্য।

কাকাবাবু তবু বললেন, "শোনো হানি আলকাদি, আমার কতকগুলো প্রিন্সিপ্‌ল আছে। তোমার সঙ্গে বসে আমি খাবার কেন, এক গেলাস জলও খাব না। কারণ তুমি খুনি। তুমি বিনা দোষে আমাকে হত্যা করবার জন্য একজনকে পাঠিয়েছিলে দিল্লিতে!"

হানি আলকাদি বলল, "তোমাকে হত্যা করতে? মোটেই না! তা হলে এটা দ্যাখো!" বলেই চেঁচিয়ে ডাকল, "মোসলেম! মোসলেম!"

অমনি একজন লোক বেরিয়ে এল পাশের গলি থেকে। কাকাবাবু তাকে দেখেই চিনতে পারলেন। এই লোকটাই দিল্লিতে তাঁর আততায়ী হয়ে এসেছিল এক রাত্তিরে।

হানি আলকাদি অনেক দূরের একটা খেজুরগাছ দেখিয়ে সেই লোকটিকে কী যেন বলল আরবি ভাষায়। তারপর নিজের একটা রিভলভার দিল লোকটির হাতে।

লোকটি চোখ বন্ধ করে এক পাশ ফিরে গুলি করল। নিখুঁত লক্ষ্যভেদে উড়ে গেল খেজুর গাছের ডগাটা।

হানি আলকাদি যেন তাতেও খুশি হল না। লোকটির পাশে গিয়ে ধমক দিয়ে কী যেন বলতে লাগল। লোকটি আবার রিভলভার তুলে গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি হল। ট্রিগার টিপতে যাবে এমন সময় হানি আলকাদি চেঁচিয়ে বলল, "ব্লাডি ফুল! লুক বিহাইণ্ড!" বলেই লোকটির কাঁধের ওপর একটা থাপ্পড় কষাল।

লোকটি তবুও গুলি ছুঁড়ল এবং এবারেও খেজুরগাছটার ডগার খানিকটা অংশ উড়ে গেল।

হানি আলকাদি হাসতে-হাসতে কাকাবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "দেখলে? দেখলে তো? এই মোসলেম আমার বডিগার্ড। পৃথিবীতে যেখানেই যাই, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাই। ওর মাথা ঠাণ্ডা। টিপ অব্যর্থ। তোমার কাছে ওকে পাঠিয়েছিলাম শুধু তোমাকে একটুখানি আঘাত দেবার জন্য। তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলতে চাইলে ও ঠিকই মেরে আসত! তখনও তোমার সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানতুম না। তোমাকে একটু ভয় দেখিয়ে আমাদের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলুম।"

হঠাৎ কাকাবাবুর একটা হাত জড়িয়ে ধরে হানি আলকাদি খুবই অনুতপ্ত গলায় বলল, "তোমাকে আঘাত দিতে হয়েছিল বলে আমি ক্ষমা চাইছি। ঐ যে বললুম, তখন তোমার সম্পর্কে ভাল করে জানা ছিল না। আমরা ভেবেছিলুম, তুমি আল মামুনের একটা ভাড়াটে লোক!"

হানি আলকাদির এতখানি বিনীত ব্যবহার দেখে কাকাবাবু অভিভূত হয়ে গেলেন। কোমরে দু'দুটো পিস্তল থাকলেও লোকটি সত্যিই একজন কবি!

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবারে বুঝেছি। আমার অবশ্য বেশি আঘাত লাগেনি!"

"চলো, তা হলে কিছু খেয়ে নিই। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, ভাল জাতের ভারতীয় চা একটু ঠাণ্ডা হলেই বিস্বাদ হয়ে যায়।"

দু'জনে এসে বসলেন টেবিলে। হানি আলকাদি যত্ন করে কাকাবাবুর প্লেটে খাবার তুলে দিল। চা বানাল সে নিজেই। কাকাবাবু চা পান করতে করতে আকাশে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

চা শেষ করে হানি আলকাদি একটা চ্যাপ্টা ধরনের সিগারেট ধরাল। তারপর কাকাবাবুর দিকে ডান হাত বাড়িয়ে বলল, "এবারে দাও!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী?"

"মুফ্‌তি মহম্মদের উইল! তারপর আমার লোকেরা তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবে।"

"যদি আমি না দিই?"

"তা হলে তুমি আমাদের এখানেই সম্মানিত অতিথি হয়ে থাকবে। আমরা রোজ তোমাকে অনুরোধ করব। যাতে তুমি দিয়ে দাও। কিমবা সেগুলো কোথায় আছে তুমি বলে দাও! মিঃ রায়চৌধুরী, আমাদের গুরু মুফ্‌তি মহম্মদের সম্পদ আটকে রেখে তোমার কী লাভ? তা তো তুমি নিজে ভোগ করতে পারবে না। তুমি কি তা ইজিপ্টের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে? সে সব দিন আর নেই!"

"শোনো হানি আলকাদি, তোমাদের গুরু মুফ্‌তি মহম্মদের কোনও সম্পদ ছিল কি ছিল না তা আমি জানি না। থাকলেও তা ভোগ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। তিনি তো ফকির ছিলেন শুনেছি, তাঁর সম্পদ সম্পর্কে তোমাদের এত আগ্রহ কেন?"

"ফকির হবার আগে তিনি এক বিরাট বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর টাকা ছিল তাঁর দলের। সে সব কোথায় গেল?"

"তিনি তো বিপ্লবী দল ভেঙে দিয়েছেন প্রায় চল্লিশ বছর আগে। এতদিনেও তোমরা তার সন্ধান পাওনি?"

"না। কেউ তা পায়নি। ওঁকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করত না। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি নিশ্চয়ই সব বলে দিয়ে গেছেন। সেই সন্ধানই আমরা জানতে চাই! উনি যে ছবিগুলো এঁকেছিলেন, সেগুলো আমাদের দিয়ে দাও!"

"সেগুলো তো আমার কাছে নেই। আল মামুন সেগুলো শুধু আমাকে দেখতে দিয়েছে, আমাকে তো দেয়নি!"

"ইয়া আল্লা! আমরা বরাবর ভেবেছি, সেগুলো তুমিই লুকিয়ে রেখেছ। আল মামুনের একটা লোককে আমরা ধরে এনে টর্চার করেছিলুম, সেও ঐ কথাই বলেছে!"

"না, তা নয়। ছবিগুলোতে কী লেখা আছে তা এক মাত্র আমি জানি। ছবিগুলো আল মামুন নিজের কাছেই রেখেছে, কিন্তু ওতে কী লেখা আছে তা ও কিছুই জানে না। অবশ্য ও লণ্ডনে লর্ড পেমব্রোকের কাছে ছবিগুলো নিয়ে যেতে পারে, তিনি আমার চেয়ে অনেক ভালভাবে ওগুলো ডিসাইফার করে দিতে পারবেন।"

"মিঃ রায়চৌধুরী, তুমি কি জানো না, লর্ড পেমব্রোক মাত্র দু'সপ্তাহ আগে মারা গেছেন? সুতরাং এখন পর্যন্ত শুধু তুমিই ওগুলোর অর্থ জানো! দেরি করার সময় নেই। আজই আমরা সব কিছু জানতে চাই।"

"আল মামুনও ছবিগুলোর অর্থ জানতে চেয়েছিল। তাকে বলিনি। তা হলে তোমাদের বলব কেন?"

এই প্রথম হানি আলকাদি রেগে উঠল। টেবিলের ওপর এমন জোরে একটা ঘুসি মারল যে, কাপ-প্লেটগুলো কেঁপে উঠল ঝনঝন করে। তার ফর্সা মুখখানা টকটকে লাল হয়ে গেছে।

সে বলল, "কী বলছ তুমি, আমাদের সঙ্গে ঐ পিশাচটার তুলনা? আমরা বিপ্লবী, আমরা কেউ নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবি না! আর ঐ লোকটা, ঐ আল মামুন, ও তো একটা ঘৃণ্য লোভী মানুষ। ওর অনেক টাকা, তবু ওর টাকার আশ মেটে না। ও মুফ্‌তি মহম্মদকে দিল্লিতে চিকিৎসা করাতে নিয়ে গিয়েছিল শুধু এই লোভে যে, যদি মুফ্‌তি মহম্মদ শেষ পর্যন্ত ওকেই সব কিছুর সন্ধান বলে দেন! ওকে আমি খুন করব! নিজের হাতে।"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সে তোমরা যা ইচ্ছে করো। এর মধ্যে আমাকে জড়াচ্ছ কেন?"

হানি আলকাদি নিজের রাগ খানিকটা সামলে নিল। তারপর সেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমাকে জড়াচ্ছি, তার কারণ, তুমি এখন পর্যন্ত মুফ্‌তি মহম্মদের উইলের অর্থ জানো। তুমি যদি আমাদের বলতে না চাও, তা হলে আর কেউ যাতে জেনে না ফেলে, সেজন্য আমরা তোমার মুণ্ডুটা কেটে ফেলতে বাধ্য হব!"

কাকাবাবু বললেন, "ইউ আর ওয়েলকাম। আমার কাটা মুণ্ডু কোনও কথা বলবে না!"

হানি আলকাদি এবারে হঠাৎ কাকাবাবুর পায়ের কাছে বসে পড়ে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, তুমি টেগোরের দেশের লোক, গান্ধীর দেশের লোক, তোমরা ভায়োলেন্সকে ঘৃণা করো, তা আমরা জানি। কিন্তু তোমরা তো আমাদের এদিককার দেশগুলোর অবস্থা জানো না! সে যাই হোক, তোমার মুণ্ডু কাটার কথা আমি এমনিই রাগের মাথায় বলে ফেলেছি। তুমি আমাদের বলো বা না-ই বলো, আমরা তোমার কোনওই ক্ষতি করব না। তবু আমি কাতরভাবে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমাদের দল এখন এমন অবস্থায় রয়েছে, প্রচুর টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র না পেলে

আমরা আর কাজ চালাতে পারব না! সেইজন্যেই মুফতি মহম্মদের উইলের ওপর আমরা এত আশা রেখেছি!”

কাকাবাবু হানি আলকাদির কাঁধ ধরে বললেন, “ওঠো, চেয়ারে বোসো! শোনো, তোমাকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। তোমাকে আমি খোলাখুলি বলছি, মুফতি মহম্মদ শেষ উইল করেছিলেন কি না, তা আমি জানি না। সত্যিই জানি না!”

“মিঃ রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি বিশ্বাস করছি। তা হলে বলো, ছবিতে এঁকে এঁকে উনি কী বুঝিয়েছিলেন?”

“সেটা বলতে পারো এক ধরনের ছেলেমানুষি। একজন সাতানব্বই বছরের বৃদ্ধের শেষ কৌতুক। সেটা জেনে তোমার বা আল মামুনের কোনওই লাভ হবে না। বরং আমার মতন যে-সব লোক ইতিহাসের ব্যাপারে কৌতুহলী, তাদেরই আগ্রহ হবে। মুফতি মহম্মদ আমাকে আদেশ করেছেন যে, সেটা আমি যাচাই করার আগে যেন কারুকে না বলি। সেটা যাচাই করার পর আমি তোমাকে বলব নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে আমাকে তোমায় কয়েকটা সাহায্য করতে হবে।”

“কী সাহায্য বলো?”

“আমাকে একটা পিরামিডের মধ্যে ঢুকতে হবে। হয়তো একটা সমাধি-কুয়োর মধ্যেও নামতে হতে পারে। এজন্য গাইড চাই, উট চাই, আর কিছু সরঞ্জাম চাই। তুমি যদি সে-সব ব্যবস্থা করে দাও, তা হলে আমি কথা দিচ্ছি, আমি যদি কোনও গুপ্ত সম্পদের সন্ধান জানতে পারি, তবে তা তোমাকেই আগে জানাব।”

হানি আলকাদি ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “ইটস্ আ ডিল! তুমি কবে রওনা হতে চাও বলো? কাল সকালে?”

কাকাবাবু বললেন, “তার আগে দু'একটা কাজ আছে। মেমফিসে ডাগো আবদাল্লা নামে পুরনো একজন গাইডকে আমি চিনতাম। সে যদি বেঁচে থাকে, তাকে আমার দরকার হবে। আর হোটেল ওয়েসিস থেকে আমার ভাইপো সন্তুকেও আনাতে হবে এখানে। তাকে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি পৌঁছে দিতে পারবে?”

হানি আলকাদি বলল, “তুমি এক্ষুনি চিঠি লেখো। দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। ডাগো আবদাল্লাও বেশ বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে। তাকে আমি আনিয়ে দিচ্ছি।”

তারপরই সে তার লোকজনদের হুকুম করল কাগজ আর কলম আনবার জন্য। সে-সব এসে গেলে কাকাবাবু চিঠি লিখতে শুরু করলেন।

স্নেহের সন্তু,

আমি ভাল আছি। এরা আমাকে বেশ যত্নে রেখেছে। হানি আলকাদি লোকটি মন্দ না, তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে। এরপর এখান থেকে আমরা একটা অভিযানে বেরুব, সেজন্য তোকে আসতে হবে এখানে। তোকে যা করতে হবে তা বলছি। এই চিঠি যে নিয়ে যাবে, সে কাল সকালে তোকে একটা উট ভাড়া

করে দেবে. সেই উটে চেপে তুই মেমফিসে চলে আসবি। সেখানে স্টেপ পিরামিড আছে, চিনতে তোর অসুবিধে হবে না। অন্য পিরামিডের চেয়ে এর চেহারাটা একেবারেই আলাদা। এর বাইরের গা দিয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ির মতন উঠে গেছে। তুই সেখানে এসে অপেক্ষা করবি। এখানকার লোক তোকে গিয়ে নিয়ে আসবে।

চিন্তার কিছু নেই। কাল সন্ধের মধ্যে দেখা হবে।

ইতি— কাকাবাবু

পুনশ্চ : সিদ্ধার্থকে সঙ্গে আনবার কোনওই দরকার নেই। ওকে বুঝিয়ে বলবি। আমরা যে-কাজে যাচ্ছি, তাতে সরকারি লোকজনদের না জড়ানোই ভাল। মান্টোকে বলবি, আমি আর তিন-চারদিন পরে ওর সঙ্গে মিউজিয়ামে গিয়ে দেখা করব!

◀ ৮ ▶

বিমান বলল, "আরে সন্তু, তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? কাকাবাবু তো চিঠিতে লিখেছেন সিদ্ধার্থদাকে সঙ্গে নিয়ে না যেতে। আমাদের কথা তো বারণ করেননি। তাছাড়া আমি তো সেই সেন্সে ঠিক টেকনিক্যালি সরকারি লোক নই!"

সন্তু মুখ গোঁজ করে বলল, "যাই বলো বিমানদা, চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে কাকাবাবু আমাকে একলাই যেতে বলেছেন। অন্য কারুর সাহায্য নেবার দরকার হলে তা নিশ্চয়ই জানাতেন।"

বিমান বলল, "তুই কিছু বুঝিস না। বন্দী অবস্থায় কেউ অত কিছু লিখতে পারে? ঐ যে কাকাবাবু লিখেছেন না 'এরা আমাকে খুব যত্নে রেখেছে', তার মানে কী বুঝলি তো? দু'পাশে দু'জন লোক লাইট মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!"

রিনি বলল, "আমি তো যাবই! শুধু ছেলেরাই বুঝি এক-একা অ্যাডভেঞ্চার করবে!"

বিমান বলল, "নিশ্চয়ই যাবি! আমি আথেন্স থেকে হুড়োহুড়ি করে চলে এলুম, তার আগেই দেখি যত সব কাণ্ড ঘটে গেছে। আমি থাকলে কি আর ওরা কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে যেতে পারত?"

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল, "তুমি থাকলে কী করতে, বিমান? শুনলেই তো যে তিনজন লোক এসেছিল, উইথ আর্মস। কাকাবাবু দু'জনকে টিট করেছিলেন, কিন্তু থার্ড লোকটা ছিল সত্যিকারের টাফ্।"

বিমান বলল, "আমি থাকলে তাকে একখানা স্কোয়ার কাট ঝাড়তুম! জিজ্ঞেস করো না সন্তুকে, সুন্দরবনে 'খালি জাহাজের রহস্য' সমাধান করতে গিয়ে আমি ক'টা লোককে শায়েস্তা করেছিলুম।"

সন্তুর এসব কথাবার্তা একদম পছন্দ হচ্ছে না। সে ছটফট করছে কখন বেরিয়ে পড়বে।

আগের দিন কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে যাবার পর সন্তু আর মান্টোসাহেব এক ঘণ্টার আগে ছাড়া পায়নি। দশ মিনিট পরে ওরা রিসেপশনে ফোন করেছিল, কেউ উত্তর দেয়নি। সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। শেষ পর্যন্ত এক ঝাড়ুদার দরজা খুলে দিয়েছিল।

মান্টোসাহেব একটু পরেই চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সন্তু চুপচাপ বসেছিল ঘরের মধ্যে। সেইরকমই ছিল কাকাবাবুর নির্দেশ।

সন্ধেবেলা সিদ্ধার্থ এসে সব শুনে হতবাক। এরই মধ্যে কাকাবাবুকে গুম্ করেছে? দিনদুপুরে? সিদ্ধার্থ তক্ষুনি একটা হৈচৈ বাধিয়ে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু সন্তু তাকে নিষেধ করেছে। আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে যে, বিপদ দেখলে একেবারে ঘাবড়ে গেলে চলে না। কাকাবাবু বলে গেছেন কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। তার মধ্যে কোনও খবর না দিলে তারপর এখানকার গভর্নমেন্টকে জানাতে হবে। এখন চুপচাপ থাকাই ভাল।

সিদ্ধার্থ সন্তুকে তখন নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তাতেও সন্তু রাজি হয়নি। কাকাবাবু খবর পাঠাবেন এই হোটেলেই। এখানেই সন্তুকে অপেক্ষা করতে হবে। সিদ্ধার্থ বলেছিল, "তুমি রাত্তিরে এই হোটেলে একলা থাকবে? তা হতেই পারে না। আবার যদি হামলা হয়?"

সে-সমস্যার সমাধান হয়ে গেল একটু পরেই। রাত আটটার সময় সেই হোটেলে এসে হাজির হয়ে গেল বিমান। আথেন্স থেকে সে অন্য একটা ফ্লাইট ধরে চলে এসেছে। ঠিক হল, বিমানই থাকবে সন্তুর সঙ্গে ঐ হোটেল-ঘরে।

প্রায় মাঝরাত্তিরে কাকাবাবুর চিঠি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল একজন লোক। মাঝবয়েসি, মোটাসোটা গোলগাল ধরনের চেহারা। মাথাভর্তি চকচকে টাক। দেখলে বিপ্লবী বলে মনেই হয় না।

ভদ্রলোক বললেন, তিনি একটি কুরিয়ার সার্ভিস এজেন্সির লোক। তাঁর এক মক্কেল এই জরুরি চিঠি পাঠিয়েছে, এবং তাঁকে বলা হয়েছে কাল সকালে একটা উট ভাড়া করে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে। কাল ঠিক সাড়ে এগারোটায় উট তৈরি থাকবে স্ফিংকসের সামনে। এদিককার পার্টি যেন বাসে করে সেখানে ঠিক সময়ে পৌঁছে যায়।

বিমান সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনার মক্কেল কে? কোথা থেকে এই চিঠিটা এসেছে?"

ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন, "তা বলা যাবে না। বিজনেস সিক্রেট। গুড নাইট!"

চিঠি পড়েই সন্তু ঠিক করেছিল সে একাই যাবে। কিন্তু বিমান ঝামেলা বাধাল। সন্তুকে সে কিছুতেই একা ছাড়বে না। তা ছাড়া সে নিজেও অ্যাডভেঞ্চার করতে চায়। রিনিরও সেই একই আবদার।

সন্তু অনেকবার আপত্তি করার পর বিমান বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে! তুই

উটের পিঠে চেপে মেমফিস যাবি, আমরা বুঝি আর একটা উট ভাড়া করে তোর পাশাপাশি যেতে পারি না! অন্য টুরিস্টরা যাবে না? যে-কেউ ইচ্ছে করলে মেমফিসের পিরামিড দেখতে যেতে পারে।"

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। স্ফিংকসের কাছে এসে সন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট উটে চাপল, বিমান আর রিনি বসল আর-একটা ভাড়া-করা উটে।

স্ফিংকস আর কাছাকাছি পিরামিডগুলোতে সকালবেলাতেই অনেক টুরিস্ট এসেছে। সন্তু সতৃষ্ণভাবে একবার স্ফিংকসের দিকে তাকাল। তার ভাল করে দেখা হল না।

বিমান বলল, "জানিস সন্তু, সন্ধেবেলা এখানে সনে-লুমিয়ের হয়। আলোর খেলাতে পুরনো মিশরের ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায়।"

রিনি বলল, "আমাদের দিল্লিতে লালকেল্লায় যে-রকম আছে?"

সন্তুর এসব কথায় মন লাগছে না। সে খালি ভাবছে, কখন কাকাবাবুর কাছে পৌঁছবে। সে শুনেছে, আরব গেরিলারা মানুষ খুন করতে একটুও দ্বিধা করে না।

উটের পিঠে চাপার অভিজ্ঞতাও সন্তুর এই প্রথম। সমস্ত শরীরটা দোলে। সামনে ধুধু করছে মরুভূমি। সন্তুর হঠাৎ যেন সব ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হল। সে স্বপ্ন দেখছে না তো? সত্যিই কি সে উটের পিঠে চেপে মরুভূমি পার হচ্ছে?

মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের কবিতা :

ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন!

পাশ থেকে বিমান বলল, "দেখবি কাল গায়ে কীরকম ব্যথা হয়। তখন উটে চড়ার মজাটা টের পাবি। বিছানায় শোবার বদলে সারা রাত ইচ্ছে করবে দাঁড়িয়ে থাকতে।"

রিনি জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি আজই ফিরে আসব?"

বিমান বলল, "এই রে, এরই মধ্যে ফেরার চিন্তা? চল্ তা হলে এক্ষুনি তোকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।"

রিনি বলল, "মোটেই না! আমি সে-কথা বলছি না। আমি বলছি, পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?"

বিমান বলল, "দু'ঘণ্টাও লাগতে পারে, আবার সারাদিনও লেগে যেতে পারে! উটের যেরকম মেজাজ মর্জি হবে।"

রিনি জিজ্ঞেস করল, "এই সন্তু, তুই কথা বলছিস না কেন রে? তুই গোমড়া মুখে রয়েছিস সকাল থেকে..."

গতকাল এয়ারপোর্টে রিনি যে সন্তুকে অপমান করেছিল তা বোধহয় সে নিজেই ভুলে গেছে। তারপর থেকেই সন্তুর আর কথা বলার ইচ্ছে নেই রিনির সঙ্গে।

সন্তুর উটটা যে চালাচ্ছে, তার বয়েস প্রায় সন্তুরই সমান। সে দু'চারটে ইংরিজি শব্দ মোটে জানে। সন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলে 'ইয়েস মাস্টার, নো মাস্টার' বলে।

ওদের দুটো উট ছাড়া আর কোনও টুরিস্ট যাচ্ছে না উটের পিঠে চেপে। অসহ্য গরম, রোদ একেবারে গনগন করছে। এত গরমেও কিন্তু একটুও ঘাম হয় না।

মাত্র আধ ঘণ্টা চলার পরেই মনে হল দূর থেকে একটা বিশাল কালো রঙের ধোঁয়ার কুণ্ডলী তেড়ে আসছে ওদের দিকে। বিমান চেঁচিয়ে বলল, "এই রে, সর্বনাশ, ঝড় আসছে!"

সন্তুর উট-চালক মুখ ঘুরিয়ে বলল, "নো অ্যাফ্রেড মাস্টার! নো ডেঞ্জার!"

দু'জন চালকই তাদের দুটো উটকে বসিয়ে দিল মাটিতে। সন্তুরা নেমে পড়ল চটপট। সবাই মিলে উটের পিঠের আড়ালে বসল। বিমান বলল, "ঝড়ের ধুলো একদিক থেকে আসে তো, তাই একটু আড়ালে বসলেই গায়ে কিছু লাগে না!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "ঘূর্ণিঝড় হয় না?"

বিমান বলল, "তাও হয় মাঝে-মাঝে। তখন উপুড় হয়ে শুয়ে মুখ গুঁজে থাকতে হয় আর কান ঢাকা দিতে হয়।"

রিনি বলল, "কী দারুণ লাগছে! ঠিক সিনেমার মতন। আজই ফিরে গিয়ে মা'কে একটা চিঠি লিখব।"

বিমান বলল, "তুই এখনও ভাবছিস আজই ফিরবি? মেমফিসে তোকে একটা রেস্ট হাউসে রেখে আমি আর সন্তু যাব কাকাবাবুর কাছে।"

রিনি বলল, "আহা-হা, অত শস্তা নয়। আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে!"

এর পরেই মাথার ওপর দিয়ে ঝড় এসে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক, কিছুই আর দেখা যায় না। সেই প্রচণ্ড শনশন শব্দ। ওরা কান ঢেকে মুখ নিচু করে রইল, আর কথা বলারও উপায় নেই।

সেই ঝড় যেন আর থামতেই চায় না। কতক্ষণ যে চলল তার ঠিক নেই। উট দুটো মাঝে-মাঝে ভ-র-র-র- ভ-র-র-র করে জোরে নিশ্বাস ফেলছে, শুধু সেই শব্দ ঝড়ের শব্দ ছাপিয়েও শোনা যায়।

যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনই হঠাৎ ঝড় শেষ হয়ে গেল এক সময়। আকাশ একেবারে পরিষ্কার।

সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। আগে মরুভূমিটা ছিল সমতল। এখন কাছাকাছি অনেকগুলো বালির পাহাড় তৈরি হয়ে গেছে। বেশি দূর পর্যন্ত আর দেখা যায় না।

বিমান বলল, "ঝড় হয়ে যাবার এই আর এক মুশকিল। এই সব স্যান্ড ডিউনস পার হতে উটগুলোর বেশি সময় লাগে।"

আবার ওরা চেপে বসল উটের পিঠে। আর কোনও ঘটনা ঘটল না। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে একঘেয়ে যাত্রা। তারপর দূরে দেখা গেল কয়েকটি পিরামিডের চূড়া, আর মেমফিস শহরের চিহ্ন।

বিমান বলল, "জানিস সন্তু, এই মেমফিস ছিল মিশরের প্রাচীন রাজধানী। সে

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। তখনও আমাদের দেশে আর্য-সভ্যতার জন্ম হয়নি।”

সন্তু মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে দেখতে বলল, “স্টেপ পিরামিড কোথায়? ঐ তো, ঐ যে! সত্যি দেখলেই চেনা যায়।”

রিনি বলল, “ঐ পিরামিডটার ছবি অনেক বইতে দেখেছি। আচ্ছা বিমানদা, বেশির ভাগ বইতে ঐ পিরামিডটার ছবিই দেয় কেন? আরও তো কত পিরামিড রয়েছে।”

বিমান বলল, “কারণ এই পিরামিডটাই সবচেয়ে প্রাচীন। একেবারে প্রথম তৈরি করা হয়েছিল।”

সন্তু উটওয়ালাকে ঐ পিরামিডের দিকে যেতে বলল।

স্টেপ পিরামিডের গায়ে ধাপে-ধাপে খাঁজ কাটা আছে। দূর থেকে সিঁড়ির মতন দেখালেও কাছে এলে বোঝা যায় ধাপগুলো অনেক উঁচু উঁচুতে। সহজে বেয়ে ওঠার উপায় নেই।

ওরা উট থেকে নেমে দাঁড়াল। সেখানে আর কোনও লোক নেই।

উটওয়ালা দু'জন বলল, “গাইড কল মাস্টার? ফিফটি পিয়াস্তা! মি গিভ ফিফটি পিয়াস্তা!”

সন্তু বলল, “না, গাইডের দরকার নেই। আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে।”

রিনি বলল, “বাবা রে, একটাও মানুষজন নেই। আমাদের যদি এখানে মেরে পুঁতে রাখে, কেউ টেরও পাবে না।”

এতক্ষণ বাদে সন্তু রিনিকে বলল, “অতই যদি ভয়, তা হলে কে আসতে বলেছিল তোকে?”

রিনি বলল, “বেশ করেছি!”

তারপর সে ছোট্ট একটা ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগল।

বিমান বলল, “চিঠিটা জেনুইন ছিল তো? আমি কাকাবাবুর হাতের লেখা চিনি না।”

সন্তু বলল, “হ্যাঁ, জেনুইন। তা ছাড়া এখানে আর কে বাংলাতে চিঠি লিখবে?”

খানিকবাদে দূর থেকে একটা জিপ আসতে দেখা গেল।

সন্তু বলল, “ঐ আসছে!”

রিনি বলল, “মরুভূমিতে যদি জিপগাড়ি চলে, তা হলে আর উটে চড়বার দরকার কী? আমার বিচ্ছিরি লেগেছে!”

জিপটা কাছে এসে থামতেই তার থেকে একজন বলশালী লোক নামল। লোকটি যত না লম্বা, তার চেয়ে বেশি চওড়া।

সে প্রথমেই সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “সোনটু? সোনটু? মি ডাগো আবদাল্লা। মি কাম ফ্রম রায়চৌধুরী। ইউ কাম উইথ মি!”

বিমান বলল, "তোমার কাছে রায়চৌধুরীর কোনও চিঠি আছে?"

ডাগো আবদাল্লা মাথা নেড়ে জানাল, না।

বিমান বলল, "তা হলে আমরা কী করে বিশ্বাস করব!"

আচমকা যে-রকম মরুভূমিতে ঝড় উঠেছিল, ঠিক সেইরকমভাবে আচমকা একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটল।

স্টেপ পিরামিডের আড়াল থেকে খুব জোরে ছুটে এল একটা স্টেশন ওয়াগন। বিকট শব্দ করে সেটা ব্রেক কষল ডাগো আবদাল্লার ঠিক পেছনে। চাপা পড়বার ভয়ে ডাগো একটা লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশের দিকে।

গাড়ি থেকে টপটপ করে নেমে পড়ল চারজন লোক। তাদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। তাদের মধ্যে একজন অতিকায় চেহারার লোক প্রায় এক হাতেই সন্তুকে একটা বেড়ালছানার মতন উঁচুতে তুলে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দিল গাড়ির মধ্যে।

রিনি ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

একজন লোক বিমানের দিকে ফিরে বলল, "ইউ গো ব্যাক।"

আর-একজন লোক মাটিতে পড়ে থাকা ডাগো আবদাল্লার পিঠের ওপর নিজের বুটজুতোসুদ্ধু পা তুলে দিয়েছে। কর্কশ গলায় সে বলল, "হেই ডাগো, ইউ ওয়ান্ট টু ডাই?"

রাগে, অপমানে ডাগো আবদাল্লার মুখখানা অদ্ভুত হয়ে গেছে। মানুষটার অতবড় চেহারা, কিন্তু চারখানা রাইফেলের বিরুদ্ধে সে কী করবে। ডাগো যে জিপে এসেছে, তাতে রয়েছে শুধু একজন ড্রাইভার। তার দিকেও একজন রাইফেল উঁচিয়ে আছে।

ডাগোর পিঠে যে পা তুলে আছে, সে আবার জিজ্ঞেস করল, "ডাগো, তুই মরতে চাস? আমি ঠিক পাঁচ গুণব!"

ডাগো ফিসফিস করে বলল, "নো, এফেন্দি!"

লোকটি পা'টা সরিয়ে নিয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করল। সেটা ডাগোর মুখের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "এটা তোর মালিককে দিবি! বলবি, বারো ঘণ্টার মধ্যে উত্তর চাই!"

ডাগো আস্তে-আস্তে মাটি থেকে উঠল। দুটো রাইফেল তাক করা রয়েছে তার দিকে। চিঠিটা হাতে নিয়ে সে আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে জিপে উঠল।

একজন হুকুম দিল, "স্টার্ট!"

জিপটা চলতে শুরু করার পরেও কিছুক্ষণ রাইফেলের নল তোলা রইল সেদিকে!

জিপটা চোখের আড়ালে চলে যাবার পর ওরা বিমান আর রিনির দিকে ফিরল। রিনি মুখে হাত চাপা দিয়ে আছে, তার সারা শরীর কাঁপছে। বিমান তাকিয়ে আছে অসহায়ভাবে। সন্তুকে নেবার জন্য দুটো দলের লোক এসেছে। এর মধ্যে কারা যে কোন্ দলের, তা সে বুঝতে পারছে না। তার নিজেরও কিছুই করার নেই। সুন্দরবনের ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করা আর আরব গেরিলাদের সঙ্গে লড়াই

করা তো এক কথা নয়। এরা প্লেন ধ্বংস করে, ডিনামাইট দিয়ে গোটা বাড়ি উড়িয়ে দেয়।

রাইফেলের নল দোলাতে দোলাতে একজন বলল, "গেট গোয়িং! গেট গোয়িং!"

রিনির হাত ধরে বিমান এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেল। ওদের উটওয়ালা ততক্ষণে তার উটটাকে বসিয়ে ফেলেছে। বিমান রিনিকে নিয়ে চেপে বসল উটের পিঠে।

ওদের একজন এবার একারণেই আকাশের দিকে রাইফেল তুলে একবার ট্রিগার টিপল। সেই আওয়াজে উট দুটোই দৌড় দিল তড়বড়িয়ে।

স্টেশান ওয়াগনটা সন্তুকে নিয়ে চলে গেল উল্টো দিকে।

ওদিকে হানি আলকাদি কাকাবাবুর অভিযানের সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। উটের বদলে কাকাবাবু যাবেন গাড়িতে, তাতে সময় বাঁচবে। হানি আলকাদিও যাবে অন্য একটি গাড়িতে। কাকাবাবুর সঙ্গে তার শর্ত হয়েছে যে, হানি আলকাদি তার দলবল নিয়ে অপেক্ষা করবে গিজাতে। সেখান থেকে সে আর এগুতে পারবে না। কাকাবাবুর সঙ্গে শুধু যাবে সন্তু আর ডাগো আবদাল্লা। কাকাবাবু যদি চার ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না আসেন, তা হলে হানি আলকাদি তাঁর খোঁজ নিতে যাবেন।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাকাবাবু একাই কাটিয়েছেন। হানি আলকাদির দেখা পাওয়া যায়নি। অন্য লোকজনও বিশেষ কেউ ছিল না মনে হয়। সন্ধের দিকে এক-এক করে সব আসতে লাগল। এরা বিপ্লবী হলেও দিনের বেলায় নিশ্চয়ই অন্য কাজ করে।

অন্ধকার হয়ে আসার পর কয়েকটা মশাল জ্বালা হল চত্বরে। কাকাবাবু বাইরেই চেয়ার পেতে বসেছিলেন, এক সময় সেখানে হাতে একটা মশাল নিয়ে উপস্থিত হল হানি আলকাদি। আজ তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। জলপাই-সবুজ রঙের পোশাক পরা, মাথার চুলে একটা রিবন বাঁধা। চোখ দুটো একেবারে ঝকঝক করছে।

হাসিমুখে সে বলল, "হ্যালো, প্রফেসার! হাউ আর ইউ দিস ইভনিং?"

কাকাবাবুও হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা অনেকেই আমাকে প্রফেসার বলো কেন? আমি তো কখনও কোনও কলেজে পড়াইনি!"

হানি আলকাদি বলল, "ওঃ হো! আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমাদের এখানে অনেক কলেজেই আগে ইন্ডিয়ান প্রফেসাররা পড়াতেন। সেইজন্য কোনও ডিগনিফাইড চেহারার ইন্ডিয়ান দেখলেই আমাদের প্রফেসার মনে হয়। যাই হোক, তুমি একা-একা বিরক্ত হয়ে যাওনি তো? বাইরে বসে আকাশের রং-ফেরা দেখছিলে?"

"সূর্যাস্তের সময় এখানকার আকাশ সত্যি বড় অপূর্ব দেখায়। দুপুরে একবার ঝড় উঠেছিল, তারপর আকাশ আবার ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেল!"

"মিঃ রায়চৌধুরী, একটা কথা বলতে পারেন? পৃথিবীর থেকে আকাশের রং আমার বেশি সুন্দর লাগে। আকাশে নীল, সাদা, লাল, সোনালি, রূপোলি, কালো সব রং-ই দেখা যায়। কিন্তু সবুজ রং কখনও দেখা যায় না কেন? আমি প্রায়ই এ কথাটা ভাবি।"

কাকাবাবু জোরে হেসে ফেললেন, তারপর বললেন, "তোমাকে দেখার আগে তোমার সম্পর্কে কত কথাই শুনেছিলাম। তুমি নাকি সাঙ্ঘাতিক এক বিপ্লবী, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। এখন তো দেখছি তুমি একটি স্বপ্ন-দেখা নরম স্বভাবের যুবক।"

হানি আলকাদি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "যারা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে জানে না, তারা কী করে বিপ্লবী হবে?"

তারপর হাতঘড়ি দেখে বলল, "ইয়োর নেফিউ শুড বি হিয়ার এনি মিনিট। তুমি কি আজ রাত্তিরেই বেরিয়ে পড়তে চাও?"

কাকাবাবু বললেন, "যতটা এগিয়ে থাকা যায়, ততটাই ভাল। কাল ভোর থেকে কাজ শুরু করা যেতে পারে।"

মশালটা বালিতে গেঁথে হানি আলকাদি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "মুফতি মহম্মদ ছবির উইলে কী লিখে গেছেন, তা জানার জন্য আমার খুবই কৌতূহল হচ্ছে। তুমি তা বলবে না, না?"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "আর একটু ধৈর্য ধরো!"

এই সময় গাড়ির শব্দ হতেই দু'জনে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

গাড়িটা থামতেই ডাগো আবদাল্লা ছুটে এল ওদের দিকে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল।

অতবড় চেহারার একটি লোককে শিশুর মতন কাঁদতে দেখে কাকাবাবু প্রথমে অবাক হলেও সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে গেলেন কী ঘটেছে।

হানি আলকাদি প্রায় লাফিয়ে উঠে তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? ছেলেটাকে আনিসনি?"

ডাগো আবদাল্লা বলল, "আমাকে যা খুশি শাস্তি দাও, এফেন্দি! আমার চোখের সামনে থেকে ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে গেল। আমি কিছুই করতে পারিনি। ওদের চারটে রাইফেল ছিল।"

হানি আলকাদি চিৎকার করে বলল, "বেওকুফ, আগে বল, কারা নিয়ে গেছে! তুই তাদের চিনেছিস? কাদের এত সাহস যে, আমার লোকের ওপর হাত দেয়?"

ডাগো আবদাল্লা বলল, "হ্যাঁ চিনি, এফেন্দি। ওরাও আমাকে চিনেছে। আমার নাম ধরে ডাকল। ওরা আল মামুনের লোক!"

হানি আলকাদির সুন্দর মুখখানা এবারে রাগে একেবারে হিংস্র হয়ে উঠল। সে ডাগো আবদাল্লার চুলের মুঠি ধরে বলল, “সেই কুকুরটা তোর সামনে থেকে ছেলেটাকে নিয়ে গেল, তুই বেঁচে ফিরে এলি? ওদের একটাকেও তুই খতম করেছিস? আল মামুন! আজ আমি ওকে শেষ করে দেব। নিজের হাতে ওকে একটু-একটু করে কাটব!”

ডাগোকে ছেড়ে দিয়ে হানি আলকাদি হাততালি দিয়ে নিজের লোকদের ডাকতে লাগল।

ডাগো বলল, “একটা চিঠি দিয়েছে। বলেছে, বারো ঘণ্টার মধ্যে উত্তর চাই।”

কাকাবাবু আরবি ভাষা মোটামুটি জানেন। ওদের কথাবার্তা প্রায় সবটাই বুঝতে পারছিলেন। এবারে হাত বাড়িয়ে বললেন, “দেখি চিঠিটা।”

চিঠিখানা কাকাবাবুকে উদ্দেশ করে লেখা নয়। লিখেছে হানি আলকাদিকে। চিঠিটা এই রকম :

আল মামুন নিজে হানি আলকাদির মতন একজন নগণ্য, নির্বোধ লোককে চিঠি লেখার যোগ্য মনে করে না। আল মামুন তার দলের একজন লোক মারফত জানাচ্ছে যে, মিঃ রাজা রায়চৌধুরীকে বন্দী করে রাখার কোনও অধিকার হানি আলকাদির নেই। মিঃ রাজা রায়চৌধুরী আল মামুনের লোক। আল মামুনের কাছেই তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মুফতি মহম্মদের উত্তরাধিকারী আল মামুন, তার কথা সবাই মান্য করবে। যে আল মামুনের অবাধ্য হবে, সে শাস্তি পাবে। হানি আলকাদি যদি ১২ ঘণ্টার মধ্যে আল মামুনের আদেশ না পালন করে, তা হলে সে কঠিন শাস্তি পাবে। মিঃ রাজা রায়চৌধুরীকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ১২ ঘণ্টা পার হলে তাঁর ভাইপো খুন হবে, তার মৃতদেহ কেউ খুঁজে পাবে না। নির্বোধ হানি আলকাদি যেন আরও বেশি নির্বোধের মতন কাজ না করে।

চিঠিটা পড়ার সময় কাকাবাবু কোনও উত্তেজনার চিহ্ন দেখালেন না। শান্তভাবে চিঠিটা এগিয়ে দিলেন হানি আলকাদির দিকে।

হানি আলকাদি চিঠিটা পড়তে পড়তে যেন লাফাতে লাগল। পড়া হয়ে গেলে কাগজটা গোল্লা পাকিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার ওপরে লাথি কষাল কয়েকটা। সেই সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল, “একটা আলুর বস্তায় ইঁদুর! বাঁধা কপির পোকা! নর্দমার আরশোলা ঐ আল মামুনটাকে আমি টিপে মেরে ফেলব! আজ রাতে আমার ফোর্স নিয়ে গিয়ে ঐ বাঁদরের গায়ের উকুনটাকে আমি সবংশে শেষ করব।”

কাকাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, “হানি আলকাদি, এখন চ্যাঁচামেচি করার সময় নয়, আমি তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।”

হানি আলকাদি এগিয়ে আসতে-আসতে বলল, “তুমি চিন্তা কোরো না, রায়চৌধুরী, হানি আলকাদি যখন রেগে গেছে, তখন আল মামুন আজই খতম্ হবে।

মরুভূমিতে বালি আজ আল মামুনের রক্ত শুষবে! বাজপাখিরা আল মামুনের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে খাবে।"

কোমর থেকে সে এমনভাবে রিভলভার বার করল, যেন আল মামুন তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষুনি সে গুলি করবে।

এর মধ্যে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে চারপাশে। তারা ডাগো আবদাল্লার কাছ থেকে ঘটনাটা শুনছে।

কাকাবাবু হানি আলকাদিকে জিজ্ঞেস করলেন, "শোনো, আল মামুনকে তো আমি ব্যবসায়ী বলেই জানতাম। কিন্তু তারও কি তোমার মতন দল আছে নাকি? সে এত রাইফেলধারী পেল কোথায়?"

"আছে একটা ছোট দল। সে এমন কিছু না। আমার দলে হাজার-হাজার লোক আছে। ওকে আমরা, এই দ্যাখো, এইরকমভাবে একটা মুর্গির মতন জবাই করব!"

"তোমাদের দু'দলের কি আগে থেকেই ঝগড়া ছিল?"

"ওর দলকে আমরা গ্রাহ্যই করি না। ওর দল ধর্মীয় গোঁড়ামি ছড়াতে চায়, আর আমার দল চায় দেশের সব মানুষের উন্নতি।

"এর আগে আমরা ওদের নিয়ে মাথা ঘামাইনি, কিন্তু আল মামুনের দল যদি আমার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তা হলে আমি ওদের শেষ করে দেব। মুফতি মহম্মদের উত্তরাধিকারী ওকে কে করেছে? আমিই মুফতি মহম্মদের আসল উত্তরাধিকারী।"

"আল মামুন বুদ্ধিমান লোক। আমার ভাইপো সন্তুকে সে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, তুমি কী করে খুঁজে বার করবে?"

"আমার হাত ছাড়িয়ে পালাবার ক্ষমতা আছে আল মামুনের? আমি আগে ওর মাথার খুলিটা গুঁড়ো করে দেব!"

"তার আগেই যদি ওরা সন্তুকে মেরে ফেলে?"

"তুমি অযথা চিন্তা কোরো না, রায়চৌধুরী..."

"হ্যাঁ, চিন্তা আমাকে করতেই হবে। তোমাদের দু'দলের ঝগড়ার মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না। আল মামুন মাত্র বারো ঘণ্টা সময় দিয়েছে! তার শর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই!"

"অ্যাঁ? কী বলছ তুমি? ঐ শয়তানের দাঁতের ময়লাটা ভয় দেখালেই আমরা ভয় পেয়ে যাব? তা হতেই পারে না!"

"মাত্র বারো ঘণ্টা সময়। এর মধ্যেই সন্তুকে আমি ফেরত চাই। কোনও ঝুঁকি নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শোনো, আমি দুটো উপায় ভেবেছি। এক হচ্ছে, আমাকে ফেরত পাঠানো। আল মামুন তার চিঠিতে শুধু আমাকেই ফেরত দিতে বলেছে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও!"

"মিঃ রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি সাহসী মানুষ বলে ভেবেছিলুম। আল মামুনের হুমকি তুমি মেনে নেবে? তুমি কি ওর ক্রীতদাস? তোমাকে ও হাফ মিলিয়ান ইন্ডিয়ান টাকা দিতে চেয়েছিল, তুমি তা নাওনি, সে খবরও আমি জানি!"

"শোনো হানি আলকাদি। ঐ সন্তু ছেলেটাকে আমি বড্ড ভালবাসি। এর কোনও ক্ষতি হলে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তোমার দলের এত শক্তি, তবু তোমারা আমার ভাইপোকে এখানে আনার ব্যবস্থা করতে পারলে না, মাঝপথ থেকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ওকে বাঁচাবার জন্য আমাকে ফিরে যেতে হবে।"

"যদি আমরা তোমাকে না ছাড়ি? আল মামুনের হুকুম আমি কিছুতেই মানব না!"

"তোমাদের দুই দলের ঝগড়ার জন্য আমার ভাইপোটা মারা যাবে? হানি আলকাদি, তোমাকে দেখে আমি যা বুঝেছি, তুমি বীর, তুমি লড়াই করতে ভালবাস, কিন্তু কোনও ছোট ছেলেকে নিশ্চয়ই তুমি কোনওদিন মারতে পারবে না! কিন্তু আল মামুন তা পারে।"

"তুমি দুটো উপায়ের কথা বলছিলে। দ্বিতীয়টা কী?"

"আল মামুনকে তুমি একটা চিঠি লেখো। সে যেমন তোমাকে ধমকিয়েছে আর গালাগালি দিয়েছে, সেই রকম তুমি যতখুশি ধমক আর গালাগালি দাও। সেই সঙ্গে লেখো যে, সন্তুকে আজ রাতের মধ্যেই এখানে ফেরত পাঠাতে হবে। মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছে যাচাই করতে গিয়ে যদি আমি কোনও ধন-সম্পদের সন্ধান পাই, তা হলে তুমি তার অর্ধেক আল মামুনকে দেবে! তুমি আরব যোদ্ধা, তোমার কথার দাম আছে। তুমি কথা দিলে নিশ্চয়ই তা রাখবে!"

"অসম্ভব! অসম্ভব! অসম্ভব! মুফতি মহম্মদ বিপ্লবী নেতা ছিলেন। বিপ্লবী দলের জন্যই তিনি টাকাপয়সা সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সেইসব জিনিস এখানকার বিপ্লবী দলই পাবে। আল মামুনটা কে? একটা অর্থলোভী শয়তান!"

"হয়তো টাকাপয়সা কিছুই নেই। তোমরা এমনি-এমনি ঝগড়া করছ!"

"নিশ্চয়ই আছে। থাকতে বাধ্য!"

"শোনো, আমার সাহায্য যদি চাও, তা হলে আমার কথা মানতেই হবে! তুমি কি এটা বোঝোনি যে, আমি যদি নিজে থেকে বলতে না চাই, তা হলে আমাকে খুন করে ফেললেও আমি মুখ খুলব না!"

"আল মামুনকে টাকাপয়সার ভাগ দিলে আমার দলের লোকরা রেগে যাবে।"

"দলের লোকদের বোঝাও! সন্তুকে যদি বাঁচাতে না পারো, তা হলে তোমরা কিছুই পাবে না! সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ডাগো আবদাল্লার হাতে এক্ষুনি চিঠি লিখে স্টেপ পিরামিডের কাছে পাঠাও!"

হানি আলকাদির মুখখানা কুঁকড়ে গেছে। আল মামুনকে হত্যা করার বদলে তাকে

টাকাপয়সার ভাগ দিতে হবে, এই ব্যাপারটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তার মনের মধ্যে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে।

কাকাবাবু তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "শূন্যকে যদি দু'ভাগ করা যায়? মনে করো, মুফতি মহম্মদের ধনসম্পদ শূন্য। তার অর্ধেক আল মামুনকে দিতে তুমি আপত্তি করছ কেন?"

হানি আলকাদি পাশ ফিরে তার দলের একজন লোককে বলল, "এই, চিঠি লেখার কাগজ আর কলম নিয়ে এসো।"

◀ ৯ ▶

সন্তুর মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে রাত তিনটের সময়। আল মামুনের লোকেরা তাকে যখন গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল, তখন একটা লোহার রডে লেগে তার মাথা ফেটে যায়। মাথার চুল একেবারে ভিজে গিয়েছিল রক্তে। আল মামুনের লোকেরা তা দেখেও তার কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি। ডাগো আবদাল্লা তাকে এখানে ফিরিয়ে আনবার পর হানি আলকাদি নিজে তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে।

সন্তু কিন্তু বেশ চাঙ্গাই আছে। ঐ আঘাতে সে একটুও কাবু হয়নি। কিংবা হলেও বাইরে তা প্রকাশ করছে না। বরং তার একটু আনন্দই হচ্ছে। দিল্লিতে পাঁজরায় গুলি খেয়ে কাকাবাবু কয়েকদিন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ছিলেন, এখন সেও অনেকটা কাকাবাবুর সমান সমান হল।

ভোরের আলো ফোটার আগেই কাকাবাবু বেরিয়ে পড়েছেন সন্তুকে নিয়ে। সঙ্গে ডাগো আবদাল্লা। সে-ই চালাচ্ছে গাড়ি। সন্তু সুস্থ আছে দেখে কাকাবাবু আর দেরি করতে চাননি। কাজটা তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চুকিয়ে ফেলতে চান।

গাড়িতে যেতে-যেতে কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, তুই জানিস পিরামিডের মধ্যে কী করে ঢুকতে হয়? তোর কি ধারণা যে, পিরামিডের গায়ে একটা দরজা থাকে আর সেই দরজা খুলে ভেতরে ঢোকা যায়?"

এই ব্যাপারটা সন্তুর জানা নেই। দরজা না থাকলে ভেতরে ঢোকা যাবে কী করে?

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোর কি ধারণা পিরামিডের ভেতরটা ফাঁপা? ভেতরে সব ঘর-টর আছে?"

সন্তু আরও অবাক হয়ে গেল! ফাঁকা না হলে ভেতরে ঘর-টর থাকবে কী করে? অনেক ছবিতেই সে দেখেছে যে, পিরামিডের মধ্যে মস্ত-মস্ত হলঘরের মতন, তাতে অনেক জিনিসপত্র, মূর্তি, পাথরের কফিন ইত্যাদি থাকে। তা হলে কাকাবাবু এরকম বলছেন কেন?

কাকাবাবু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "না রে, পিরামিডের গায়ে দরজা নেই।

ভেতরটা ফাঁপাও নয়, ভেতরে ঘর-টর কিচ্ছু নেই। পিরামিডগুলো হচ্ছে সলিড পাথরের ত্রিভুজ।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তা হলে রাজা-রানিদের কবর কোথায় থাকত?"

"সেগুলো বেশির ভাগই মাটির নীচে। শুধু রাজা-রানিদের সমাধি নয়, তাঁদের ব্যবহার করা অনেক জিনিসপত্রও সেখানে থাকত। এমনকী খাট-বিছানা পর্যন্ত। অধিকাংশই সোনার। ক্লিয়োপেট্রার শোবার খাট, চটিজুতো পর্যন্ত সোনার তৈরি ছিল। এই সব মূল্যবান জিনিসপত্র যাতে চোরে চুরি করে নিয়ে না যেতে পারে, তাই ঐ সব সমাধিস্থানের ঢোকার পথটাও খুব গোপন রাখা হত। পিরামিডের গা হাতড়ে কেউ সারাজীবন খুঁজলেও ভেতরে ঢোকার পথ পাবে না।"

"তাহলে সাহেবরা পিরামিডের ভেতরে ঢুকল কী করে?"

"পিরামিডের ভেতরে না, পিরামিডের নীচে। অনেক দূরে একটা সুড়ঙ্গের মুখ থাকে। সেখান দিয়ে যেতে হয়। সাহেবরা এক-এক করে সেই সব সুড়ঙ্গের পথ খুঁজে বার করেছে। খুব কষ্ট করে ঢুকতে হয়। স্যার ফ্লিন্ডার্স পেট্রি নামে একজন ইংরেজ এই সব আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। এক-একটা পিরামিডের তলায় গিয়ে তিনি কত যে ধনরত্ন পেয়েছেন, তার ঠিক নেই। তবে স্যার ফ্লিন্ডার্সও প্রথম দু'একটা সমাধিস্থানের ভেতরে ঢুকে দেখেছিলেন, তাঁরও আগে চোরেরা অন্য দিক থেকে সুড়ঙ্গ কেটে এসে ভেতরে ঢুকেছিল। আমার ধারণা, মুফতি মহম্মদ এই স্যার ফ্লিন্ডার্সের দলে গাইডের কাজ করতেন। উনি অনেকদিন সাহেবদের কাছে প্রথমে মালবাহক কুলি, তারপর গাইডের কাজ করেছিলেন, তা তো শুনেছিস মান্টোর কাছে!"

হ্যাঁ। তারপর গাইডের কাজ ছেড়ে বিপ্লবী হলেন।"

"সাহেবরা পিরামিডের সুড়ঙ্গ দিয়ে ভিতরে গিয়ে সমস্ত সোনার জিনিস আর দামি-দামি জিনিস বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে দেখে এ-দেশের অনেক লোক চটে গিয়েছিল। মুফতি মহম্মদ তো নিজের চোখেই দেখেছেন, সাহেবরা মিশরের সম্পদ লুট করছে। তাই তিনি বিপ্লবী দল গঠন করেছিলেন, এই সব আটকাবার জন্য। হয়তো তিনি নিজেও কোনও-কোনও সমাধিস্থান থেকে সোনাদানা তুলে নিয়ে গিয়ে সেসব তাঁর দলের কাজে লাগিয়েছেন!"

"উনি ছবি এঁকে-এঁকে সেই সব সোনা কোথায় লুকোনো আছে তাই বুঝিয়ে গেছেন, তাই না?"

"না রে, আমি মিথ্যে কথা বলি না। আমি সবাইকে বলেছি যে, মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছাপত্রে টাকা-পয়সা, সোনাদানার কথা কিছু নেই, তা সত্যিই। উনি সেসব কিছু জানিয়ে যাননি।"

ডাগো আবদাল্লা মুখ ফিরিয়ে বলল, "গির্জার বড় পিরামিড তো এসে গেছে, এফেন্দি। এবার কোন্ দিকে যাব?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "হানি আলকাদির গাড়ি কোথায়?"

ডাগো বলল, "ওদের গাড়ি একটু আগেই পৌঁছে গেছে। সামনে থেমে আছে।"

"ওদের এখানেই থেমে থাকতে বলো। তুমি ডান দিকে চলো।"

আর কিছুক্ষণ বাদে আর-একটি মাঝারি আকারের পিরামিডের কাছে এসে কাকাবাবুর নির্দেশে গাড়ি থামল।

গাড়ি থেকে নেমে কাকাবাবু চারদিকে তাকালেন। ধারেকাছে কোনও লোকজন দেখা যাচ্ছে না। তবে বালির ওপর একটা গাড়ির চাকার দাগ রয়েছে। হয়তো আগের দিন কোনও টুরিস্টের গাড়ি এসেছিল।

কাকাবাবু বললেন, "ডাগো, আমি এই পিরামিডের নীচে যাব।"

ডাগো কাকাবাবুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। করুণ হয়ে এল তার মুখখানা। আস্তে আস্তে বলল, "আপনি যাবেন, এফেন্দি?"

কাকাবাবু হাসলেন। তারপর সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "কেন ও এই কথা বলছে জানিস? আগেরবার যখন আমি ইজিপ্টে এসেছিলাম, তখন ডাগো সব সময় আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকত। ওকে নিয়ে আমি অনেক সমাধিতে নেমেছি। তখন আমার দুটো পা'ই ভাল ছিল। ডাগো ভাবছে, এখন এই খোঁড়া পা নিয়ে আমি আর নীচে নামতে পারব না!"

কাকাবাবু ডাগোকে বললেন, "তুমি সঙ্গে থাকলে আমি নিশ্চয়ই পারব। আগেরবার আমরা এর মধ্যে একসঙ্গে নেমেছিলাম মনে নেই?"

ডাগো বলল, "আপনার কষ্ট হবে, এফেন্দি!"

"তা হোক, তুমি কাজ শুরু করে দাও!"

গাড়ি থেকে কয়েকটা জিনিসপত্র নামানো হল। তিনটে শক্তিশালী টর্চ গুঁজে নেওয়া হল তিনজনের কোমরে। একটা ছোট ঝোলাব্যাগ কাকাবাবু চাপিয়ে দিলেন সন্তুর কাঁধে।

পিরামিড থেকে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে ডাগো শুয়ে পড়ল এক জায়গায়। হাত দিয়ে বালি সরাতে লাগল। তারপর বেরিয়ে পড়ল একটা কাঠের পাটাতন। সেটা সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেল একটা অন্ধকার গর্ত নেমে গেছে যেন পাতালে।

কাকাবাবু বললেন, "কাঠের পাটাতনের বদলে এখানে আগে পাথর চাপা দেওয়া থাকত। তার ওপর অনেকখানি বালি ছড়িয়ে দিলে আর কারুর বুঝবার উপায় ছিল না। খুব সাবধানে নামবি কিন্তু সন্তু। একটু পা পিছলে গেলেই অনেক নীচে গড়িয়ে পড়ে যাবি।

ঠিক হল, ডাগো যাবে সবচেয়ে আগে, মাঝখানে কাকাবাবু, সবশেষে সন্তু। ডাগো একটা মোটা দড়ি আলগা করে জড়িয়ে দিল তিনজনের কোমরে। এখানে ক্রাচ নিয়ে গিয়ে কোনও লাভ নেই বলে কাকাবাবু সে-দুটো রেখে গেলেন বাইরে।

সুড়ঙ্গটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। দু'দিকের দেওয়ালে দু'হাতের ভর দিয়ে বসে-বসে নামতে হয়। হাতের বেশ জোর লাগে।

সন্তু ভাবল, "নীচে নামবার কী অদ্ভুত ব্যবস্থা। অবশ্য হাজার হাজার বছর আগে এই ব্যবস্থাটাই বোধহয় সবচেয়ে সুবিধেজনক ছিল।

কাকাবাবুর যে দারুণ কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে পারছে সন্তু। ওঁর ভাঙা পা'টার ওপরেও জোর পড়ছে কিনা। মাঝে-মাঝে কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, "তুই ঠিক আছিস তো, সন্তু?"

কাকাবাবুর মুখ ভর্তি চন্দনের ফোঁটার মতন ঘাম।

ওপরের আলো খানিকটা মাত্র ভেতরে ঢোকে, তারপরেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ডাগো কী কায়দায় যেন একটা টর্চ জ্বেলে বগলে চেপে আছে। আর মাঝে মাঝে আরবি ভাষায় কী যেন বলে উঠছে। হয়তো কোনও প্রার্থনামন্ত্র!

মিনিট দশেক পরে ওরা পৌঁছে গেল সমতল জায়গায়। ঘড়িতে দশ মিনিট কাটলেও মনে হয় যেন কয়েক ঘন্টা লেগে গেছে।

তিনটে টর্চের আলোয় দেখা গেল সেখানে একটি চৌকো ছোট ঘর। ঘরটা একেবারে খালি। দেওয়ালেও কোনও ছবি নেই। ঘরের একটা দেওয়ালে, নীচের দিকে একটা চৌকো গর্ত। তার মধ্য দিয়ে একটা সরু পথ। সেই পথে খানিকটা যাবার পর আর-একটি দেওয়াল, সেই দেওয়ালের গায়ে একটি লোহার দরজা। দেখলেই বোঝা যায়, সেই দরজাটা নতুন বসানো হয়েছে, আগে অন্যকিছু ছিল।

দরজাটা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। তারপরই একটি বিশাল হলঘর। এখানকার দেওয়ালে বড়-বড় ছবি আঁকা। কিন্তু জিনিসপত্তর কিছু নেই।

কাকাবাবু বললেন, "সব নিয়ে গেছে। আগেরবার এসেও অনেক কিছু দেখেছিলাম। তাই না, ডাগো?"

ডাগো বলল, "হ্যাঁ, এফেন্দি। কিছুই থাকে না। চোরেরা সব নিয়ে নেয় বলে গভর্নমেন্ট এখন নিজেই তুলে নিয়ে গিয়ে মিউজিয়ামে রাখে।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না! ডাগো, সেই ল্যাবিরিন্থটা কোথায়?"

ডাগো বিস্মিতভাবে বলল, "সেটাতেও যাবে?"

"আপনার আরও কষ্ট হবে। এক কাজ করি, এফেন্দি। আমি আপনাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি।"

"তার দরকার হবে না। তুমি পথটা খুঁজে বার করো। আমার জায়গাটা ঠিক মনে পড়ছে না।"

হলঘরটা পার হয়ে এক জায়গায় এসে ডাগো একটা চৌকো পাথরের স্ল্যাব সরাল। তার মতন শক্তিশালী লোক ছাড়া অতবড় পাথর সরাতে যে-সে পারবে

না। তারপর একটা ছোট গোল জায়গা। সেখানে মেঝেতে শুয়ে পড়ে সে আবার একটা পাথরের পাটাতন সরিয়ে ফেলল। এখানে আবার আর-একটা সুড়ঙ্গ।

কাকাবাবু বললেন, "এইখানে আমাদের যেতে হবে, সন্তু।"

তারপর তিনি ডাগোকে বললেন, "আর তোমাকে যেতে হবে না। তুমি ফিরে যাও!"

দারুণ চমকে উঠে ডাগো বলল, "কী বলছেন, এফেন্দি? আমি যাব না? আমাকে বাদ দিয়ে আপনি এই বাচ্চাকে নিয়ে যাবেন কী করে?"

"ঠিক পেরে যাব। তুমি বড় হলটায় অপেক্ষা করো, কিংবা ওপরেও উঠে যেতে পারো। আমরা ফেরার সময় তোমাকে ডাকব!"

"না, না, না, তা হয় না! আপনাকে এখানে ফেলে রেখে গেলে হানি আলকাদি আমায় আস্ত রাখবে না!"

"হানি আলকাদির সঙ্গে আমার এই রকমই কথা আছে। আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তা আমি দেখার আগে, অন্য কেউ জানতে পারবে না। মুফতি মহম্মদের এটা আদেশ। এই আদেশ তো সকলকে মানতেই হবে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, ডাগো। তুমি আমাদের যা উপকার করলে, তার কোনও তুলনা নেই। তোমাকে ছাড়া আর কারুকে বিশ্বাস করে আমি এখানে আসতে পারতুম না।"

ডাগো মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে কাকাবাবু ঢুকে পড়লেন সেই ল্যাবিরিন্থের মধ্যে।

কাকাবাবু বললেন, "তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, সন্তু। ভেতরটা খুব আঁকাবাঁকা। একটু অন্যমনস্ক হলেই মুখে গুঁতো লাগবে। আগেরবার আমার নাক থেঁতলে গিয়েছিল। এখন কি বুঝতে পারছিস যে, আমাদের মাথার ওপরে রয়েছে একটা বিরাট পিরামিড?

সন্তুর বুক ঢিপঢিপ করছে। মাটির কত নীচে, জমাট অন্ধকার ভরা এক সুড়ঙ্গ। আর কি ওপরে ওঠা যাবে? যদি হঠাৎ একটা পাথর ভেঙে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায়? ডাগো সঙ্গে থাকায় তবু খানিকটা ভরসা ছিল।

সন্তুর কাঁধ ধরে কাকাবাবুকে লাফিয়ে-লাফিয়ে আসতে হচ্ছে। সন্তু টর্চ জ্বেলে এগোচ্ছে খুব সাবধানে। একটুখানি অন্তর-অন্তরই সুড়ঙ্গটা বাঁক নিয়েছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ভয় পাচ্ছিস নাকি রে, সন্তু?"

সন্তু শুকনো গলায় না, "না!"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি, তা বুঝতে পারছিস?"

"না।"

"এক-একটা সমাধিস্থান খুব গোপন রাখা হত। কেন যে এত গোপনীয়তা তা জানা যায় না। হয়তো দামি জিনিসপত্র অনেক বেশি রাখা হত সেখানে। এটা সেইরকম একটা গোপন সমাধিতে যাবার পথ। কত কষ্ট করে এরকম সুড়ঙ্গ

বানিয়েছে। হয়তো এই সমাধিতে যাবার আরও কোনও রাস্তা আছে, যা আমরা এখনও জানি না। রাজা-রানিরা কি এত কষ্ট করে যেতেন?"

"আমরা কোন্ সমাধিতে যাচ্ছি?"

"রানি হেটেফেরিসের গল্প তোকে বলেছিলুম, মনে আছে?"

"হ্যাঁ, সেই যে কফিনের মধ্যে যাঁর মমি খুঁজে পাওয়া যায়নি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। লোকের ধারণা, এই জায়গাটা ভুতুড়ে। সেই মমিটাকে মাঝে-মাঝে দেখতে পাওয়া গেছে, আবার মাঝে-মাঝে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। তোর ভূতের ভয় নেই তো?"

"অ্যাঁ? না!"

"মুফতি মহম্মদ নামে একজন বৃদ্ধ কী সব ছবি এঁকেছিলেন, তা দেখে আমাদের কি এত কষ্ট করে এত দূরে আসার কোনও দরকার ছিল, বল?"

সন্তু এ-কথার কী উত্তর দেবে! সে কিছুই বলল না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "আমি এলুম কেন জানিস? ঐ যে মুফতি মহম্মদ নির্দেশ দিলেন, তুমি আগে নিজে যাচাই করে দেখো, সেইজন্যই আমার কৌতূহল হল। এটা যেন বৃদ্ধের এক চ্যালেঞ্জ!"

টর্চের আলো এবারে একটা ফাঁকা জায়গায় পড়ল। সুড়ঙ্গটা শেষ হয়ে গেছে! সুড়ঙ্গটা খুব বেশি লম্বা নয়।

ফাঁকা জায়গাটিতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার পর একটি বেশ বড় চৌকো ঘর।

কাকাবাবু বললেন, "এই হল রানি হেটেফেরিসের সমাধিস্থান। এক সময় নাকি এখানে অতুল ঐশ্বর্য ছিল। একজন রানির যত জিনিস ব্যবহারে লাগে, সেই সব কিছু। ওরা বিশ্বাস করত রাজা-রানিরা আবার হঠাৎ একদিন বেঁচে উঠতে পারে। তখন সব কিছু লাগবে তো!"

ঘরটার ঠিক মাঝখানে একটি কারুকার্য-করা পাথরের কফিন। আরও তিন-চারটে কফিন ছড়ানো রয়েছে এদিক-ওদিক।

বড় কফিনটা দেখিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এই হচ্ছে রানি হেটেফেরিসের সারকোফেগাস। তার আগে দেখা যাক, এর মধ্যে রানির মমি আছে কি না! যদি থাকে, তা হলে দারুণ একটা আবিষ্কার হবে।"

সারকোফেগাসের ওপরে রানির ছবি আঁকা। কাকাবাবুর সঙ্গে ধরাধরি করে সন্তু ঢাকনাটা সরিয়ে ফেলল।

ভেতরটা ফাঁকা।

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "জানতুম।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "অন্য কফিনগুলো খুলে দেখব?"

"কোনও লাভ নেই। পৃথিবীর নানা দেশের মিউজিয়ামে মমিগুলো ভাল

দামে বিক্রি হয়। চুরি যাবার ভয়ে সব মমি সেইজন্য ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

সন্তু টর্চের আলো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে লাগল দেওয়ালগুলো। প্রত্যেক দেওয়ালেই অসংখ্য ছবি। এইগুলোই হিয়েরোগ্লিফিকস। বোধহয় রানির জীবনকাহিনী লেখা আছে। কত শিল্পী, কত পরিশ্রম করে ঐ সব ছোট-ছোট ছবি এঁকেছে। কাকাবাবুও ঘুরে-ঘুরে দেওয়ালগুলো পরীক্ষা করতে-করতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন।

"এইবার সন্তু, মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছার কথা তোকে জানাতে হবে। কারণ, তোর সাহায্য ছাড়া এর পর আমার আর কিছু করার সাধ্য নেই। তুই দেখা মানেই আমার দেখা।"

সন্তু ছিল উল্টো দিকের দেওয়ালের কাছে। সে তাড়াতাড়ি এদিকে চলে এল!

"কাকাবাবু, আমি অনেকটা আন্দাজ করেছি। এই ঘরে ঢুকেই বুঝতে পেরে গেছি।"

"তুই বুঝতে পেরে গেছিস? কী বুঝেছিস শুনি?"

"রানি হেটেফেরিসের মমি এখানেই কোথাও লুকোনো আছে। আর সেই লুকোনো জায়গাতেই মুফতি মহম্মদ সোনা আর টাকাপয়সা লুকিয়ে রেখেছেন।"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। তারপর হেসে ফেলে বললেন, "অনেকটা ঠিকই ধরেছিস তো। তবে টাকাপয়সার কথা নেই এর মধ্যে। মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছের কথা জানলে অনেকে ভাববে পাগলামি। উনি ছবি এঁকে যা জানাতে চাইছিলেন, তা হল এই : উনি খুব সংক্ষেপে লিখেছিলেন, আমি তোকে বুঝিয়ে বলছি। উনি এক সময় সাহেবদের কাছে গাইডের কাজ করতেন। সেই সময়েই আল বুখারি নামে আর-একজন গাইডের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। আল বুখারি অনেকগুলো পিরামিডের নীচে এবং গোপন সমাধিস্থানে ঢোকার রাস্তাও আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু সেইসব আবিষ্কারের কৃতিত্ব সাহেবরাই নিয়ে নিত। একজন সাহেবকে জব্দ করার জন্যই আল বুখারি মুফতি মহম্মদের সাহায্য নিয়ে রানি হেটেফেরিসের মমি এক জায়গায় লুকিয়ে রাখে। মজা করবার জন্য ওরা সেই মমিটাকে মাঝে-মাঝে বার করে এনে সারকোফেগাসের মধ্যে রেখে দিত, মাঝে-মাঝে আবার সরিয়ে ফেলত। সেই থেকে ভূতের গল্প রটে যায়। এ রকম ব্যাপার মাত্র দু'তিনবারই হয়েছিল। কিন্তু লোকে বিশ্বাস করত যে, রানির মমি প্রত্যেক বছর একবার করে ফিরে আসে। যাই হোক, আল বুখারি একটা দুর্ঘটনায় মারা যায়, মুফতি মহম্মদ গাইডের কাজ ছেড়ে বিপ্লবীদের দলে যোগ দেন। সেই থেকে মমিটা লুকোনো অবস্থাতেই আছে। মৃত্যুর আগে মুফতি মহম্মদ জানিয়ে দিতে চান যে, সেটা কোথায় আছে। কিন্তু এর মধ্যে যদি অন্য কেউ সেই গোপন জায়গাটা জেনে ফেলে মমিটা সরিয়ে ফেলে থাকে, তা হলে মুফতি মহম্মদ মিথ্যেবাদী হয়ে যাবেন। সেইজন্যই তিনি আগে আমাকে যাচাই করে নিতে বলেছেন।"

"সেই লুকোনো জায়গাটা কোথায়?"

"সেটা তোকে খুঁজে বার করতে হবে। এই দ্যাখ, এই দেওয়ালের গায়ে মাঝে-মাঝে খাঁজ কাটা আছে। এই খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে তুই ওপরে উঠতে পারবি? তোর কাঁধের ব্যাগটাতে দ্যাখ শক্ত নাইলনের দড়ি, লোহার হুক এই সব আমি এনেছি, যদি কাজে লাগে ভেবে।"

সন্তু ব্যাগ খুলে জিনিসগুলো বার করল। তারপর বলল, "আমার ওসব লাগবে না, আমি এমনিই উঠতে পারব।"

খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে সন্তু দেওয়াল বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

কাকাবাবু টর্চের আলো ফেলে বললেন, "ঐ যে রানির ছবি দেখছিস, এরপর ডান দিকে পরপর নটা ছবি গুনে যা! গুনেছিস? এইবার দশ নম্বর ছবিটার ওপর জোরে ধাক্কা দে।"

সন্তু ধাক্কা দিল, কিন্তু কিছুই হল না।

কাকাবাবু বললেন, "আরও জোরে ধাক্কা দিতে হবে। আল বুখারি আর মুফতি মহম্মদ দু'জনেই গাঁট্টাগোঁট্টা জোয়ান ছিলেন নিশ্চয়ই। তা ছাড়া বহু বছর জায়গাটা খোলা হয়নি!"

সন্তু প্রাণপণ শক্তিতে দুম-দুম করে ধাক্কা দিতে লাগল। তাও কিছুই হল না।

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "দ্যাখ তো, ঐ এক থেকে দশ নম্বর ছবির মতন ছবি তোর মাথার কাছে ছাদেও আঁকা আছে কি না!"

"হ্যাঁ, আছে।"

"ঐখানে ধাক্কা দে!"

এবারে ছাদের সেই জায়গাটায় ধাক্কা দিতেই সন্তুর হাত অনেকখানি ভেতরে ঢুকে গেল। সেখানকার একটা পাথর ভেতরে সরে গেছে। সেখানে আরও ধাক্কা দিতে দিতে একজন মানুষ গলে যাবার মতন জায়গা হয়ে গেল।

"টর্চ জ্বালতে পারবি? দ্যাখ তো, ওখানে কী আছে!"

"মেজেনিন ফ্লোরের মতন জায়গাটা। ভেতরে একটা কফিন আছে।"

"এটাই খুলে দেখতে হবে। ভেতরে ঢুকতে পারবি তো? খুব সাবধানে।"

সন্তু মাথা গলাতেই নীচে বেশ জোরে একটা শব্দ হল। সন্তু চমকে গিয়ে আবার মাথাটা বার করে আনল। নীচের দিকে তাকিয়ে যা দেখল তাতে তার রক্ত হিম হয়ে গেল একেবারে।

যেখানে শব্দটা হয়েছিল, কাকাবাবু টর্চের আলো ঘুরিয়েছেন সেই দিকে। সেখানে একটা কফিনের ঢাকনা খুলে গেছে। তার মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে একটা মূর্তি। একটা মমি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সেই মূর্তি দেখে টর্চসুদ্ধ কাকাবাবুর হাতটাও কেঁপে গেল একবার। তারপর তিনি অস্ফুট গলায় বললেন, "আল মামুন!"

সন্তুও এবার চিনতে পারল। কিন্তু আল মামুন এখানে আগে থেকেই এল কী করে? কাকাবাবু তো কারুকেই বলেননি যে, তিনি কোথায় যাবেন।

আল মামুনের গায়ে একটা সাদা কাপড় জড়ানো। সেটা খুলে ফেলে সে একটা লম্বা ছুরি বার করল। তারপর হিংস্র গলায় বলল, "বিদেশি কুকুর! নিমকহারাম! আমি কলকাতায় গিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করেছি। আমি দিল্লিতে মুফতি মহম্মদের সঙ্গে তোদের দেখা করিয়ে দিয়েছি। আর তুই ঐ কুত্তা আলকাদির দলে যোগ দিয়েছিস?"

কাকাবাবু অনেকটা আপন মনে বললেন, "একটাই ভুল করেছি আমি। মিউজিয়ামের কিউরেটর মান্টোর কাছে রানি হেটেফেরিসের কথা বলে ফেলেছিলাম। সে বুঝি তোমার দলে, আল মামুন? কিংবা জোর করে তার কাছ থেকে কথা আদায় করে ফেলেছ! তুমি এত কষ্ট করে এখানে এলে কেন আল মামুন! মুফতি মহম্মদের যদি লুকোনো টাকা পয়সা কিছু থাকেই, তুমি তো তার অর্ধেক ভাগ পাবে!"

"অর্ধেক! ঐ শয়তানটাকে আমি অর্ধেক দেব? আমি মুফতি মহম্মদের উত্তরাধিকারী। আমি তার সম্পদের সন্ধান পেয়ে গেছি। এখন তোমাকে আর ঐ খোকাটাকে আমি এখানেই শেষ করে দিয়ে যাব। এই সম্পদের কথা পৃথিবীর আর কেউ জানবে না!"

"তুমি আমাদের খুন করবে? তুমি ধর্মভীরু লোক, এরকম একটা অন্যায় করলে তোমার বিবেকে লাগবে না?"

"কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না, তাতে আবার বিবেকের কী আসে যায়!"

"আল মামুন, তোমার মতন খুনিদের আমি কিন্তু খুব কঠিন শাস্তি দিই!"

আল মামুন ছুরি তুলে এগিয়ে আসতেই কাকাবাবু মাটি থেকে নাইলনের দড়িটা তুলে নিলেন। সন্তু ভাবল, ওপর থেকে আল মামুনের মাথার ওপর লাফিয়ে পড়বে কি না!

কাকাবাবু দড়িটা নিয়ে শপাং করে চাবুকের মতন শব্দ করে বললেন, "আগেকার দিনে তলোয়ার আর চাবুকের লড়াইয়ের কথা শোনোনি?"

বলেই তিনি চাবুকের মতন সেই দড়ির এক ঘা কষালেন আল মামুনের মুখে।

লড়াইটা শেষ হতে এক মিনিটও লাগল না। লম্বা দড়ির সঙ্গে ছুরি দিয়ে আল মামুন লড়তে পারলই না মোটে। কাকাবাবু তাকে অনবরত মারতে লাগলেন। আল মামুনের হাত থেকে ছুরি খসে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল সে। কাকাবাবুর দড়ির ফাঁস তার গলায় লাগিয়ে হ্যাঁচকা টান দিতেই সে মাটিতে পড়ে গেল। দড়ির বাকি অংশটা দিয়ে কাকাবাবু তার হাত-পা বেঁধে ফেললেন।

তারপর যেন কিছুই হয়নি এই ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তিনি সন্তুকে বললেন, "যা ভেতরটা দেখে আয়।"

সন্তুর পা কাঁপছিল। নিজেকে একটুখানি সংযত করে সে টর্চটা মুখে চেপে নিল, তারপর দু'হাতে ভর দিয়ে মাথাটা গলাল ভেতরে।

ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ল রিনির মুখটা। রিনি তাকে ঠাট্টা করেছিল। বলেছিল গরুর শিঙের ওপর বসে থাকা একটা মশা! এখন সে একা মুফতি মহম্মদের সম্পদ আবিষ্কার করতে যাচ্ছে। কলকাতার পিকনিক গার্ডেনসের সেই থানাটার কথাও তার মনে পড়ে গেল এক ঝলক। সেই দারোগা যদি তাকে এই অবস্থায় দেখতেন।

ভেতরে ঢুকে গিয়ে সন্তু উবু হয়ে বসে টর্চ জ্বালল। তার গা ছম্ ছম্ করছে। কেন যেন তার ধারণা হল, এখানে একটা অজগর সাপ থাকতে পারে। কাশ্মীরের সেই শুকনো কুয়োটার মধ্যে যে-রকম ছিল।

কিন্তু সেসব কিচ্ছু নেই। একটা শুধু কফিন, আর এক পাটি চটি পড়ে আছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সে কফিনের ঢাকনা খুলল।

খুলতেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল তার। সেখানে সত্যিই একটা মমি রয়েছে। সন্তু ভূতের ভয় পায় না, তবু তার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না সে।

তার দৃঢ় বিশ্বাস এই মমির গায়ে জড়ানো ব্যাণ্ডেজের মধ্যেই কিংবা এর নীচে প্রচুর ধনরত্ন আছে। কিন্তু সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সে হাত তুলতেই পারছে না।

অতি কষ্টে সন্তু চোখ বুজে হাতটা ছোঁয়াল মমির গায়ে। এবারে তার কাঁপুনি থেমে গেল। ভাল করে মমিটা পরীক্ষা করল। কয়েকখানা হাড় ছাড়া আর কিছুই টের পাচ্ছে না। মমির তলাতেও কিছু নেই।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সন্তু বুঝে গেল, তার আশা ব্যর্থ হয়েছে। ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখা থাকলে তা তো একটু-আধটু হবে না। অনেক হবার কথা। থাকলে ঠিকই টের পাওয়া যেত।

হতাশভাবে ফিরে এসে সন্তু গর্তটাতে মুখ বাড়িয়ে বলল, "কাকাবাবু, কিছু নেই!"

"মমি নেই?"

"হ্যাঁ, মমি আছে। রানির মমিই মনে হচ্ছে, কিন্তু টাকাপয়সা বা সোনা-টোনা একটুও নেই!"

"মুফতি মহম্মদ তো টাকাপয়সার কথা বলেননি! তোকে আর-একটা কাজ করতে হবে। দ্যাখ্ তো, ঐ ঘরের দেয়ালে বা ছাদে বা কফিনের গায়ে কোনও ছবি আঁকা আছে কি না?"

সন্তু দেখে এসে বলল, "হ্যাঁ, আছে। কফিনের ঢাকনার ভেতরের দিকে পাঁচটা ছোট ছোট ছবি আছে।"

কাকাবাবু ঝোলাব্যাগটা সন্তুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এর মধ্যে কাগজ-কলম আছে। তুই তো একটু-আধটু ছবি আঁকতে পারিস, খুব সাবধানে ঐ ছবিগুলো কপি করে নিয়ে আয় তো!"

ছবিগুলো কপি করতে সন্তুর আরও দশ মিনিট লাগল। তারপর চটিজুতোটা কুড়িয়ে নিয়ে সে নেমে এল। জুতোটা চামড়া বা রবারের নয়। কোনও ধাতুর। সোনারও হতে পারে। ওপরে শ্যাওলা জমে গেছে।

কাকাবাবু আল মামুনের মুখের ওপর টর্চ ফেলে বললেন, "তোমাকে আমি খুলে দিচ্ছি না!"

আল মামুন বলল, "আমাকে বাঁচাও। তোমাকে আমি দশ লাখ টাকা দেব!"

"তুমি আমাদের খুন করতে চেয়েছিলে! তার বদলে তুমি অন্তত একটা দিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করো!"

সন্তুকে নিয়ে কাকাবাবু সেই হলঘর থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়লেন সুড়ঙ্গে। সেটা পার হতেই ডাগো আবদাল্লাকে দেখতে পাওয়া গেল। সে অধীরভাবে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারপর আর ওপরে উঠতে কোনও অসুবিধে হল না।

হানি আলকাদি কোথা থেকে ছুটে এসে কাকাবাবুর হাত জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, "মিঃ রায়চৌধুরী, ইউ গট ইট?"

কাকাবাবু বললেন, "শোনো, মনটা শক্ত করো। দুঃসংবাদ শুনে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেও না। মুফতি মহম্মদের গোপন কথা হচ্ছে রানি হেটেফেরিসের মমি। সেটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব তুমি নাও বা যে-ই নাও, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সেখানে টাকাপয়সা বা অস্ত্রশস্ত্র কিছুই পাওয়া যায়নি। এই এক পাটি চটি পাওয়া গেছে, বোধহয় এটা সোনার তৈরি। কে এটা ফেলে গেছে জানি না। এর অর্ধেক তুমি ইচ্ছে করলে আল মামুনকে দিতে পারো। সে অবশ্য নীচে শুয়ে আছে। বিকেলের দিকে কোনও লোক পাঠিয়ে তাকে উদ্ধার করতে হবে।"

হানি আলকাদি রাগের চোটে চটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে!

কাকাবাবু বললেন, "আমার এখন বিশ্রাম দরকার একটু। আমি ক্লান্ত। এখানে একটা রেস্ট হাউস তৈরি হয়েছে না?"

আগের রাতে ঘুম হয়নি, তার ওপর এত উত্তেজনা ও পরিশ্রম। সন্তু আর কাকাবাবু দুজনেই ঘুমোল প্রায় সন্ধে পর্যন্ত।

সন্তু জেগে উঠে দেখল, রিনি, সিদ্ধার্থ, বিমান সবাই এসে বসে আছে। সিদ্ধার্থ বিমানের কাছে খবর পেয়ে কাল রাতেই এখানকার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আজ তারা খুঁজতে-খুঁজতে গিজাতে এসে পৌঁছেছে।

রিনি বলল, "সন্তু, সব ঘটনা আমি আগে শুনব। তার আগে তুই আর কারুকে বলতে পারবি না!"

কাকাবাবু ঠিক করলেন, তখুনি কায়রোর দিকে রওনা হবেন। ডাগো আবদাল্লাকে

তিনি অনেক টাকা বখশিশ দিলেন। তারপর তাকে বললেন, একটু পরেই সে গিয়ে যেন আল মামুনকে মুক্তি দিয়ে আসে।

তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হানি আলকাদি কোথায়?"

ডাগো বলল, "সে তো চলে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছ থেকে সে বিদায় না নিয়ে চলে গেল? হতেই পারে না। তার খোঁজ নিয়ে দ্যাখো।"

একটু খোঁজাখুঁজি করতেই তাকে এক আরবের বাড়িতে পাওয়া গেল। সেও ঘুমোচ্ছিল। মনের দুঃখেও তো মানুষের খুব ঘুম পায়।

কাকাবাবু তাকে একলা একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "আমি চলে যাচ্ছি। তোমার কোনও উপকার করতে পারলুম না, সেজন্য দুঃখিত।"

হানি আলকাদি বিষণ্ণভাবে বলল, "তবু যে তুমি মুফতি মহম্মদের কথা রাখবার জন্য এত দূরে ছুটে এসে এত কষ্ট করলে, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

চোখে কৌতুকের ঝিলিক দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "তবে বোধহয় কিছু একটা তুমি পেয়ে যাবে! শুধু একটা মমি দেখবার জন্য কি মুফতি মহম্মদ আমাকে এত দূর পাঠিয়েছিলেন? এ মমিটাও একটা সংকেত!"

হানি আলকাদি বলল, "তার মানে?"

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন। তারপর বললেন, "রানির লুকোনো কফিনের গায়ে কয়েকটি ছবি আঁকা আছে। সেগুলোও আসলে সংকেত-লিপি। সেটা আমি তোমার জন্য অনুবাদ করে দিয়েছি। তাতে লেখা আছে, ফারাও আসেমহেট তৃতীয়'র সমাধিস্থান। তৃতীয় কক্ষ। ডান দিকের দেওয়ালের ওপর দিকে ঠিক পাঁচটি ছবি আঁকা আছে। আমার মনে হয়, সেই ছবি আর এই কফিনের গায়ের ছবি মুফতি মহম্মদের আঁকা। খুব সম্ভবত সেখানে কিছু লুকিয়ে রাখা আছে। সেখানে কী আছে না আছে তা আমি আর দেখতে চাই না। তুমি গিয়ে দ্যাখো, যা আশা করছ তা হয়তো ওখানেই পেতে পারো। গুড লাক!"

আনন্দে চকচক করে উঠল হানি আলকাদির চোখ। সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল কাকাবাবুকে। বারবার বলতে লাগল, "ধন্যবাদ, রায়চৌধুরী, ধন্যবাদ। আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ!"

কাকাবাবু খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "ঠিক আছে ঠিক আছে, এ আর এমন কী ব্যাপার!"